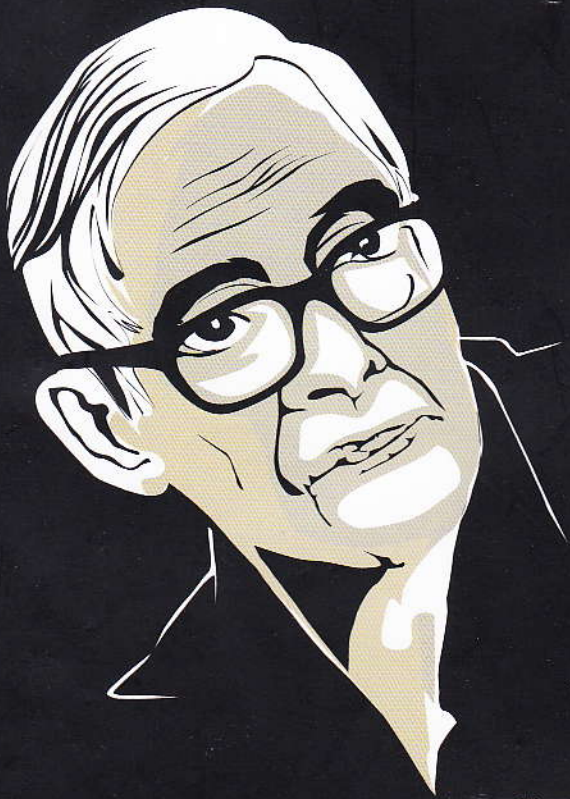

একুশ একাত্তর ও বঙ্গবন্ধু

সরদার ফজলুল করিম

একুশ একাত্তর ও বঙ্গবন্ধু

একুশ একাত্তর ও বঙ্গবন্ধু

সরদার ফজলুল করিম

সংকলন
শেখ রফিক

বিপ্লবীদের কথা
www.biplobiderkotha.com

একুশ একাত্তর ও বঙ্গবন্ধু

প্রকাশক
বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা
২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, মুক্তিভবন
(কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলা),
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
সেল: ০১৭২৬-১২৩৫৫০
rafiqcpb@gmail.com, www.biplobiderkotha.com

স্বত্ব
বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৪

প্রচ্ছদ
মেহেদী বানু মিতা

বই মেকআপ
মিফতাহুর রহমান চৌধুরী

বর্ণ বিন্যাস ও বানান শুদ্ধিকরণ
জান্নাতুল ফেরদৌস লাবণি

মুদ্রণ
চিত্রকল্প
১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-91257-2-3

মূল্য: তিনশত টাকা

পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, মুক্তিভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

উৎসর্গ

প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
আহমদ রফিক
যতীন সরকার

সূচি

একুশ

বায়ান্নরও আগে ১০
ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১৪
ভাষা আন্দোলন ১৮
জাত 'একুশে': জনক 'একুশে' ২২
বিবর্তিত একুশে: বন্দী একুশে ২৫
গল্প নয় ৩১
একুশে ফেব্রুয়ারির নতুন প্রেক্ষিত ৩৫
একুশ থেকে একুশ ৪০
একুশের সংকলন '৮০: স্মৃতিচারণ ৪৮
একুশের ডায়েরি: ৮৪ ৫৫
একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ৬০
ভাষা আন্দোলন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ৬৬
বাংলা মাধ্যম প্রসঙ্গে ৬৮
একুশে ফেব্রুয়ারির সেই দিনটি ৭২

একাত্তর

৬৯ এর গণআন্দোলন ৭৯
'৭১-এর ডায়েরি ৮৫
বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে ৯০
আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান ৯৮
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ১০৪
রুমীর আম্মা ১০৯
সেই ডিসেম্বর এবং এই ডিসেম্বরের ভাবনা ১১৫
বরিশালের মুক্তিযোদ্ধা কবিরের কাহিনী ১২২
আমরা আত্মাকে ডাকলাম ১৩২
গুজবে কান দেবেন না ১৩৬

বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু ১৪২
মহাত্মা গান্ধী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধী ১৪৬
'আমার সেলের পাশে ওরা কবর খুঁড়েছিল'– শেখ মুজিব ১৫২

সংকলন প্রসঙ্গে

"ইতিহাসকে পাঠ না করলে এবং বারংবার পাঠ না করলে, ইতিহাসকে দিয়ে কথা না কওয়ালে ইতিহাস কথা কয় না। তেমন হলে ইতিহাস শুয়ে থাকে। এবং তার নিশ্চেতন লাশের সমান দেহের উপরে বিকৃতি এবং বিস্মৃতির পলেস্তারা পড়তে পড়তে ইতিহাস অজানার গভীর থেকে গভীরে বিলুপ্ত হতে থাকে।" –সরদার ফজলুল করিম

সরদার স্যার। অর্থাৎ সরদার ফজলুল করিম। একজন বিপ্লবী সাম্যবাদী দার্শনিক। যিনি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী মানুষকে সত্য-ন্যায়ের পথে আলোকিত করার নিমিত্তে দর্শন-চর্চা করেছেন। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শে এবং তা বাস্তবায়নের কর্মযজ্ঞে। শুধু শিক্ষকতার কারণেই নয়, তাঁর জীবন-দর্শন-কর্মের মাধুর্যতায় মুগ্ধ সকলেই তাঁকে স্যার, সরদার স্যার সম্বোধন করেন।

স্যার এখনো সবার স্যার। তাঁর গবেষণা, রচনা, অনুবাদের পরিমাণও বেশ। যা আমাদের জন্য অমূল্য দর্শন। স্যার বলেন– "বই মানুষের কাছে যাবে না, মানুষকে বইয়ের কাছে যেতে হবে"। সত্যি তিনি যে অমূল্য দর্শন (তাঁর রচনাসমূহ) আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা আমরা যদি বারবার পাঠ না করি তাহলে নিজেকে 'মানুষে' বদলানো সম্ভব হবে না।

স্যার বলেন, "মানুষকে যুক্তিবান ও বিজ্ঞানমনস্ক করতে হলে প্রথমে নিজেকে যুক্তিবান ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সমাজটাকে পরিবর্তন করতে চাইলে নিজেকেও পরিবর্তন করতে হবে। বিপ্লব করতে চাইলে নিজেকেও বিপ্লবী হিসেবে তৈরি করতে হবে। আমি বা আমরা যা-ই করতে চাই না কেন তার জন্য মানুষের কাছে যেতে হবে। তাদেরকে বুঝাতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে শিখতেও হবে"।

স্যারের রচনাসমূহের মধ্যে বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মধ্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ এবং মহৎ জীবনের স্মৃতিচারণ অনন্য।

স্যারের রচনাসমূহ থেকে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলো নিয়ে সংকলন আকারে 'একুশ একাত্তর ও বঙ্গবন্ধু' নামে এই বইটি সাজানো হয়েছে। বইটি আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক দলিলও বটে।

শেখ রফিক
ডিসেম্বর ২০১৪
ইকুরিয়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

একুশ

যেন একুশে এক মহান ব্যক্তি। তাই 'মহান একুশে'। যেন 'একুশে একজন শিক্ষাদাতা'। তাই 'একুশে আমাদের শিখিয়েছে, মাথা নত না করতে।' যেন একুশে এক নিহত পথিকৃৎ। তাই 'অমর একুশে।'।

এসব শব্দের ব্যবহার থেকে আমার মনে ইংরেজী 'মিথ' শব্দটির আসল অর্থ কি, সে প্রশ্নটি সম্প্রতি জাগ্রত হয়েছে। 'একুশে' যথার্থই আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। অনেক শব্দকে সে সৃষ্টি করেছে। অনেক শব্দের অর্থকে সে বদলে দিয়েছে। একটি তারিখকে সে ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। একক কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নয়। বহু ব্যক্তির সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব। একুশে কোন এক ব্যক্তির নাম নয়। কেবল বরকতের বা সালামের নাম নয়। বরকত-সালাম রফিক-জব্বার-শফিক: সকলের নাম 'একুশে'। এই 'একুশে' কি মিথ তথা বস্তুহীন বিশ্বাস, না বস্তুময় অস্তিত্ব? 'ফিকশন' না 'ফ্যাক্ট'? কতখানি ফ্যাক্ট এবং কতখানি ফিকশন বা কল্পনা, তা হয়ত গবেষণার বিষয়। তা আমার জানা নেই। তবু '৫২ থেকে '৮৭ পর্যন্ত একুশের বিবর্তন আমার কাছে এই সত্যটিকে যেন উদঘাটিত করছে যে, মানুষের ইতিহাস বিনির্মাণে ফ্যাক্ট যেমন কালক্রমে ফিকশনের পরিণত হয়, তেমনি সেই ফিকশন নতুনতর ফ্যাক্টেরও সৃষ্টি ঘটায়।

– সরদার ফজলুল করিম

বায়ান্নরও আগে

বায়ান্ন সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির অমর শহীদদের স্মরণে রচিত হয়েছে শহীদ মিনার। মাটি থেকে অসংখ্য সিঁড়ির ধাপ। সেই ধাপের পরে বিস্তীর্ণ চত্বর। চত্বরের পেছনে সারিবদ্ধ দণ্ড। একদিন এখানে সিঁড়ির ধাপ ছিল না। চত্বর ছিল না। মিনার ছিল না। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ছাউনির পাশে একটুখানি খালি জমি। সে জমি আমাদের দেশের কিশোর সালাম বরকতের রক্তে ভিজে লাল হয়েছিল। সে রক্ত নয়। বীজ। সে বীজ থেকে শুধু মিনার হয়নি। সে বীজ থেকে বৃক্ষ হয়েছে। সে বীজ থেকে একটা জাতি জন্মলাভ করেছে। অমৃতের কথা আমরা শুনেছি। রূপ কথায়। পুরানের কাহিনীতে। অমৃত আহরণের জন্য একদিন দেবতারা সপ্তসিন্ধু মন্থন করেছিল। অমৃত সুধা পান করে দেবতারা অমর হয়েছিল। আমরা তো কেউ দেবতা নই। আমরা সাধারণ মানুষ। বর্বর দস্যু যখন আমাদের মারে তখন আমরা অসহায় হয়ে কাঁদি। ওরা যখন আমাদের মুখ বেঁধে দেয় তখন আমরা বোবা হয়ে যাই। আমরা গুমরে মরি। ওদের মারে আমরা মরে যাচ্ছিলাম। আমরা কে তা আমরা জানতাম না। আমাদের গর্ব করার কী আছে তা আমরা জানতাম না। আমাদের বোবা মনে সেদিন একটাই আর্তনাদ ছিল। কোথায় অমৃত? কোথায় অমৃত-সন্তান যারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনে নতুন প্রাণ জাগাবে। যারা আমাদের মুখে ভাষা জোগাবে।

আমরা দেবতা নই। কিন্তু আজ আমরা বলতে পারি আমরা বরকত সালামের মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু, দোসর। আমরা বরকত সালামের প্রিয়জন। বরকত সালামকে আমরা ভালোবাসি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বরকত সালাম আমাদের ভালোবাসে। ওরা আমাদের ভালোবাসে বলেই ওদের জীবন দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করেছে। ওরা আমাদের জীবনে অমৃতরসের স্পর্শ দিয়ে গেছে। সে রসে আমরা জনে জনে, প্রতিজনে এবং সমগ্রজনে সিক্ত। আমরা তাই অমরতা পেয়েছি। আজ আমরা বলতে পারি দস্যুকে, বর্বরকে এবং দাম্ভিককেঃ তোমরা আর আমাদের মারতে পারবে না। কেননা বরকত সালাম রক্তের সমুদ্র মন্থন করে আমাদের জীবনে অমৃতের স্পর্শ দিয়ে গেছে।

শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে বড় রাস্তা। বাস চলে। হর্ণ দেয়। মানুষ চলে। চীৎকার করে। ঢাকা শহরের জীবন বয়ে যায়। মানুষের জীবন বয়ে যায়। আমরা শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে আসি যাই। আমরা হাসি। তর্ক করি। দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকি। পোস্টার লাগাই। আমরা কেউ ছাত্র। কেউ কেরানী। কেউ দোকানী। কেউ কর্মচারী। শহীদ মিনারের দিকে আমরা সব সময়ে তাকাইনে। বরকত সালামকে আমরা সব সময়ে হাত তুলে সালাম জানাইনে। ওদের জন্যে মোনাজাত করিনে। কিন্তু ছাত্র শিক্ষক দোকানী কেরানী কর্মচারী কেউ আমরা কল্পনা করতে পারিনে যে শহীদ মিনারটা ওখানে নেই। কেউ কি কল্পনা করতে পারে যে বরকত সালাম আর তার সাথিরা আমাদের অমর রক্ষী হয়ে ওখানে আর পাহারা দিচ্ছে না? না, তা আমরা কেউ ভাবতে পারিনে। তেমন হলে যে ভয়ানক শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তাতে আমরা

কেউ আর আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবো না। কেউ না। আমি না। ছাত্র না। দোকানী না। কর্মচারীও না। বরকত সালাম আমাদের দিনের সূর্য, রাতের তারা। আমাদের আলো। আমাদের বাতাস। আগের দিনের মানুষ সূর্যের বন্দনা গাইত। সকালে উঠে হাত তুলে সূর্যকে স্বীকার করত, নমস্কার জানাত। কেননা তারা জানত সূর্য বাদে তাদের অস্তিত্ব নেই। আজকের মানুষ আমরা সূর্যকে বন্দনা করিনে। কিন্তু তবু সূর্যের অস্তিত্বকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? সেই আদিকালের মতো আজো এ কথা সত্য যে সূর্যের তাপেই আমাদের অস্তিত্ব। আর প্রায় বিশ বছর আগের মতো আজো একথা সত্য যে বরকত সালামের জীবনের তাপেই আমরা জীবিত।

কিন্তু বরকত সালামও আকস্মিক নয়। জীবনেই জীবন সৃষ্টি। জগতের কোনো কিছুই হঠাৎ নয়। আকস্মিক নয়। বরকত সালাম নিজেরাই সেদিন বলেছিল ওরা হঠাৎ খসা নক্ষত্র নয়। বরকত সালাম মুমূর্ষু দেশের কানে বহু দিন ধরেই আশ্বাস দিয়ে বলছিল: তোমরা ভয় করো না। আমরা আসছি। আমরা আসব। কেউ আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কেননা আমরা আমাদের মায়ের মুখের ভাষা। আমরা আমাদের পিতার মনের আশা। আমরা আমাদের বোনের চোখের স্বপ্ন। আমাদের জাতির সম্মান। জাতির মর্যাদা। আমাদের অপর নাম জীবন। কোন মৃত্যুই জীবনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আমরা আসব।

বায়ান্নর শহীদ মিনারের চত্বরে পৌঁছতে কতটা সিঁড়ি পেরোতে হয় তা আমি আজো গুনিনি। কিন্তু যখনি আমি ঐ সিঁড়ির ধাপ বেয়ে চত্বরে উঠতে চেয়েছি তখনি আমার মনে হয়েছে, এ সিঁড়ি শুধু সিঁড়ি নয়। এ সিঁড়ির ধাপ চত্বরের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে বরকত সালামেরই পূর্বাভাস। ওদের আগমনের ধ্বনি।

আজ যারা কিশোর, যারা ছাত্র তাদের কাছে মধুর ক্যান্টিন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা কতো পরিচিত। মধুর ক্যান্টিন শুধু ক্যান্টিন নয়। মধুর ক্যান্টিন কতো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অগ্রদূত। বটতলা কেবল বৃক্ষমূল নয়। বটতলা কতো ঐতিহাসিক জোটের মঞ্চভূমি। কিন্তু পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের আম গাছটিকে আজ অনেকে চেনে না। আমরা কিন্তু ঐ আম গাছটিকে চিনতাম। ঐ আম গাছের নিচেই একদিন বরকত সালামের আগমনী-সড়ক রচিত হয়েছিল।

ঘটনা তারিখ বুঝে ঘটে না। ঘটনাকে আমরা তারিখ দিয়ে স্মরণ রাখি। ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখ নয়। ঘটনা। কিন্তু বায়ান্ন সালের আগের সেই প্রস্তুতি পর্বের ঘটনাকে মনে করতে যেয়ে আজ আর তারিখ খুঁজে পাইনে। কিন্তু ঘটনার যে টুকরো আমার মনের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে তাদের আমি চোখ বুঝলেই দেখতে পাই।

একদিনের কথা মনে পড়ে। ১৯৪৮ সালেরই কোনো একদিন। আমার নিজের ছাত্রত্ব শেষ হলেও তখনকার আর্টস বিল্ডিং-এর সামনের আম গাছের আকর্ষণ আমি তখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আম গাছের তলায় সভা বসবে। কে সভাপতিত্ব করেছিল, আজ আর তা মনে নেই। রাস্তায় ১৪৪ ধারার নিষেধ। কিন্তু সেই নিষেধের বেড়াজাল ভেঙ্গে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' মুখে নিয়ে মেডিকেল কলেজের লোহার রেলিং টপকে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের মাঠ পেরিয়ে, জগন্নাথ হলে প্রতিষ্ঠিত আইন সভার উল্টো দিকে যে আমরা হাজির হয়েছিলাম সে স্মৃতি কিছুতেই মুছে যেতে চায়না। সেদিন কোন

রক্তারক্তি হয়নি। কেমন করে ঘটনার সংকট সেদিনের জন্য কেটে গেছিল, তা মনে নেই। হয়ত বা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মন-জয়-করা কথা বলার শক্তিতে। কারণ এখনো স্মৃতির পটে সেদিনকার ছাত্র জমায়েতের সামনে সেই বিপুলকায় পুরুষটির হাজির হওয়ার ছবিটি ভাসছে।

আর এক দিনের স্মৃতি।

মিছিল বেরিয়েছে। কোনখান থেকে তার শুরু হয়েছে তা আমি জানিনে। আমার চোখে ভাসছে কার্জন হল আর হাইকোর্টের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে মিছিল এগুচ্ছে। ছাত্রদেরই মিছিল। আওয়াজ উঠছে অনেক। কিন্তু সব আওয়াজের মূল আওয়াজ হচ্ছে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিছিল এবার হাজী ওসমান গণি রোডে ঢুকে পড়েছ। মিছিলের গতি বেড়ে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিছিল ইডেন বিল্ডিংস এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর কিছুক্ষণ পরে দেখলাম ছেলেরা কোনো এক মন্ত্রীকে তার কামরা থেকে নিয়ে এসেছে। মন্ত্রীকে উঠিয়ে দিয়েছে একটা বাক্স কিংবা কিছু উঁচুর উপর। সেখান থেকে উজির সাহেব বলছেন: বাবারা তোমরা বিশ্বাস কর, আমি বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি। আমি বলছি, বাংলা ভাষা ভালো। পৃথিবীর সব চাইতে ভালো ভাষা, বাংলা ভাষা। উজিরের কথা শুনে হাসব কিংবা কাঁদব তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। উজির সাহেব বলছেন, বাংলা ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ভাষা। আর এঁরাই তাকে আমাদের রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা ক্ষেত্র বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করছেন। আমি অবাক হচ্ছিলাম তরুণদের শক্তি দেখে। একটি একটি করে দেখলে এদের তো কোনোই শক্তি নেই। কিন্তু হাজার মিলে এরা কী শক্তিরই না সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শক্তি কি কেবল সংখ্যাতে? না। তা নয়। শক্তি আদর্শের ন্যায্যতায়।

আর একদিনের স্মৃতি।

সেও নিশ্চয়ই ১৯৪৮ সালের ঘটনা কায়েদে আজম এসেছেন পূর্ব-পাকিস্তান ভ্রমণে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এই তার পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম আসা। হাজারে হাজারে নয়। লক্ষের কোঠায় মানুষ যেয়ে হাজির হয়েছে রেসকোর্সের ময়দানে। পশ্চিম প্রান্তে কায়েদে আজমের মঞ্চ করা হয়েছে। পূর্ব-বঙ্গে তখন মুখর ছাত্র-জনতার আওয়াজ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। নাজিমুদ্দীন আর নুরুল আমীন সাহেবরা তখন পূর্ব-বঙ্গের শাসন চালান। লক্ষ জনতা হাজির হয়েছে রেসকোর্সে। কায়েদে আজম পূর্ব-বঙ্গের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কী বলেন তাই শুনতে। এমনিতেই দেরি হয়েছে কায়েদে আজমের আসতে। জনতা অস্থির হয়ে উঠেছে। অবশেষে এলেন তিনি। সেই পরিচিত শীর্ণকায় দীর্ঘ মানুষটি। অস্থির জনতাকে শান্ত করার জন্য ধমক দিয়ে বললেন: বৈঠ যাও। খামোশ ছে সোন। তাঁর সুরের কঠিনতা আমার কানকেও সেদিন উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। সেই উদ্বেগ শেষ হতে না হতেই শুনলাম তিনি বলছেন ইংরেজিতে: আই টেল ইউ, উর্দু অ্যালোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান। "আমি সোজা বলছি, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" এই অকরুণ আঘাতে জমায়েত লক্ষ মানুষ সেদিন স্তম্ভিত হয়েছিল। ছাত্রদের বেদনা ফেটে পড়েছিল তাদের নিজেদের হলের সাজানো তোরণ ভেঙ্গে ফেলার মধ্য দিয়ে। আর পড়েছিল পরের দিন কার্জন হলের সমাবর্তনে। সেদিন সেই সমাবর্তনে আমিও শরীক হয়েছিলাম। তার

মনের পটে এমন করে আটকা পড়ে থাকতো না যদি বরকত-সালামের অগ্রদূতরা সেদিন গম্ভীর আর মিলিত কণ্ঠে হঠাৎ তিনটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ না করত। আর শব্দ তিনটি ছিল: নো, নো, নো। না, না, না।

সমাবর্তনে পাস করা ছাত্রদের সার্টিফিকেট বিতরণ হয়ে গেছে। কায়েদে আজম এবার প্রধান অতিথির ভাষণ দেবেন। উপযুক্ত মর্যাদায় কার্জন হলের বিরাট মিলনায়তন শান্ত। কায়েদে আজম বক্তৃতা করে চলেছেন। ইংরেজি ভাষাতে। কাটা কাটা তাঁর কথা। অকরুণ কাঠিন্যে আজো তিনি বললেন: 'আই টেল ইউ: উর্দু অ্যালোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান।' আহত তরুণের দল জাতির বিবেকের বাণী হয়ে এক অপূর্ব ঐক্যতানে বেজে উঠল: 'নো, নো, নো।'

আমার এটুকুই মাত্র মনে আছে। আর সেদিন এটুকুই মাত্র ঘটে ছিল। তিনটি মাত্র শব্দ: না, না, না। অন্যায়কে আমরা মানবো না, মানবো না, মানবো না। এমন কথা বরকত-সালামের ভাই– এরাই তো বলতে পারে। আর ঠিক তারাই বলেছিল। আর সেই আওয়াজই প্রতি-মুহূর্তে জমতে জমতে বরকত-সালামদের আসার পথ তৈরি করেছিল। অপরাজেয় ন্যায়ের সড়ক বানিয়েছিল। শহীদ মিনারের সিঁড়ি এমনি করে তৈরি হয়েছিল।

১৯৭০

সরদার ফজলুল করিম স্মৃতিসমগ্র-২
সম্পাদনা: মোরশেদ শফিউল হাসান, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ইতিহাসকে পাঠ না করলে এবং বারংবার পাঠ না করলে, ইতিহাসকে দিয়ে কথা না কওয়ালে ইতিহাস কথা কয় না। তেমন হলে ইতিহাস শুয়ে থাকে। এবং তার নিশ্চেতন লাশের সমান দেহের উপরে বিকৃতি এবং বিস্মৃতির পলেস্তারা পড়তে পড়তে ইতিহাস অজানার গভীর থেকে গভীরে বিলুপ্ত হতে থাকে।

ইতিহাসকে দিয়ে কথা কওয়াতে চেয়েছিলেন অবিস্মরণীয় একটি মানুষ। তাঁর নাম হাসান হাফিজুর রহমান। যে হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর সেকালের সাথী যুবলীগের মুহম্মদ সুলতানের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন '২১-এর প্রথম স্মৃতিবার্ষিকীতেই 'একুশের সংকলন'। একুশের স্মৃতির একটি অতুলনীয়, সাহসী এবং মহৎ আকর গ্রন্থ। হাসানের আর এক অমর কীর্তি: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র নামে ১৫ খণ্ডের দলিল ভাণ্ডার বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করার কীর্তি। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র'-এর সেই আকর-সংকলনের যে কোন খণ্ডকে হাতে নিলে হাসানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে ওঠে। তখন নিজের মনেই উচ্চারণ করি: ভাগ্য আমাদের যে, হাসান নিজের জীবনপণ করে সংগৃহীত তথ্য থেকে নির্বাচিত তথ্যের এই সংকলন গ্রন্থ তৈরি করেছিলেন। এবং যথার্থই এ ব্রত পালন করতে গিয়েই অসুস্থ শরীরের কর্মী হাসান হাফিজুর রহমান জীবন দান করেছেন। এবং এদিক থেকে হাসান কেবল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম বিপ্লবী, সংগ্রামী ও সাহসী পথিকৃৎ কবি ও সংগঠক নন, হাসান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ শহীদের মধ্যে আর এক শহীদ।

স্বাধীনতার দলিলপত্র কোন ইতিহাস নয়। কিন্তু যে সচেতন উদ্যোগ, বাংলাদেশের মূল সত্তার চেতনাসমৃদ্ধ গবেষণা ও নির্বাচনের ভিত্তিতে ১৫ খণ্ডের এই সংকলন হাসানের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল, সে যতোই অপূর্ণ হোক, ১৯৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত বাঙ্গালি জাতির চেতনা-সংগ্রামের বিকাশের একমাত্র আকর-গ্রন্থ। প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা ও সরকারের কাছ থেকে এই কর্মের জন্য হাসান পেয়েছেন ও পাচ্ছেন বিস্মরণ এবং অকৃতজ্ঞতা। তাই হাসানের কথা মনে পড়লে সহোদর-সম হাসানের জন্য মমতায় আমার মন ভরে ওঠে। মাত্র ৪০০০ কপিতে মুদ্রিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র'র সেই সংকলনগ্রন্থ আজ নিষিদ্ধ গ্রন্থের মত একেবারে দুষ্প্রাপ্য। সংকলনের বাইরে যে তথ্যাদি অমুদ্রিত ছিল সে তথ্যসম্ভার নিরুদ্দিষ্ট এবং বিনষ্ট। মুদ্রিত সংকলনেরও আর কোন পুনর্মুদ্রণ ঘটেনি এবং অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে, আমাদের সস্তা সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে আশা রাখার কোন উপায় রাখছে না।

কত বন্ধুকে বললাম, কত মহলকে, স্বাধীনতা যুদ্ধের এই সংকলন গ্রন্থের পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করার তাঁরা উদ্যোগ নিন। এই সংকলন গ্রন্থমালার পুনর্মুদ্রণের তাঁরা উদ্যোগ নিন এবং তাকে পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করে তুলুন।

কিন্তু সে কামনা আমার নিষিদ্ধ কামনার মতো অপূর্ণই রয়ে গেল। অথচ কত আমাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কত অর্থের ব্যয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৬ই ডিসেম্বর কত না অনুষ্ঠানের আয়োজন।

কিন্তু আজ আমি হাসান সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব না। তাঁকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি আজ আবার হাসানের সংকলিত দলিলপত্রের প্রথম খণ্ডটি হাতে নিয়ে তার নির্বাচিত তাৎপর্যপূর্ণ দলিল ও তথ্যের জন্য হাসানের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। তার কথা উচ্চারণ করার জন্যই এই রচনাটির চেষ্টা।

দলিলপত্রের ১ম খণ্ডে ১৯৪৭ থেকে ৫৮ সাল পর্যন্ত বিস্তারিত পর্বের নানা ঐতিহাসিক দলিল, ভাষণ, বিবৃতি, বিতর্ক প্রভৃতির সংকলন করা হয়েছে। এরই মধ্যে আংশিকভাবে হলেও উদ্ধৃত হয়েছে ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে গণপরিষদের আলোচনা তথা পরিষদের কার্যবিবরণীর ভাষা নিয়ে অনুষ্ঠিত বিতর্ক।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিরও ৪ বছর আগের কথা। পাকিস্তান গণপরিষদে বক্তৃতা দান এবং কার্যবিবরণীর ক্ষেত্রে লেখা ছিল: 'কেবলমাত্র উর্দু অথবা ইংরেজিতেই পরিচালিত হবে।'

পূর্ববঙ্গ তথা সেকালের পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙ্গালি নামে নির্বাচিত কোন 'মুসলমান সদস্য' এই ধারার পরিবর্তনের সামান্যমাত্র উদ্যোগ যেখানে সেদিন নেননি, সেখানে পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তার সাথীরা প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত এবং শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেদিন মুসলিম লীগের নেতাদের তীব্র আক্রমণের মুখে অমিত সাহস ও দূরদৃষ্টি নিয়ে বাংলা ভাষার দাবিকে তুলে ধরেছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উদ্যোগ নিয়ে গণপরিষদে কার্যবিবরণীর ভাষার ক্ষেত্রে সংশোধন এনে বলেছিলেন: 'কার্যবিবরণী উর্দু অথবা ইংরেজি অথবা বাংলাতে পরিচালিত হোক'।

অত্যন্ত নিরীহ এবং যুক্তিপূর্ণ একটি প্রস্তাব। উর্দুকে নাকচ করা নয়। উর্দুর সঙ্গে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে স্থান দেওয়ার দাবি মাত্র।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তার বক্তৃতায় গণপরিষদের সভাপতিকে সম্বোধন করে (ইংরেজিতে) বলেছিলেন:

"মিষ্টার প্রেসিডেন্ট, আমার এই প্রস্তাব আমি কোন সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার মনোভাব থেকে পেশ করিনি। পূর্ববঙ্গ হিসেবে বাংলাকে যদি একটি প্রাদেশিক ভাষা বলা হয়, তবে একথা সত্য যে, আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা। ৬ কোটি ৯০ লক্ষ যদি সমগ্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসীর সংখ্যা হয়, তাহলে তার মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।

সভাপতি মহোদয়, আপনিই বলুন, একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার নীতি কি হওয়া সঙ্গত? একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে সেই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে ভাষা বলে সেই ভাষা। আর সে কারণেই আমি মনে করি আমাদের রাষ্ট্রের 'লিংগুয়া ফ্রাংকা' বা প্রকাশের মাধ্যমে হচ্ছে বাংলা।

প্রিয়, সভাপতি, আমি জানি এই কথা বলে আমি আমাদের রাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যক মানুষের আকুতিতেই প্রকাশ করছি। এই পরিষদকে আমি কোটি কোটি মানুষের সেই আকুতির কথা অবগত করবার জন্যই আজ এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছি। কি অবস্থায় পূর্ববঙ্গের মানুষ আজ বাস করছে? ধরুন একজন সাধারণ মানুষের কথা, একজন কৃষকের কথা। সে যদি ডাকঘরে যায় এবং শহরে পাঠরত তার পুত্রকে ডাকযোগে

কিছু টাকা পাঠাতে চায়, তবে 'মানিঅর্ডার ফর্মের ভাষা' সে বুঝতে অক্ষম হবে। কারণ মানিঅর্ডার ফর্মের ভাষা হচ্ছে উর্দু এবং ইংরেজি। একজন গরীব কৃষক যদি একখণ্ড জমি বিক্রির জন্য স্ট্যাম্প কিনতে যায়, তবে বিক্রিত স্ট্যাম্পের ভাষা সে বুঝবে না। স্ট্যাম্পের গায়ে কেবল উর্দু এবং ইংরেজিতেই স্ট্যাম্পের মূল্যের কথা মুদ্রিত আছে। গরিব কৃষক বুঝবে না কত টাকার স্ট্যাম্প সে কত টাকা দিয়ে ক্রয় করতে বাধ্য হল। আমাদের রাষ্ট্রের, পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের এই হচ্ছে তিক্ত অভিজ্ঞতা। অথচ যে কোন রাষ্ট্রের ভাষা হতে হবে এমন যে, সাধারণ মানুষ সে ভাষাকে বুঝতে পারে। অথচ রাষ্ট্রের ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ তার এই গণপরিষদ তথা পার্লামেন্টের কার্যবিবরণীর ভাষা সে জ্ঞাত নয়। আমি তো বুঝিনি যদি উর্দুর সঙ্গে ইংরেজি হয়, ভাষার প্রশ্নে লক্ষ মানুষের ভাষা বাংলা কেন ব্যবহৃত হতে পারবে না?

এমন নিরীহ অকাট্য প্রশ্ন এবং যুক্তির জবাবদানের ক্ষমতা সেদিনের পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ছিল না। তাই প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবের জবাবে আক্রমণের ভাষায় বলতে পেরেছিলেন: 'মাননীয় সদস্য, পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভুল ধারণা, 'মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং' সৃষ্টির অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।'

পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র বলে আখ্যাদানকারী মূর্খ লিয়াকত আলী অচিরে কেবল যে তারই 'স্বধর্মী' ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন তাই নয়, লিয়াকত আলীর এমন আক্রমণাত্মক জবাব আজ ইতিহাসের আস্তকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। লিয়াকত আলী আজ বিস্মৃত। স্মরণীয়, বরণীয় আজ সেদিনের সেই প্রতিকূল পরিবেশে যথার্থই অসহায় তথাপি সাহসী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তাঁর সঙ্গীরা।

এই বিতর্কের শেষে যখন 'উর্দু এবং ইংরেজির সঙ্গে বাংলা'র প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়েছিল তখন তমিজউদ্দীন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের সেই সভায় পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ সদস্যদের বিরোধিতার কারণ নাকচ হয়ে গিয়েছিল ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উত্থাপিত সে প্রস্তাব।

কিন্তু পূর্ববঙ্গের সচেতন রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তার সাথীরা ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে অমর হয়ে থাকার দাবিদার। অথচ আমরা ইতিহাসের এই অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনাকে বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করে ইতিহাস সৃষ্টির মূর্খ চেষ্টায় নিবদ্ধ রয়েছি।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেদিন থেকেই পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িক ও সামন্তবাদী জান্তার নির্মম আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং সে কারণেই ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বর হামলার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনী বিস্তারিতভাবে আমাদের জানা আবশ্যক। নতুন প্রজন্মকে জানানো আবশ্যক। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সাম্প্রদায়িকতার হীনমন্য এবং মধ্যযুগীয় শৃঙ্খল ভাঙ্গার জন্যই স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং মুক্তির সংগ্রাম ৪৭ সাল থেকে শুরু হয়ে ৭১ সালে চরম পরিণতি লাভ করেছিল।

একটি বিশ্বকোষ অন্বেষণ করে দেখলাম, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে লেখা রয়েছে: 'ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম রামাইল, ত্রিপুরা, ১৮৮৬। আইনজীবী, রাজনীতিবিদ। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বিএ পাস। অতঃপর

আইন পাস করে কুমিল্লায় আইন ব্যবসার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। ১৯২১-এ কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য গ্রেপ্তার। ১৯৩৭-এ কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে পুনরায় গ্রেপ্তার। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য। ১৯৪৮-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি গণ-পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে পরিষদ পরিচালনার নিয়ম-কানুনে বলা হয়েছিল যে, গণপরিষদের আলোচনায় ইংরেজি বা উর্দু ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম ব্যক্তি যিনি ভাষা প্রশ্নে সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন এবং বাংলা ভাষাকে সমান মর্যাদাদানের দাবী জানান। ১৯৫৪-তে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত। আবু হোসেন সরকার ও পরে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভার সদস্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত। মৃত্যু ২৭.০৩.১৯৭১" [চরিতাভিধান: বাংলা একাডেমি।]

সংক্ষিপ্ত এ কাহিনী যথার্থ। কিন্তু এটুকু যথেষ্ট নয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন কাহিনী বর্তমানের সংগ্রামী তরুণ প্রজন্মের জন্য অপার অনুপ্রেরণা ও তাৎপর্যময় এক জীবনের কাহিনী। তরুণরা এগিয়ে আসুন এমন জীবনের কাহিনী গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্ধার করে বাংলাদেশের বেদিমূলে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়ে।

আহা! কি মর্মান্তিক মৃত্যু বাংলাদেশের ভাষার এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ৮৫ বছর বয়সে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে ৭১ সালের ২৭ মার্চ তারিখে তিনি বন্দী হন। 'দৈনিক ভোরের কাগজ'-এ ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে তরুণ সাংবাদিক মিঠুন মুনতাসির এই মৃত্যুর যে বিবরণী সংগ্রহ করেছেন সে বিবরণ আমার মনকে আলোড়িত করেছ।

"১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ। কুমিল্লা শহরে কারফিউ। ভয়ংকর নিস্তব্ধতা চারদিকে। থেকে থেকে ফৌজি গাড়ির আওয়াজ আর কুকুরের ডাক। পঁচাশি বছর বয়সের এক বৃদ্ধকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল তখন। সন্ধ্যার সময় মাথা ধুলেন। নাতনীকে ডেকে বললেন একটি গ্রন্থ আনতে। লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে শোনালেন ঐ গ্রন্থ থেকে: 'দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলে সে মরে না, সে শহীদ নয়। সে অবিনশ্বর, তার আত্মা অবিনশ্বর।'

পুত্র-পুত্রবধূদের ডেকে বললেন: আজ রাতেই ওরা আমাকে নিয়ে যাবে। রাত বাড়তে থাকলো দেড়টার দিকে পাকিস্তান বাহিনীর ট্রাক এসে থামলো বাড়িটায়। ধরে নিয়ে গেল ঐ বৃদ্ধ ও তার পুত্রকে। তাকে রাখা হল ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে, নির্যাতন সেলে। ওই পঁচাশি বছরের মানুষটির হাঁটু দেয়া হল ভেঙ্গে। চোখ দেয়া হলো অন্ধ করে। তার দু'হাতেও চালানো হলো নির্যাতন। ওই ক্যান্টনমেন্টের একজন নাপিত দেখলো, একদিন বুড়ো মানুষটি হামাগুড়ি দিচ্ছেন একটু আড়ালে গিয়ে মলত্যাগ করবেন বলে। ১৪ই এপ্রিলের দিকে অকথ্য অমানুষিক নির্যাতনের ফলে তিনি মারা গেলেন।'

সঙ্গ-প্রসঙ্গের লেখা: সরদার ফজলুল করিম

সংগ্রহ ও সংকলন: শেখ রফিক, রোদেলা প্রকাশনী, ১১/১ ইসলাম টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভাষা আন্দোলন

ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান একটি করে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি গঠন করা হয়েছিল। ইন্ডিয়াতে বছর এক-দুইয়ের মধ্যে কনস্টিটিউশান তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু পাকিস্তানে তখনো আলোচনা চলছে। পাকিস্তান তো একটা পাকিস্তান না। লাহোর রিজলিউশানে একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল। মূল প্রস্তাবটা ছিল এ রকম: হোয়েয়ার মুসলিমস আর মেজরিটি দোজ প্রভিন্সেস উইল বি কনস্টিটিউটেড অ্যাজ অটোনোমাস অ্যান্ড সোভারিন স্টেটস। কিন্তু ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান হওয়ার পর জিন্নাহ সাহেব বললেন, 'লাহোর রিজলিউশানে একটা ভুল আছে। স্টেটস কথাটা টাইপের ভুল, কথাটা আসলে হবে স্টেট। সুতরাং ডিসেম্বর মাসেই এটা অ্যামেন্ড করে ফেলা হয়: 'স্টেটস' এর বদল 'স্টেট'। হাশেম সাহেব তখন এর বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়।

এ রকম ঘটনা তখন অনেক ঘটছিল। ভাষার ব্যাপারে বারবার উর্দুর উপর জোর দিয়ে বলা হচ্ছিল: উর্দু শ্যাল বি দি লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা অব পাকিস্তান, স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান। করাচীতে ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লিতে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছিল। তখন ল্যাংগুয়েজ নিয়ে করাচীতে বৈঠক হচ্ছে। মূলনীতি কমিটির বৈঠক হচ্ছে। ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস ফর দি কনস্টিটিউশান কি কি হবে সেসব নিয়ে আলোচনা চলছে। অ্যাসেমব্লি সদস্যরা কোন কোন ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারবে তা অ্যাসেমব্লির রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের মধ্যে লেখা থাকে। সেখানে লেখা ছিল, মেম্বারস মে স্পিক ইন উর্দু অ্যান্ড ইন ইংলিশ।

কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে তখন নেতৃস্থানীয় ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় এরা সব। অ্যাসেমব্লির এক সভায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম বাংলা ভাষার প্রশ্নটি তুলেছিলেন। ধীরেন দত্ত কুমিল্লা কোর্টের এক জন বড় উকিল ছিলেন। তিনি অ্যাসেমব্লির প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'স্যার আই হ্যাভ এন হাম্বল সাবমিশন। পাকিস্তানের মানি অর্ডার ফর্মে যদি শুধু উর্দু আর ইংরেজি ব্যবহার করা হয় তবে ইস্ট বেঙ্গলের কৃষকেরা কীভাবে এই ফর্ম ব্যবহার করবে? ধরা যাক, কৃষকের ছেলে স্কুলে পড়ে। সেই ছেলে বাবার কাছে টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছে। বাবা তাকে মানিঅর্ডার করবে। এই কৃষক ফাদার কীভাবে মানিঅর্ডার ফর্মটা ব্যবহার করতে পারবে?' এসব কথা অবশ্য সবই ইংরেজিতেই হচ্ছিল। মানিঅর্ডারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে তিনি বললেন, আই হাম্বলি সাবমিট, ইন দি রিজলিউশান, দি মেম্বারর্স মে স্পিক আইদার উর্দু অর ইংলিশ, টু অ্যাড অ্যানাদার ওয়ার্ড দ্যাট দি মেম্বারর্স মে স্পিক আইদার উর্দু অর ইংলিশ অর বেঙ্গলি।' দ্যাট ওয়াজ দি সাবমিশন অব ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইন ১৯৪৮। কিন্তু তাঁর সেই বিনীত দাবিটাকে দমন করা হল। লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ভয় দেখাল এই বলে যে 'তুমি প্রভিন্সিয়ালিজম প্রিচ করছো, এটা চলবে না'। এসব কথা ইতিহাসে আছে।

৪৮ এর মার্চ মাসেই মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এলেন এবং রেসকোর্সে বক্তৃতা দিলেন। গরমের দিন ছিল তখন। পশ্চিম দিকে যেখানে এখন টিএসসি, সেখানে

রেসকোর্সে ঢোকার একটা গেট আছে। ঐখানে মঞ্চ তৈরি করা হয়। পাশেই ছিল কালীমন্দির, রমনা কালীমন্দির যেটা পাকবাহিনী ৭১ সালে ভেঙ্গে ফেলে। পাশে মা আনন্দময়ীর আশ্রমও ছিল। আমরা নিজেরা ভিজিট করেছি সে আশ্রম, বসেছি সেখানে। এ আশ্রমটা অবশ্য আগে থেকেই উঠে গিয়েছিল। হতে পারে মা আনন্দময়ী ঢাকা থেকে চলে গিয়েছেন বলে। কালীমন্দিরটা কিন্তু তখন ছিল।

সে সময় আমি ঢাকাতে দুইটা মিটিং-এ অ্যাটেন্ড করি। এর মধ্যে একটা হচ্ছে রেসকোর্সের সেই মিটিংটা। মুহম্মদ আলী জিন্নাহর কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে: 'চুপ করো, বৈঠ যাও, খামস সে সুনো।' খুব বড় মিটিং ছিল সেটা এবং খুবই অরগানাইজড। তখনকার দিনের মুসলিম পপুলেশন বা ছাত্রদের মধ্যে 'কায়েদে আজম' খুবই পপুলার টার্ম। ইট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট ভিজিট ইন ঢাকা। দেশ তখন মুসলিম লীগের আমেজে আচ্ছন্ন। ছাত্ররা তখন ইনসপায়ারড বাই পার্টিশন অ্যান্ড ইনটেলিজেন্স অব জিন্নাহ। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাথে মোকাবিলা করার কারিশমা ইত্যাদি ব্যাপারের জন্যে জিন্নাহ তাদের কাছে তখনো 'মহান নেতা'। কাজেই পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্তি বা ডিসইল্যুশনমেন্ট, যাকে আমরা বলি, সেটা তখনো শুরু হয়নি। সেদিন সম্ভবত ১৬ই মার্চ, ১৯৪৮। কিন্তু আমার মনে আছে জিন্নাহ সাহেবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করে ১১ই মার্চে– এটা আমার মনে আছে। তা হলে জিন্নাহ সাহেব সম্ভবত ৮ই মার্চ তারিখে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

জিন্নাহ সাহেবের সব কথা তো আমার মনে নাই। রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: 'উর্দু অ্যান্ড উর্দু এলোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে, একে বাঁচাতে হবে, রিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে। অ্যান্ড আই ওয়ার্ন ইউ দ্যাট দেয়ার আর ফিফথ কলামিস্ট এমাংস্ট ইউ। কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না' ইত্যাদি। যে কথাটা এখনো কানে বাজছে সেটা হচ্ছে, অ্যাজ ফার অ্যাজ ল্যাংগুয়েজ ইজ কনসার্নড 'উর্দু অ্যান্ড উর্দু এলোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান।'

কমিউনিস্টদের ব্যাপারটা ওখানে উপস্থিত হাজার হাজার ছাত্রদের যতটা না উত্তেজিত করেছে তার চাইতে দশ গুণ বেশি উত্তেজিত করেছে 'কায়েদে আজম' এর ভাষাসংক্রান্ত ঐ মন্তব্যটা। ছাত্রদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয় সাংঘাতিক। জিন্নাহ সাহেবকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যে ছাত্ররা ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল... এ সমস্ত জায়গাতে গেট বানিয়েছিল। কিন্তু রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে সেই সব গেট তারা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে ফেলল।

'নো, নো, নো'!

এর একদিন পর কার্জন হল স্পেশাল কনভোকেশনের আয়োজন করা হয়। সেই কনভোকেশনে জিন্নাহ সাহেব নিজ হাতে ডিগ্রির সার্টিফিকেট দেবেন– এমন কথা ছিল। সেই ডিগ্রির সার্টিফিকেট তিনি ডিস্ট্রিবিউট করেন তাঁর বক্তৃতার আগে কিংবা পরে। আমি তখনো পর্যন্ত আমার সার্টিফিকেট নিইনি। কার্জন হলের অনুষ্ঠানে প্রথমে ছিল শিক্ষকদের বসার জায়গা, তার পেছনে ছিল ছাত্ররা। আমি ইচ্ছে করলে শিক্ষকদের সঙ্গে বসতে পারতাম। শিক্ষকেরা তাদের জায়গা থেকেই ডিগ্রি আনতে স্টেজে যাবে। আমি সেখানে

বসিনি। তা ছাড়া ডিগ্রি নিতে হলে আগে থেকে রেজিস্ট্রারের সাথে যোগাযোগ করে ফর্ম পূরণ করতে হত। সেসব কিছুই আমি করিনি।

জিন্নাহ সাহেব তাঁর স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড ল্যাংগুয়েজ ইংরেজিতে ভাষণ দিলেন। রেসকোর্সেও ইংরেজিতে ভাষণ দিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে যখন শব্দ হয়েছে বা গণ্ডগোল হয়েছে, তখন উর্দুতে দুই-একটা কথা বলেছেন। কার্জন হলে তিনি উর্দুতে কিছুই বলেননি, তার প্রয়োজনও হয়নি। জিন্নাহ সাহেব যখন রাষ্ট্রভাষার কথায় এলেন তখন তিনি রেসকোর্সের কথাটাই রিপিট করলেন: 'আই টেল ইউ, অ্যাজ ফার অ্যাজ ল্যাংগুয়েজ ইজ কনসার্নড 'উর্দু অ্যান্ড উর্দু এলোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান।' এ সময়ে ছাত্ররা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে তিনটা আওয়াজ বের হয়েছিল 'নো, নো, নো'। জাস্ট তিনটা শব্দ। কোনো গোলমাল নয়, হৈচৈ নয়। এই তিনটা শব্দই শুধু ছাত্ররা উচ্চারণ করেছিল পিছনের সারি থেকে। এই তিনটা আওয়াজ সে সময়কার রেডিও রেকর্ডিংয়ে নিশ্চয়ই ছিল। পরে হয়তো মুছে ফেলা হয়েছিল। জিন্নাহ সাহেব হেজিটেটেড ফর এ সেকেন্ড অ্যান্ড স্টপড, বাট দেন হি কনটিনিউড হিজ ওউন স্পিচ অ্যাজ হি ওয়ান্টেড টু।

জিন্নাহ সাহেবকে এস্কর্ট করে কার্জন হলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কারা কারা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল, তা এতদিন পরে আর মনে নেই। তবে একটা কথা মনে আছে, জিন্নাহ সাহেবকে যখন এস্কর্ট করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কার্জন হলের পিছন দিকের গেটটা ব্যবহার করা হয়েছিল। সামনের গেট দিয়ে তাঁকে বের করা হয়নি।

জিন্নাহ সাহেব ১১ই মার্চের আগেই চলে গেছেন কিনা আমি জানি না কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ১১ই মার্চ তারিখে যে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল তা ইতিহাসে আছে। আমি নিজেও পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ করেছিলাম। কেননা পুলিশ তখনো পর্যন্ত আমার পিছনে লাগে নাই। আমি তখন শিক্ষকতা ছেড়ে এসেছি। বিভিন্ন সভা সমিতিতে যাচ্ছি। নিজেকে ওপেন রেখেছি।

পাকিস্তান হওয়ার পর ইডেন কলেজের বিল্ডিংটা সরকার দখল করেছে। সেটাই তখন সেক্রেটারিয়েট। মিনিস্টাররা সেখানে অফিস করা শুরু করেছিল। ইডেন কলেজটা তখন চলে গেছে ওয়াইজ ঘাটে এখন যেখানে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি সেখানে। মনে পড়ছে, কার্জন হলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা একেবারে সেক্রেটারিয়েটে চলে গেছে, আমরা ছাত্ররা সব মিছিল করে সে রাস্তা ধরে এগোচ্ছি। তোহাও পিকেটিংয়ে পার্টিসিপেট করেছিল। ১১ই মার্চের পিকেটিংয়ের সময় তোহাকে সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে নির্মমভাবে পেটানো হয়েছিল।

একটা ঘটনা আমার মনে আছে যে, ছাত্ররা সেক্রেটারিয়েট থেকে এক জন মিনিস্টারকে বের করে এনেছিল। তিনি এডুকেশন মিনিস্টার বা অন্য কোনো মিনিস্টার হবেন। কোন মিনিস্টার তিনি ছিলেন তা মনে নেই তবে এটা মনে আছে যে তার বাড়ি ছিল পিরোজপুরে। ছাত্ররা তাকে ধরে এনে একটা বাক্সের উপর উঠিয়ে দিয়ে বলেছে, 'আপনি এখন বলেন।' তখন ঐ লোক ভয় পেয়ে বলেছে, 'বাবারা তোমরা শোনো। বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ ইজ দি বেস্ট ল্যাংগুয়েজ। আমি বাংলা ভাষাকে সাপোর্ট করি।' ছেলেরা তখন সেই মিনিস্টারের কাছে দাবি জানিয়েছিল: আপনাদের রিজলিউশন নিতে হবে, বাংলাকে পাকিস্তানের ওয়ান অব দি স্টেট ল্যাংগুয়েজেস অব পাকিস্তান ঘোষণা করতে হবে।

এখনো মনে পড়ছে, পিকেটিং করার সময় আমি তাজউদ্দীন আহমদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি মেইন পোস্ট অফিসের সামনে। মেইন পোস্ট অফিসটা ছিল এখন যেখানে টি অ্যান্ড টি অফিস সেখানে। তখন তো আর এলাকাটা এখনকার মতো ছিল না, আরো ছোট ছিল। পশ্চিম পাশে যে এক্সটেনশন সেটাই ছিল মেইন বিল্ডিং। পাশে একদিকে ছিল খেলার মাঠ। এখন আপনারা আর রিকলেক্ট করতে পারবেন না, অন্তত আমি যেভাবে পারি সেভাবে পারবেন না। এর এক পাশে ছিল ব্রিটানিকা সিনেমা যেখানে ইংরেজি ছবি দেখানো হত, আর এক সাইডে ছিল নবাবদের একটা বড় রেস্টুরেন্ট: ডিয়েনফা।

এ সময় থেকে মুসলমান ছাত্রদের মোহমুক্তি শুরু হল। সবার অবশ্য হল না মোহমুক্তি। ছাত্রলীগ গ্রুপিং ছিল: শাহ আজীজ গ্রুপ ছিল, তোয়াহাদের গ্রুপ ছিল। আমি মুসলিম লীগের কেউ ছিলাম না। কিন্তু তোয়াহা ওয়াজ প্রমিনেন্ট মুসলিম লীগ লীডার। তাজউদ্দীন ওয়াজ প্রমিনেন্ট মুসলিম লীগ লীডার অব ইস্ট বেঙ্গল। কামরুদ্দীন আহমদ ছিলেন। তিনি অবশ্য স্টুডেন্ট ছিলেন না। কিন্তু তার স্টুডেন্ট সাপোর্টাররা ছিল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের মার্চ–এই কয়েক মাসেই পাকিস্তান সম্পর্কে মোহমুক্তি হয়ে গেল ছাত্রদের। এই মোহমুক্তিটা একটা অ্যাগ্রেসিভ রূপ নিল ১৯৫২ সালে। এটা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ সময় নানান জনে নানান কথা বলছেন। মুসলিম লীগের মিনিস্টার ফজলুর রহমান সাহেব অ্যাডভোকেটেড: বেঙ্গলি শুড বি রিটেন ইন অ্যারাবিক হরফ, ইন অ্যারাবিক লেটার্স। ১৯৪৮ এর মোহমুক্তিটাই ম্যাচিউর করল ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে।

আমরা সাধারণত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করি। তা কিন্তু নয়। ভাষা আন্দোলনের শুরু হয়েছিল আরো আগে, ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের আগে। ভাষা নিয়ে যখন প্রাদেশিক পরিষদে আলাপ আলোচনা শুরু হয় তখন এই মোহমুক্তির ঘটনা কিছুটা ঘটতে শুরু করে। আগেই বলেছি পাকিস্তান কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব দিয়েই ভাষা আন্দোলনের শুরু। সে জন্যে আমি মনে করি এবং অনেকেই এটা বলেছেন যে, ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ বা সৈনিক যদি আমরা কাউকে বলতে চাই তবে বলা উচিত, তিনি হচ্ছেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি হচ্ছেন পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের প্রথম উপস্থাপক। ৭১ সালে তিনি যেভাবে নির্মমভাবে নিহত হলেন পাক আর্মীর দ্বারা, তাতে তিনি তাঁর জীবনের যে আদর্শ ছিল সে আদর্শের জন্যে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে গেলেন– এটা বলতে গিয়ে আমি আবেগতাড়িত হয়ে পড়ি।

সেই সে কাল: কিছু স্মৃতি কিছু কথা
সরদার ফজলুল করিম, প্যাপিরাস, ১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

জাত 'একুশে': জনক 'একুশে'

একুশের বয়স ৪৫: আমার বয়স ৭০। আমি বলি বৃদ্ধ। আমার বার্ধক্য।

একুশের বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে, একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে যখন অনুরোধ আসে কিছু বলার, তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ বিব্রতবোধ করি। কারণ আমি কোনো গুরুগম্ভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ কিংবা বক্তব্য তৈরি করতে পারি না। কোনোদিন তেমন লিখিনি বা বলিনি। অন্তত একুশ নিয়ে। গুরুগম্ভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধের এই এক সুবিধা। তাতে রফিক-শফিক-জব্বার-বরকত-সালাম: এ নামগুলো উচ্চারণে আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে না। কিন্তু আমার এমন হয়।

একদিকে যেমন একুশকে আমাদের এই জনপদের, এই উপমহাদেশের মহৎ সংগ্রামের সমগ্র ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা বলে আমি মনে করিনে, তেমনি অপরদিকে এই একুশ আর তার বরকত-সালাম-রফিক-শফিক-জব্বাররা আমার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সঙ্গে এমন অপরিহার্যরূপে জড়িত যে, তাদের কথা স্মরণ করে সহজভাবে কোনো কথা বলা আমার অসাধ্য বলে বোধ হয়। বার্ধক্যে এই আবেগ এবং অক্ষমতা উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

কেবল আজ নয়, ৪৫ বছর আগেও বোধ করছি- 'একুশে' আমার জীবনে কেবল কোনো ঘটনা নয়। 'একুশে' একটি মহৎ প্রতীক। রফিক-শফিক-জব্বার: এরা কোনো ভিন্ন নাম নয়। এদের সম্মিলিত নামই হচ্ছে 'একুশে'।

একটি মহৎ প্রতীক কেবল বিমূর্ত কোনো শক্তি নয়, কোনো স্মারক নয়। একটি মহৎ প্রতীক যে একটি বাস্তব জীবন হিসেবে প্রকাশিত হতে পারে, সেই অকল্পনীয় ঘটনারই সাক্ষ্য হচ্ছে 'একুশে' ফেব্রুয়ারি।

ব্যক্তিগতভাবে কখনো একুশকে ভেবেছি নিজের সন্তান হিসেবে। আমার রক্ত থেকে জাত সন্তান– যে তার শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে পা রেখেছে। তারপরে কিশোর তার দৃপ্তপদভারে যৌবনের জীবনকে আরো রক্তে, আরো জীবন, আরো শক্তিকে নিজেকে প্রকাশ করেছে। যৌবন এখন পরিণত হয়ে ৪৫-কে পূর্ণ করছে। '৫২-তে জাত শিশুর পরিণত ৪৫-এর দিকে তাকালে একটা জিজ্ঞাসা আমার মনে জাগরিত হয়: এই পূর্ণবয়স্কের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য কি? জীবনের কতো বাঁকে সে পেরিয়ে এসেছে। কোন বাঁকে তার কী চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং এখন এই '৯৭-তে রাষ্ট্র থেকে পরিচয়ের নৈকট্যে এবং সব সীমানা বিলোপে একটি ক্ষুদ্র ঘূর্ণ্যমান গ্রহের বুকে দাঁড়িয়ে '৫২'র সেই একুশ '৯৭-তে কোন বাঁকের দিকে দৃষ্টি করছে। কী করণীয়কে সে উচ্চারণ করতে চাইছে। কী করণীয়ের সম্মুখে এসে সে উপস্থিত হয়েছে। কোন কর্তব্য সাধনের মধ্যে তার নিজের ৪৫ বছরের জীবনের সার্থকতা।

এরকম কথা উচ্চারণ করতেই আমার ভয়। এ হচ্ছে গুরুতর কথা। গুরুত্বপূর্ণ কথা। উপযুক্ত ব্যক্তিরা তার আলোচনা করবেন।

একুশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক 'জাত' এবং 'জনক'-এর সম্পর্ক। 'জনক' এবং 'জাত'-এর সম্পর্ক। আজ যদি তাকে দেখি আমাদের মানুষরে সমগ্র মানবজাতির অতিক্রান্ত

মহৎ ইতিহাস থেকে জাত এক জীবন হিসেবে, তেমনি আমি দেখি তাকে আমার সাক্ষাৎ জনক হিসেবে।

যে সন্তান তার নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তার পিতাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে, সে সন্তান সন্তানের অধিক হয়ে পিতার পিতাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

এ কেবল কথার কথা নয়। ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস।

এ অনুভূতিকে পাঠক বা শ্রোতা কারুর কাছে বাস্তব করতে হলে একটু স্মৃতিচারণে যেতে হয়। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণটিকে পাঠক কিংবা শ্রোতা সকল সহানুভূতির চোখে দেখবেন সেই অনুরোধটি রাখছি।

'৫০ সালে সিলেট জেল থেকে আমাকে আবার বদলি করে নিয়ে আসা হলো রাজশাহী জেলে। ঢাকা থেকে ৫৮ দিনের অনশন সংগ্রামের পরে নিয়েছিল সিলেটে। শত শত রাজবন্দীতে তখন পূর্ববঙ্গের বন্দীশালাগুলো ভরতি। ঢাকা থেকে সিলেট। সিলেট থেকে রাজশাহী। এমনিভাবে এক জেল থেকে এক জেলে যাই। হাতে থাকে হাতকড়া। পাশে থাকে বন্দুক হাতে সিপাই-শান্ত্রী। রেলের স্টেশনে কিংবা গাড়িতে অথবা জাহাজের ডেকে যাত্রিরা বোবা চোখে চেয়ে থাকে কৃশদেহ লোহার হাতকড়াতে বদ্ধ বন্দীর দিকে। তাদের দৃষ্টির অর্থ পড়তে পারি না। কী আছে সে দৃষ্টিতে। অভয় না অভিশাপ? হতাশায় মন ভরে ওঠে তবে কি ঢাকা জেলের নাজির জমাদারের কথাই ঠিক? আমরা কি কেউ আর বেরুতে পারবো না। এই বন্দীশালা থেকে? আমাদের দেশ কি এমনি বোবা হয়ে থাকবে যুগের পর যুগ? আমাদের কি কোনো ভবিষ্যৎ নেই? উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ?

...এ অবস্থা ছিল আমাদের জন্যে সেদিনকার শ' শ' রাজবন্দী, রাজনৈতিক কর্মীর জন্য দুঃসহ। এমন জীবন কারুর পক্ষে, প্রায় ৫০ বছর পরের আজকের বাংলাদেশের কারুর পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। এ জীবন যে মৃত্যুর চেয়ে অধিক। হতাশার জীবন। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের জীবন।

এমনি হতাশায় কাটে '৫১ সালও।

তারপর হঠাৎ এলো একুশে ফেব্রুয়ারি। এলো '৫২ সাল। একুশে ফেব্রুয়ারি: একটি শিশু, একটি কিশোর রক্তে রাঙা।

ওর আসার দিন এখনো আমার চোখের ওপর জ্বলজ্বল করে ভাসছে।

ও এলো জেলের সুপার, জেলার, হেড জমাদার, গেট, পাহারা সবাইকে ফাঁকি দিয়ে খবরের কাগজের একটা বিরাট ফাঁকের মধ্যে দিয়ে।

সে ব্যাপারটা যেমন বিস্ময়ের, তেমনি আনন্দের আর কৌতুকের।

সরকার আর জেলের কর্তারা আমাকে খবরের কাগজ পড়তে দিলেও জেলের বাইরের আন্দোলনের কোনো খবর জানতে দিতে চায় না। তাই আজাদ, মর্নিং নিউজ বা পাকিস্তান অবজারভাব যে পত্রিকাই জেলের ভিতরে পেতাম, তার সবগুলোই জেল আর বিশেষ পুলিশের কর্তারা তন্ন তন্ন করে পড়ে তা সেন্সর করে দিতো। তাদের সতর্ক দৃষ্টি: বাইরের কোনো আন্দোলনের খবর যেন জেলে রাজবন্দীদের কাছে পৌঁছতে না পারে। এজন্যে ওরা কোনো খবরের কাগজে কোনো আন্দোলনের খবর থাকলে তার ওপর কালি লেপে বা কাঁচি দিয়ে কেটে খবরের কাগজে জানালা করে আমাদের কাছে দিতো।

তাতে আমাদের তেমন কোনো ক্ষতি হতো না। আমরা কাগজের গায়ে ফুটো দেখে আন্দাজ করতাম, ওখানে নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষের, জনতার পক্ষের কোনো খবর

ছিল। নিশ্চয়ই বাইরের জনতা অত্যাচারের শিকল ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। এই কথা মনে করে আমরা উৎসাহ পেতাম। নিজেদের মনে ভরসা বোধ করতে চাইতাম।

'৫২ সালের প্রথম দিক থেকেই আমরা দেখছিলাম যে, আমাদের জেলের ভিতরে খবরের কাগজে জানালার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কাগজের এখানে ফুটো ওখানে ফুটো। এখানে কালি লেপা ওখানে কালি লেপা। এ দেখে আমরা ক্রমেই বেশি খুশি হয়ে উঠছিলাম। আমরা কেউ ছিলাম 'ডিগ্রী' বন্ধ। তিনদিকে নিরেট দেয়ালবদ্ধ ছোট্ট খুপরি। আবার কেউ ছিলাম অপর বন্দীদের সঙ্গে এক একটা বড়ো ঘরে। জেলের ভাষায় ওয়ার্ড বা 'খাতা'য়। এক সঙ্গে যারা থাকতাম তারা খবরের কাগজের এই জানালা আঙ্গুল দিয়ে মেপে দেখতাম। কোনটা ছোট্ট কোনটা বড়ো। খবরের কাগজের জানালা যতো বড়ো হতো, আমাদের মনের আনন্দ ততো বেড়ে যেতো। আমরা ভাবতাম, এই যে এতো বড়ো করে ওরা কাগজ কেটেছে, নিশ্চয়ই এখানে জনসাধারণের কিংবা ছাত্র আন্দোলনের কোনো বড়ো খবর ছিল।

এইভাবে খবরের কাগজের জানালা বড়ো হতে লাগলো। সেই জানালার ফাঁক দিয়ে বন্দীশালার বাইরের জগতের মুক্ত বাতাসের আমরা কল্পনা করতাম।

...একুশে ফেব্রুয়ারি নয়, বাইশে ফেব্রুয়ারির কথাও নয়, বলছি রাজশাহী জেলের ২৩ ফেব্রুয়ারির কথা। রাজশাহী জেলে ঢাকার কাগজ আমরা একদিন পরে পেতাম।

২৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে কিংবা বিকেলে সিকিউরিটি জমাদার, মানে রাজবন্দীদের তদারকি জমাদার, ঢাকার ২২ ফেব্রুয়ারির খবরের কাগজ দিয়ে গেলো, যে কাগজে ছিল একুশে ফেব্রুয়ারির খবর।

রাজবন্দীরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, নতুন কী খবর এসেছে দেখার জন্য।

কিন্তু খবর কই? কাগজই বা কই? অবাক চোখে দেখলাম কাগজের মাথায় কাগজের নাম বাদে আর কিছুই যে আস্ত নেই। জানালা তো জানালা, সমস্ত কাগজ কেটে ওরা বিরাট এক দরজা বানিয়ে দিয়েছে। সে দরজা দিয়ে ইচ্ছে করলে আমরা পুরো মানুষ মাথা গলিয়ে এপার-ওপার যাওয়া আসা করতে পারি।

আমরা করলামও তাই। খবরের কাগজে অতো বড়ো জানালা দেখে আমাদের মনে ফূর্তি আর ধরে না। চোখ থেকে আনন্দের পানি ঝরতে আরম্ভ করেছে।

আমরা ছেলে-বুড়ো-কিশোর, কৃষক-শ্রমিক যত রাজবন্দী একসঙ্গে ছিলাম তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরতে লাগলাম। আমরা চিৎকার করে বলতে লাগলাম, আমরা জীবন পেয়েছি। আর আমাদের মারে কে? দেখো দেখো কতো বড়ো জানালা? জানালা নয় তা দরজা! শিকল ভাঙ্গার দরজা। মুক্তির দরজা।

আর সেদিনকার সন্ধ্যা না ঘনাতে সত্যি সেই খবরের কাগজের দরজা দিয়েই শুনতে পেলাম ছাত্র-জনতার মিছিলের আওয়াজ: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই: রাজবন্দীদের মুক্তি চাই: ছাত্র হত্যার বিচার চাই!

একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি

সরদার ফজলুল করিমের অগ্রন্থিত প্রবন্ধ সংকলন

সংকলন: শেখ রফিক, র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিবর্তিত একুশে: বন্দী একুশে

অমর একুশের প্রতি আমার ব্যক্তিগত ঋণের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আমার আলোচনাটি শুরু করছি।

'অমর একুশে বক্তৃতা': কথাটি অবশ্যই ভারী। এদিনে ভারী কথাই বলতে হয়। পাতলা কথা বলা মানায় না। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত এক অসুবিধা, ভারী কথা আমার মত পাতলা মানুষের মানায় না। এবং সে কারণে এই ভারী শিরোনামের যে আমি একান্ত অনুপযুক্ত এবং অযোগ্য, তা ভেবে সংকুচিত আমি, অধিকতর সংকুচিত বোধ করছি। তবু দায়িত্ব এড়াবার উপায় নেই। তাই এই উপস্থিতি। কিন্তু ভারী প্রকাশ করার অতিরিক্ত কিছু সুধী শ্রোতাদের সামনে পেশ করতে সক্ষম হব না। কোন তত্ত্বকথা বা গবেষণা উপস্থিত করা সম্ভব হবে না। জীবনের দিকে তাকালে কেবল এই ভরসাটুকু পাওয়া যায়, জীবনটা পাতলা-ভারীতে ভরা। কেবল ভারী হলে আমাদের মত দুর্বল, কৃশ, পাতলা মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হত। এ তত্ত্বের একটা প্রমাণ বক্তা নিজেই। '৫২ কিংবা তারও পূর্ব থেকে '৮৭ পর্যন্ত যে 'বর্তে' না হলেও 'বেঁচে' থাকার অবিশ্বাস্য ঘটনার সাক্ষ্য হয়ে সমুপস্থিত হতে পেরেছি, তার একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই এই যে, আমি ভারী নই। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশী না বলাই ভাল।

'৫২ কিংবা '৫২-র পূর্ব থেকে' ৮৭: ৩৫ বছর তো বটেই আরও অধিক। তত্ত্ব দিতে না পারলেও কিছু তথ্য দানের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে পারিনি। কিছুটা সচেতনভাবে কেবল যে' ৪৮ সালের মার্চ মাসে কার্জন হলে সেদিনকার দুর্দমনীয় দীর্ঘ-কৃশ জিন্নাহ সাহেবকে বলতে শুনেছি এবং দেখেছি:

"উর্দু অ্যান্ড উর্দু অ্যালোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান" এবং সেই বাক্যে শেষ না হতেই পেছনের সারির তরুণ ছাত্রদের কণ্ঠ থেকে 'নো, নো, নো' শব্দের প্রতিধ্বনিতে শিহরিত হয়েছি, তাই নয়।

এই ঢাকার বুকে ১৯৪৫-এর রশীদ আলী-নৌবিদ্রোহ দিবসে দাঙ্গাপীড়িত শহরে হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতির আওয়াজ নিয়ে সংগঠিত মিছিলে শরীক হয়ে উৎফুল্ল বোধ করেছি। '৪৮-এর মার্চেই কার্জন হলের রাস্তা ধরে আবদুল গনি রোডে প্রবেশ করে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের যে মিছিল মুসলিম লীগের এক মন্ত্রী সাহেবকে সেক্রেটারিয়েটের গেটে একটি উঁচু টেবিলে দাঁড় করিয়ে 'বাংলাভাষা পৃথিবীর সবচাইতে ভাল ভাষা' বলে বক্তৃতা দেওয়াতে বাধ্য করেছিল, সে মিছিলে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে সে কৌতুকজনক দৃশ্য দেখে জীবনের উঠতি-পড়তির চমকে চমৎকৃত হয়েছি। '৪৮ কিংবা '৪৯-এ সেই যে ছাত্ররা মিছিল করে বর্তমানের ধ্বংসপ্রাপ্ত জগন্নাথ হলের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকালে পরিষদের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বাংলাভাষার অধিকারের দাবীর আওয়াজ নিয়ে, এবং সেই মিছিলকে শান্ত করতে এবং তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য বিরাটদেহী প্রায় কৃষ্ণবর্ণ এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের যে এসে সেই মিছিলের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই দৃশ্যটিও তো এখন মনের চোখে অমলিন।

এবং সে কারণেই একটি দায়িত্ববোধ। যা দেখেছি, সমবেত শ্রোতা তথা' ৫২-উত্তর প্রজন্মকে তা বলা। সাক্ষাৎ দর্শকের বলা এবং অদর্শকের বিবরণের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা

পার্থক্য থাকে। আবেগগত পার্থক্য। সাক্ষাৎ দর্শকের বিবরণের মধ্যে একটা আবেগের দিক থাকে। অদর্শক ইতিহাস রচনাকালের সেই আবেগটি সম্ভব নয়। আজ যাদের বয়স ৩৫ তথা ৫২-তে যারা জাত এবং যারা আজ বর্তমানকে শাসন করছে, পরিচালিত করছে, যারা বাংলাদেশকে ভাঙ্গছে, গড়ছে, তারা '৪৫ দেখেনি, '৪৮ দেখেনি, '৫২ দেখেনি। এমন কি' ৭১-এর সাক্ষাৎ দ্রষ্টাদের অনেকেই আজ নিহত এবং মৃত। এমন অবস্থাতে '৪৫, '৪৭, '৫২-র দ্রষ্টা: সে ক্ষুদ্র আমি হই, কিংবা বৃহৎ অপর কেউ হন, তাদের দায়িত্ব রয়েছে তাদের সেই সাক্ষাৎ দর্শনের কথা বলে যাওয়া। বর্তমানের যে যেভাবে সেই কথাকে নিতে চান, তিনি সেভাবেই তাকে দিতে পারেন। তাতে বক্তার কিছু বলার নেই। আমি কেবল আমার দায়িত্বের কথাটি বললাম।

তবু এই সভাতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তিগত জীবনেরও সেই ৪০, ৪৫ তথা প্রায় ৫০ বছরের অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নয়। অবশ্য তেমন বিস্তারিত কোন কাহিনীর ভাণ্ডারীও আমি নই। কাহিনীর বড় ভাণ্ডারী না হলেও, একুশকে নিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, একুশের কাছে আমার একটি ব্যক্তিগত ঋণের ব্যাপার আছে।

'একুশে' 'ব্যক্তিগত ঋণ' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারেই বুঝা যায়, 'একুশে কেবল একটি তারিখ নয়। পূর্ববাংলার '৪৭-উত্তর মানুষের, বিশেষ করে ধর্মগতভাবে তার প্রধান সমাজ, মুসলমান সমাজের ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী এবং মধ্যবিত্ত কেরানী-কর্মচারী-শিক্ষক-অধ্যাপকের আবেগ তার মূর্তিমান স্বাক্ষর। যেন একুশে এক মহান ব্যক্তি। তাই 'মহান একুশে'। যেন 'একুশে একজন শিক্ষাদাতা'। তাই 'একুশে আমাদের শিখিয়েছে, মাথা নত না করতে।' যেন একুশে এক নিহত পথিকৃৎ। তাই 'অমর একুশে।'।

এসব শব্দের ব্যবহার থেকে আমার মনে ইংরেজী 'মিথ' শব্দটির আসল অর্থ কি, সে প্রশ্নটি সম্প্রতি জাগ্রত হয়েছে। 'একুশে' যথার্থই আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। অনেক শব্দকে সে সৃষ্টি করেছে। অনেক শব্দের অর্থকে সে বদলে দিয়েছে। একটি তারিখকে সে ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। একক কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নয়। বহু ব্যক্তির সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব। একুশে কোন এক ব্যক্তির নাম নয়। কেবল বরকতের বা সালামের নাম নয়। বরকত-সালাম রফিক-জব্বার-শফিক: সকলের নাম 'একুশে'। এই 'একুশে' কি মিথ তথা বস্তুহীন বিশ্বাস, না বস্তুময় অস্তিত্ব? 'ফিকশন' না 'ফ্যাক্ট'? কতখানি ফ্যাক্ট এবং কতখানি ফিকশন বা কল্পনা, তা হয়ত গবেষণার বিষয়। তা আমার জানা নেই। তবু '৫২ থেকে '৮৭ পর্যন্ত একুশের বিবর্তন আমার কাছে এই সত্যটিকে যেন উদঘাটিত করছে যে, মানুষের ইতিহাস বিনির্মাণে ফ্যাক্ট যেমন কালক্রমে ফিকশনের পরিণত হয়, তেমনি সেই ফিকশন নতুনতরর ফ্যাক্টেরও সৃষ্টি ঘটায়।

এই বিবর্তনের কথা থেকেই আমার মনে জাগরিত হচ্ছে একুশে পালনের বিবর্তনের বিষয়টি। একুশের অনুষ্ঠানের বিবর্তন। এ বিবর্তন কেবল ৫২-পরবর্তী বছরগুলোতে একুশে অনুষ্ঠানের হ্রস্বতা বা স্বল্পতার কিংবা ব্যাপকতার বিবর্তন নয়। আমার ব্যক্তিগত বিস্ময় একুশে বা '৫২-র শহীদদের রক্তদানের মূল মঞ্চটিরও বিবর্তনের কথা চিন্তা করা।

এমন কথায় স্মৃতিতে ভেসে ওঠে '৫৫ সালের মধ্যভাগের কথা। সেই '৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার একটি এলাকা থেকে কয়েকজন সতীর্থসহ এক আসন্ন সন্ধ্যায় সরকারী পুলিশের আকস্মিক আক্রমণে গ্রেপ্তার হয়ে সেই যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম, পাঁচ বছরের অধিককাল পরে '৫৫ সালের মধ্যভাগে ঘটে সেই কারাগার থেকে

মুক্তি। আমি কিংবা আমার সহবন্দীদের কেউই সেই '৪৯-এর ডিসেম্বর ভরসা করতে পারিনি, এই কারাগার থেকে আমাদের কোনদিন মুক্তি ঘটবে। মুক্তির আশা নিয়ে কারাগারের প্রবেশ করেনি সেদিন কোন রাজনীতিক কর্মী। জীবনকে দান করার জন্যই সেদিন কারাজীবনকে গ্রহণ করেছিল তারা। এবং '৪৮, '৪৯ থেকে '৫৫-মধ্যে কত জীবনের বিনাশ ঘটেছে সেই কারাগারে। সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়েছে। চিরদিনের জন্য দেহমনে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। সে কাহিনী আজো অলিখিত। আর তাই '৫২-উত্তরকালের কাহিনী কেবল কারাগারের বাইরের রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। '৫২-এর আগের এবং পরের সে কাহিনী রচনার দায়িত্ব '৫২ থেকে জাত উত্তরসূরীদের। '৫২-র উত্তরপুরুষদের। কিন্তু '৪৭-৪৯-এ পাকিস্তানের উত্তেজনাকার সেই যুগে নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত সংখ্যাহীন রাজনীতিক কর্মী তথা রাজবন্দীদের অসীম কৃতজ্ঞতা এই বিমূর্ত একুশের কাছে। এই একুশে তাদের সেই দিনের ভরসাহীন জীবনে, মৃত্যুর গহ্বরে জীবনের আলো দিয়েছিল। বাঁচার ভরসা যুগিয়েছিল। নিজেদের জীবনদানের যে একুশে তৈরী হয়েছিল সেই দান করা জীবন থেকে জীবন লাভ করার ঋণ আমাদের। এক মৃত্যু যে আর এক মুমূর্ষুকে জীবনরসে পুনর্জীবিত করে তুলতে পারে, তার এমন দৃষ্টতা নিজেদের জীবন ইতিহাসে আর কোনদিন ঘটেনি।

বোঝাই যাচ্ছে, কথাগুলি আবেগের। এবং '৮৭-র বর্তমান মুহূর্তে নতুন প্রজন্মের কাছে হয়ত অর্থহীন আবেগ। কিন্তু পুরাতনের কাছ থেকে একুশের আবেগহীন তত্ত্বকথা লাভ করা দুষ্কর।

একুশে কি কেবল বিমূর্ত প্রতীক? না। আবেগ-আবিষ্ট বর্তমানে বক্তার পক্ষে তেমন কথাও চরমভাবে বলা সম্ভব নয়। প্রতীক কিভাবে ব্যক্তির মনে প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারে তার দৃষ্টান্ত হিসাবে নাম উল্লেখ না করে একজন লেখকের একটি স্মৃতিচারণের উল্লেখ করছি।

"সতের বছরের একটি তরুণ। গত বছর ফাল্গুনেও ষোল ছিল। এবার ফাল্গুনে ও সতেরতে পা দিল। সতের বছরের একটি তরুণ। কী শান্তিময়, লাল গোলাপের রক্ত ঝরা রঙীন! কি সুন্দর! কী সাহসী! ওর সাহসের দিকে চাইতে আমাদের প্রাণ কাঁপে। আমরা সাধারণ। আমরা ভীতু দৈনন্দিনের বেড়াজালে আবদ্ধ। সূর্য কখন ওঠে, কখন অস্ত যায়, আমরা তা জানিনে। সূর্যের রং কি, আমরা জানিনে। সতের বছরের তরুণ সতের বছর আগে এসে সূর্যের দিকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিল। সূর্যের আশা দিয়ে আমাদের ভরে তুলেছিল। আশাহীনের চরম হতাশা ও গ্লানিকে মুছে দিয়েও আমাদের নতুন জীবন দান করেছিল। তা নস্যাৎ হলে মরেই যেতাম। তা না হলে আমরা জানতাম না বর্বরতারও জবাব আছে। দম্ভেরও পরাজয় আছে।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি উক্তিও উল্লেখ করা যায়। এ উক্তি উচ্চারণকারীরও নাম উদ্ধারের আবশ্যকতা নেই। কিন্তু তার কথাটি বিবেচনার যোগ্য।

..."একুশে ফেব্রুয়ারিকে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বোধ হয়েছে একটি রহস্যপুরুষ হিসাবে। তাকে প্রথমে ভেবেছি একটি রহস্য শিশু হিসাবে যার জন্ম হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি, '৫২ সালে। তারপরে তাকে মনে হয়েছে বর্তমান একটি তরুণ হিসাবে। এখন তো সে বয়সের দিক থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত একটি যুবকই নয়, প্রায় ত্রিশ বছরের পুরো মানুষ। এমন বোধের কারণ হয়ত এই যে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমি নিজে চোখে দেখিনি। তবু সে যেভাবে পূর্ব বাংলার মানুষকে আপাদমস্তক আন্দোলিত করেছিল

তাতে তাকে এক রহস্যময় শক্তি বলে আমার মনে হয়েছে যার সঙ্গে ইতোপূর্বে আমার তেমন সাক্ষাৎ ঘটেনি। আমার, মানে সেই পঞ্চাশ দশকের বামপন্থী অগ্রগামী রাজনৈতিক কর্মী, বিশেষ করে পাকিস্তানের নিশ্ছিদ্র কারাগারগুলিতে বন্দী মানুষের, ব্যক্তিগত ঋণেরও কিছু ব্যাপার আছে। ...একুশ থেকে, বা ফাল্গুন থেকে, ফাল্গুন কেবল একুশের বয়স বৃদ্ধি নয়। আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনেরও বিকাশ এবং বিবর্তন। সে কোন দিকে? তার আভাস অন্য কোন দিনের উদযাপনে না হোক বছর থেকে বছর একুশের উদযাপনে তার আভাস নিশ্চয়ই কিছু ভেসে উঠে।'...

এই লেখকের আগের স্মৃতিচারণটি যদি ঘটে থাকে ১৯৬৯-এ, তবে পরেরটি ঘটেছে ১৯৮১-তে। অর্থাৎ বিবর্তিত একুশের বিবর্তিত দ্রষ্টা বা দর্শনকারীর কিছুটা পরিচয় এই দু'টি উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়।

বৎসর থেকে বৎসরান্তে আমরা একুশে পালন করে এসেছি। পালন করে আসছি। একুশের অবশ্যই এই এক অনস্বীকার্য অবদান যে বাঙালীর দিনপঞ্জীতে একটি দিনের স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে একুশে। একুশে ফেব্রুয়ারি তথা ৮ই ফাল্গুন বাঙ্গালীর সামাজিক-রাজনীতিক জীবনে একটি স্থায়ী ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর একুশে ফেব্রুয়ারি বাদে আমরা বছরের দিনপঞ্জী তৈরি করতে পারি না। কোন প্রতিষ্ঠান তার বাৎসরিক কার্য পরিচালনেও পারে না একুশকে অস্বীকার করতে। একুশে আজ সরকারী ছুটির দিবস। জাতীয় শহীদ দিবস বলে সে আখ্যায়িত। এই ঘটনাটি অর্থাৎ সরকারী ছুটির দিবস বলে স্বীকৃতি লাভের ঘটনাটির শহীদ মিনার আজ বৃহৎ হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে এবং সরকারীভাবে তার স্বীকৃতি ঘটেছে। শহীদ মিনারে যেতে পারা না পারা প্রতিষ্ঠিত সরকার মাত্রেরই আজ নাম মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এই কারণে প্রতি বছর এখন একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদ মিনার কাছে না নতুন শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, সেই আশঙ্কায় আমাদের বুক কম্পিত হয়ে ওঠে। অথচ এই শহীদ মিনার প্রতিকূল সরকারের হাতে কতবারই না ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিকূল শক্তি সেদিন শহীদ মিনারকে আঘাত করে করে তাকে নতুন থেকে নতুনতর অর্থে অর্থবান করে তুলেছে। ক্ষুদ্র শহীদ মিনারকে বৃহৎ করে তুলেছে। শহীদ মিনারের এমন বিবর্তনও তাৎপর্যবাহী।

কিন্তু এর অপর একটি দিকও আছে। বিবর্তনের সে দিকটিও বিশ্লেষণের দাবী রাখে। বিশ্লেষণের দাবী রাখে একুশের মূল তাৎপর্য উদঘাটনকারী নতুন সমাজ বিনির্মাণের কর্মীদের কাছ থেকে।

'৫৫ সালে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যে-শহীদ মিনারের পাশে দাঁড়িয়ে আবেগে আলোড়িত হয়েছিলাম সদ্য কারামুক্ত কয়েকজন রাজনীতিক বন্দী সে শহীদ মিনারের কোন কনক্রিটের দণ্ড কিংবা সোপান কিংবা চত্বর ছিল না। কয়েকটি চেরা বাঁশের ফালিতে পরিবেষ্টিত ছিল একটি মাটির মঞ্চ। মুক্ত মানুষেরা বন্দীদের বলেছিলেন: 'এখানে পড়েছিল বরকত-সালামের রক্ত'। তাঁদের এমন পরিচয় দানেই কৃতজ্ঞতার স্মৃতিতে আবিষ্ট হয়েছিল সদ্যমুক্ত কারাবন্দীরা। কালক্রমে সেই মঞ্চ স্থানান্তরিত হয়েছে বর্তমানের শহীদ মিনারে। শহীদ মিনার আজ বৃহৎ হয়েছে। সরকার থেকে সরকারের প্রতিযোগিতা শহীদ মিনারকে কে কার চাইতে অধিকতর বৃহৎ করতে পারে।

একুশের আলাপ-আলোচনার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ বাংলা একাডেমি। সঙ্গতভাবেই দাঁড়িয়েছে। বাংলা একাডেমি একুশের ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি।

ফসল। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময় থেকে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠানগতভাবে প্রতিবছর একুশকে পালন করা অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে এসেছে। বাংলা একাডেমির একুশে পালনেও বিবর্তন ঘটেছে। পূর্বের চাইতে ব্যাপকতর এবং বৃহত্তর আজকের একুশের পালন। আগে যদি বা সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল একুশের অনুষ্ঠান, আজ সেখানে দিন থেকে সপ্তাহ, এমন কি মাসাবধি বিস্তারিত তার অনুষ্ঠান। গ্রন্থে প্রদর্শনী ঘটে প্রায় মাসব্যাপী। মেলা বসে। গ্রন্থের মেলা। ফুচকা, চটপটি, ঝাল-মিষ্টি, তরুণ তরুণীর কলকাকলীর মেলা বসে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি: নানা বিভাগের উপর আলোচনা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় পক্ষব্যাপী। ২১শের রাতে বারটা এক মিনিট পদযাত্রা শুরু হয় শহীদ মিনারকে লক্ষ্য করে: শহীদদের কবরগাহ হয়ে শহীদ মিনার। কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারির মূল ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাত বারটায় নয়। হয়ত বা সকাল দশটা কিংবা দুপুর বারটাতে। ছাত্র-ছাত্রী-জনতা পুলিশের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে যখন পরিষদের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিল, তখন। কিন্তু আজ আমরা রাত বারটাতে পদযাত্রার সূচনা করি অনুষ্ঠানটিকে একটি প্রতীকীমূল্য প্রদানের জন্য। মূল শহীদ মঞ্চ নয়, বৃহৎ শহীদ মিনার এবং বাংলা একাডেমির বটমূল এখন সাহিত্য সংস্কৃতির সেমিনার এবং নির্বাদ কাব্যপাঠের স্থান। একুশের সাহিত্য পুরস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে একুশের পদকের প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি একুশের বক্তৃতাও প্রচলন করেছে। এই সব ঘটনাই তাৎপর্যের ঘটনা! একটি সংগ্রামী জনসমাজের শক্তির স্মারক। একুশে আজ বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের অনস্বীকার্য এক বাৎসরিক উৎসব, অনুষ্ঠান ও পর্ব। বাঙ্গালীর ইতিহাসকে অভাবিতভাবে সমৃদ্ধ করেছে একুশে ফেব্রুয়ারি।

'৫২-র একুশ থেকে অতিক্রান্ত ৩৫ বছরের বিচিত্র রক্তাক্ত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে একুশ সম্পর্কে এ কথা বলা যায়, একুশে আজ একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করছে। একটি পার্বণিক চরিত্র সে ধারণ করছে।

এবং সে কারণেই সমাজ রূপান্তরের বিরতিহীন সংগ্রামের যারা শরীক, যারা নতুনতর একুশে সৃষ্টির মাধ্যমে '৫২'-র একুশকে অতিক্রম করে '৭১-এর একুশকে তৈরি করেছেন এবং যারা সেই '৭১-কে অতিক্রম করে শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য নবতম একুশ তৈরি করতে চান, বর্তমানের প্রাতিষ্ঠানিক একুশের সীমাবদ্ধতার দিকটিকে অবশ্যই তাদের বিশ্লেষণ করতে হবে।

এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন এদিক থেকে যে, একুশে যেমন এক দিন বাঙ্গালীকে জীবন দান করেছিল, সংগ্রামের নতুন পথ প্রদর্শন করেছিল সে একুশে তেমনি আজ পর্ব আর অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়ে তার জীবনীশক্তিতে নিঃশেষিত হয়ে গেছে বলে বর্তমানের তরুণদের অনেককে হতাশায় আবিষ্ট হতে দেখি।

এইখানেই তাই প্রসঙ্গ আসে মানুষের শেষহীন অভিযাত্রায় যে কোন একটি সংগ্রাম বা আন্দোলনের শক্তি ও সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ। এবং সে প্রসঙ্গে একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিষ্ঠানবাহীরা যেমন, প্রতিষ্ঠানের বাইরের সমাজকর্মীরাও তেমনি '৫২-র ভাষা আন্দোলনের সামগ্রিক শক্তি এবং সীমাবদ্ধতার দিকটির আলোচনায় এখনো নিবদ্ধ নয়। এখনো সহজ আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং স্মৃতিচারণই বাৎসরিক একটি দিনের ২১শে ফেব্রুয়ারির বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গটিতে আমার ব্যক্তিগত বোধটুকুর উল্লেখ করে এ আলোচনার আমি ইতি টানতে চাচ্ছি।

৩৫ বছরের বিবর্তিত একুশের দিকে তাকিয়ে আমার বলতে ইচ্ছা হয়: এতদিনের বিদ্রোহী একুশে আজ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ তথা 'এস্টাবলিশমেন্টের' সালাম, শ্রদ্ধা, দর্শন-প্রদর্শনের সূক্ষ্ম অ-সূক্ষ্ম শত শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কাল থেকে কালে বিদ্রোহীমাত্র সমাজকে বিব্রত করেছে। বিদ্রোহীকে নিয়ে সমাজের বড় বিপদ। গোড়াতে সমাজ বিদ্রোহীকে নির্মম অত্যাচারে দমন করে তাকে নির্বাক করতে চায়। কিন্তু তার অমিত তেজে ব্যর্থ হয়ে কালক্রমে সমাজ তাকে স্বীকার করে আনুষ্ঠানিক সম্মান আর শ্রদ্ধার উত্তুঙ্গতায় স্থাপন করে তাকে নির্বীক করার চেষ্টা করে। সমাজ-ইতিহাসের এ এক বাঙময় সত্য। এককালে বিদ্রোহী যদি প্রতিকূলের নিরস্ত্র, সশস্ত্র সহস্র আক্রমণকে রক্তাক্ত বুকে মোকাবেলা করে শোষিত, দলিত মানুষের আশা-ভরসার দুঃসাহসী নায়ক হয়ে দাঁড়াতে পেরে থাকে তো পরবর্তীতে সেই প্রতিকূল সমাজের খল, কূট আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি, সম্মান ও শ্রদ্ধার বেড়াজালকে অতিক্রম করা তার পক্ষে আর সহজ হয় না। সম্ভব হয় না। একুশে কেবল একটি আন্দোলন নয়। একুশে এক সত্তাগত অস্তিত্ব। ব্যক্তি তথা ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তি যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বে রূপান্তরিত হতে হতে অগ্রসর হয়। একটি আন্দোলনও তেমনি। একটি আন্দোলনকে যদি অনড় অস্তিত্ব হিসাবে কল্পনা করে কেবল আওয়াজ তুলি: 'একুশে জিন্দাবাদ, একুশে অমর' তাহলে আমরাও পরিণামে দেখব, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অনড় বলে কোন সত্তা নেই। একুশও বিবর্তিত হয়েছে। '৫২-এর একুশ, এমন কি ৭১-এর একুশ আর ৮৭-এর একুশ অভিন্ন নয়। বাংলাদেশের সমাজও আজ বিবর্তিত সমাজ। ৭১ থেকে ভিন্নতর এক সমাজ। ২২ কোটিপতি আজ কত শততে পরিণত হয়েছে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু জমিহীন কৃষকের সংখ্যা শতে ৪০ থেকে ৬০-এ উন্নীত হয়েছে, সে সত্য বাস্তব জীবনের নিত্য মুহূর্তের উচ্চারিত সত্য। বন্ধ্যা ধনবাদী অর্থনীতির বোঝা শোষিতকের মানবেতর প্রাণীতে পর্যবসিত করছে।

এমন দিবস তরুণরা আওয়াজ তোলে: কেউ, খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না; এ সমাজ জীর্ণ সমাজ, এ সমাজকে ভাঙ্গতে হবে'– তাদের সে আওয়াজ যদি কেবল শব্দের ছন্দময় ঝঙ্কার না হয়, যদি তাতে আন্তরিকতা থাকে, এবং যদি আজকের সংগ্রামী তরুণ একুশের মধ্যে মানুষের মহৎ সংগ্রামের অনিবার্য বিজয়ের বিশ্বাসের উৎসকে অন্বেষণ করতে চায় তবে তাকে '৮৭-তে বন্দী '৫২-র একুশকে শেকলমুক্ত করার পণ গ্রহণ করতে হবে। সে পণ যেন প্রকাশিত হয় একুশের মর্মবাণীকে একুশে ফেব্রুয়ারির একটি দিন থেকে বৎসরের পর দিনের সংগ্রামে বিস্তারিত করণে সে পণ যেন প্রকাশিত হয় শহরের চৌহদ্দী থেকে মুক্ত বলে শ্রমজীবী মানুষের কল কারখানা, খেত খামারে একুশকে প্রসারিত করণের মাধ্যমে, এই কামনা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্যটুকু নিবেদন করছি।

[অমর একুশে 'সাতাশি অনুষ্ঠানে ১৫.২.৮৭ তারিখে পঠিত]

সরদার ফজলুল করিমের অগ্রন্থিত প্রবন্ধ সংকলন

সংকলন: শেখ রফিক, র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গল্প নয়

কিশোর কয়েকটি মুখ আমার সামনে। আসরটি বসেছিল একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণে। বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আমি জেলে ছিলাম।

আসরের ছেলে-মেয়েরা বলল, আপনি কিছু বলুন। আমি বললাম, আমি কি বলব? তোমাদের মধ্যে আজ যারা বড় হয়েছে তারা একুশে ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের রাস্তায় ছিলে। সেক্রেটারিয়েটের সামনে মিছিল করেছ। গুলি আর গ্যাস খেয়েছ। তোমাদের জীবন রোমাঞ্চকর। কিন্তু আমি তো বন্দী ছিলাম। আমি কিছু জানিনে।

ওরা বলল: তবু আপনি বলুন।

আমি বললাম: হাঁ, তবু আমার বলার কথা যে নাই, তা নয়। আমার বলার আছে একুশের কাছে আমার দেনার কথা। ঋণের কথা। কেউ যদি তোমাদের কাউকে কিছু দেয়, দেয় এমন কিছু বিরাট এবং মহৎ যা তুমি কল্পনা করতেও পার না, তাহলে সে ঋণের কথা কি তোমরা ভুলতে পার?

কেউ পয়সা ধার দিলে সে ধার ফেরত দেওয়া যায়। কেউ বই ধার দিলে তাও ফেরত দেওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি আমাকে তার জীবন ধার দেয় তাহলে কি আমি ফেরত দিতে পারি? জীবনের ঋণ কেবল জীবন দিয়েই শোধ করা যায়। কিন্তু তেমন করে শোধ করতে আমরা ক'জনে পারি। কিন্তু জীবনের ঋণ শোধ করতে না পারলেও তাকে ভুলে যেতেও পারিনে। কেননা জীবনদাতার ঋণ ভুলে গেলে জীবনটাই মিথ্যা হয়ে যায়।

এ জন্যই একুশকে আমি স্মরণ না করে পারিনে।

আমি গ্রেপ্তার হয়েছিলাম ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে, তাঁতিবাজারের একটা গলিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তার আগে অধ্যাপক ছিলাম। আমার কাছে ঘটনাটা এই সেদিনের বলে মনে হলেও– হিসেব করে দেখলে সে আজ থেকে প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। ঊনসত্তরে যে কিশোররা ঢাকার বুকে রক্ত ঢেলেছিলে তাদের জন্মের আগে। সেদিনও প্রশ্ন এসেছিল আমাদের সামনে: স্বাধীনতা। কিন্তু কার স্বাধীনতা? আজাদী। কিন্তু কার আজাদী?

প্রশ্নের জবাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ ঘরে দেওয়া কিংবা পাওয়া সম্ভব নয় জেনে আমি অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলাম সেদিন। আর সেই অপরাধের জন্যই পুলিশ আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

গ্রেপ্তার হওয়ার পরে পুলিশ চৌকিতে প্রহার, ডিসেম্বরের কনকনে শীতে প্রায় বস্ত্রহীন থাকা– এসব কথা থাক। আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার পরের দিন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে রাজবন্দীদের দীর্ঘতম অনশন ধর্মঘট শুরু হয়ে গেছে। আমরা যখন গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা জেলে যাই তখন বোধ হয় অনশন ধর্মঘটের আঠার কিংবা ঊনিশ দিন চলছে।

জেল গেট থেকে নাজির জমাদার আমাদের ঠেলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল ফাঁসির সেল '৮' ডিগ্রীতে। ওরে বাপ! নাজির জমাদারের সেদিন কি আওয়াজ! কি রোষ চক্ষু। মেষ শাবকের মত নিরীহ আমাদের চার হাত পাশে আর দশ হাত লম্বা লোহার শিক

দেওয়া এক একটা কুঠুরীতে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিয়ে সে বলল: এই সেল থেকে আর বেরুতে হবে না।

আমরাও জেলে ঢুকে অনশন শুরু করে দিলাম। আমাদেরও দাবী: রাজবন্দীকে সম্মানের সঙ্গে দেখতে হবে। তার সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তখন সে অসহায়ের দাবী। জেলখানায় বন্দীর কি শক্তি। একজন রাজবন্দী অপর একজন রাজবন্দী থেকে বিচ্ছিন্ন। সারা বাঙ্গলার কেন্দ্রীয়, জেলা আর মহকুমার জেলখানাগুলোতে তারা বিচ্ছিন্নভাবে বন্দী। জেলের উঁচু দেয়াল পেরিয়ে কাকেরও সাধ্য নেই, বন্দীদের দুর্দশার খবর বাইরে এনে ছড়িয়ে দেয়।

আমার গ্রেপ্তারের আগেই, বোধ হয় ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা জেলে অনশনরত রাজবন্দী শিবেন রায়কে ওরা মেরে ফেলেছে। অনশন করছে এই অপরাধে জোর করে খাওয়াবার নামে একদিন ষণ্ডা-মার্কা কয়েদী আর জেল কর্মচারী শিবেনের বুকে চেপে একটা রবারের নল নাক দিয়ে ফুসফুসের মধ্যে ঢুকিয়ে দম আটকিয়ে মেরে ফেলেছিল শিবেনকে।

এই অনশন শেষ হয়েছিল আটান্ন দিন পরে। এই অনশনের পরেই ঢাকার প্রখ্যাত রাজনীতিক নেতা ফণি গুহ মারা যান ময়মনসিংহ জেলে। অনশনের মধ্যে চট্টগ্রামের অমর সেন পাগল হয়ে যান।

ঢাকার অনশন শেষ হলে জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে বদলী করে পাঠায় সিলেট জেলে। ১৯৫০-এর মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে।

সিলেট জেলে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার কিশোর বন্দী কাজল, গোপেশ আর বিজনের সাথে। গোপেশ আজ মালাকার। আমাদের তরুণ শিল্পীদের অন্যতম। সিলেট জেলের ডিগ্রীর কুঠুরীর দেয়ালে সেদিনও দেখেছি অঙ্গারে আঁকা গোপেশের ছবি। বদ্ধ কুঠুরীতে দিন কাটাবার এবং বেঁচে থাকবার স্বাক্ষর।

সিলেট জেলের বন্দীরাও ঢাকার অনশনের কথা কোন প্রকারে শুনতে পেয়ে অনশন করেছিল। কিন্তু সেখানে বন্দীদের উপর যে নির্যাতন হয়েছিল তার নির্মমতার কথা বাইরে কেউ জানতে পারেনি।

অনশন করেছে, এই অপরাধে কাজল, বিজন আর গোপেশকে ভিন্ন ভিন্ন কুঠুরীতে তালাবদ্ধ করে জেলের কর্মচারী, তার সিপাহী, জমাদার আর ষণ্ডা কয়েদীরা একদিকে কিশোর বন্দীদের সামনে ভাতের থালা রেখেছে আর বিরামহীনভাবে প্রহার করে বলেছে: খা, ভাত খা।

ওরা যতই বলেছে, আমরা রাজবন্দী। তোমরা বিনা দোষে, বিনা বিচারে আমাদের আটকে রেখেছ, আমাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করতে হবে, ততই ওদের প্রহার বেড়ে গেছে। এত নির্যাতনেও যখন কিশোর বন্দীরা অনশন ভাঙ্গেনি তখন ওদের কুঠুরী থেকে পানির ভাণ্ডটুকুও জেল কর্তৃপক্ষ সরিয়ে নিয়েছে।

কাজলের কথা যেন আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি: "এখন আর ওরা পানিটুকুও খেতে দিচ্ছে না। কিন্তু পানির পিপাসা যে বেড়ে যাচ্ছে। ভাত না খেয়ে থাকতে পারি। কিন্তু পানির পিপাসায় শরীর যে জ্বলতে শুরু করেছে। তাই বলে বন্দীশালার সিপাহী শান্ত্রীর কাছে মাথা নোয়াতে আমরা চাইনি। একদিন যায়। দু'দিন যায়। তবু ওরা একটু পানি দিল না। মুখের ভিতরে যে লালা ছিল তাও শুকিয়ে গেছে। এখন জিব ঘষলে রক্ত বেরোয়। ডিসেম্বরের কনকনে শীত। ঠাণ্ডা মেঝে। একটু বিছানা নাই সাথে। তবু

পিপাসায় শরীর গরম হয়ে উঠেছে। একটু যদি ঠাণ্ডা করতে পারি এই চেষ্টায় গায়ের কাপড় ছেড়ে ফেলে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম...।"

তোমরা 'বিষাদ সিন্ধু' পড়েছ কারবালার কথা শুনেছ। কিন্তু এই বাংলাদেশে একদিন দেশপ্রেমিক রাজবন্দীরা যে এমনি কারবালার প্রান্তরে একটু পানির জন্য আকুল হয়ে কাতরেছে, সে কাহিনী কি তোমরা শুনেছ?

ঢাকার অনশনে কিছু সুযোগ বন্দীরা যে না পেয়েছিল তা নয়। কিন্তু তাতে কি? চারদিকে যে ঘোর অন্ধকার। দেশময় তখন স্বৈরতন্ত্রের দাপট। সিলেটের সানেশ্বর আর রাজশাহীর নাচোলের কৃষক আন্দোলনকে ওরা নির্যাতন-চালিয়ে দমন করে দিতে চেয়েছে। শত শত কৃষক এবং কৃষক কর্মীকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে। কত যে গুলিবর্ষণ হয়েছে, তার হিসেব আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। ইলামিত্রের উপর অত্যাচারের কোন তুলনা নেই।

এমনি সময়ে ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল ঘটল রাজশাহী জেলের রাজবন্দীদের ঘর খাপড়াওয়ার্ডে গুলিবর্ষণ। ঘরের মধ্যে বন্দীদের আটকে জানালার শিকে বন্দুকের নল রেখে ওরা গুলি করেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে কোলে ঢলে পড়েছিল পাঁচজন বন্দী: দেলওয়ার, হানিফ, আনোয়ার, সুখেন ভট্টাচার্য আর সুধীন ধর। আহত হলো আরো অনেকে। আহতদের মধ্যে বিনা চিকিৎসায় সন্ধ্যা না হতে মৃত্যু হল আরো দু'জনের: কম্পরাম সিং আর বিজন সেনের।

সিলেট জেল থেকে আমাকে আবার বদলী করে নিয়ে আসা হল রাজশাহী জেলে। এমনি করে এক জেল থেকে আর এক জেলে যাই। হাতে থাকে হাত কড়া। পাশে থাকে বন্দুক হাতে সিপাহী শান্ত্রী। রেলের স্টেশনে কিংবা গাড়ীতে অথবা জাহাজের ডেকে যাত্রীরা বোবা চোখে চেয়ে থাকে কৃশদেহ লোহার কড়ায় বদ্ধ বন্দীর দিকে। তাদের দৃষ্টির অর্থ পড়তে পারিনে। কি আছে সে দৃষ্টিতে? অভয়, না অভিশাপ? হতাশায় মন ভরে উঠে। তবে কি নাজির জমাদারের কথাই ঠিক? আমরা কি কেউ বেরুতে পারব না এই বন্দীশালা হতে? আমাদের দেশ কি এমনি বোবা হয়ে থাকবে যুগের পর যুগ? আমাদের কি কোন ভবিষ্যৎ নেই? উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ? এ অবস্থা দুঃসহ। এমন জীবন তোমরা কল্পনা করতে পার? এ যে মৃত্যুর চেয়ে অধিক।

এমনি হতাশায় কাটে ৫১ সালও।

তারপর হঠাৎ এলো একুশে ফেব্রুয়ারি। এলো ৫২ সাল। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের বন্দীদের জীবনদাতা। একটি কিশোর। রক্তে রাঙ্গা।

ওর আসার দিন এখনো আমার চোখের উপর জ্বলজ্বল করে ভাসছে। ও এলো জেলের সুপার, জেলার, হেড জমাদার, সিপাহী, মেট, পাহারা সবাইকে ফাঁকি দিয়ে খবরের কাগজের একটা বিরাট ফাঁকের মধ্য দিয়ে। সে ব্যাপারটা যেমন বিস্ময়ের, তেমনি আনন্দের আর কৌতুকের।

সরকার আর জেলের কর্তারা আমাদের খবরের কাগজ পড়তে দিলেও বাইরের আন্দোলনের কোন খবর আমাদের জানতে দিতে চায় না। তাই আজাদ, মর্নিং নিউজ বা পাকিস্তান অবজারভার যে পত্রিকাই জেলের ভেতরে পেতাম সবগুলোই জেল আর পুলিশের কর্তারা তন্নতন্ন করে পড়ে তা সেন্সর করে দিত। তাদের সতর্ক দৃষ্টি, বাইরের কোন আন্দোলনের খবর যেন জেলে রাজবন্দীর কাছে পৌছাতে না পারে। এজন্য ওরা অনেক সময়ে খবরের কাগজে কোন আন্দোলনের খবর থাকলে তার গায়ে কালি লেপে বা কাঁচি দিয়ে কেটে খবরের কাগজে জানালা করে দিত।

তাতে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হত না! আমরা কাগজের গায়ে ফুটো দেখে আন্দাজ করতাম, ওখানে নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষের কোন খবর ছিল। নিশ্চয়ই বাইরে জনতা অত্যাচারের শেকল ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। এই কথা মনে করে আমরা উৎসাহ পেতাম। ৫২ সালের প্রথম দিকেই আমরা দেখছিলাম যে আমাদের জেলের ভেতরে খবরের কাগজে জানালার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কাগজের এখানে ফুটো। ওখানে ফুটো। এখানে কালি লেপা। ওখানে কালি লেপা। এ দেখে আমরা ক্রমেই বেশী খুশী হয়ে উঠছিলাম। আমরা কেউ ছিলাম ডিগ্রীবন্ধ। আবার কেউ ছিলাম অপর বন্দীদের সঙ্গে একটা বড় ঘরে। এক সাথে যারা থাকতাম তারা খবরের কাগজের এই জানালা আঙ্গুল দিয়ে মেপে দেখতাম। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। খবরের কাগজের জানালা যত বড় হত আমাদের মনের আনন্দ তত বেড়ে যেত। আমরা ভাবতাম, এই যে এত বড় করে ওরা কাগজ কেটেছে, নিশ্চয়ই এখানে জনসাধারণের কিংবা ছাত্র আন্দোলনের কোন বড় খবর ছিল।

এইভাবে খবরের কাগজের জানালা বড় হতে লাগল। সেই জানালার ফাঁক দিয়ে বন্দীশালার বাইরের জগতের মুক্ত বাতাসের আমরা কল্পনা করতাম।

একুশে ফেব্রুয়ারি নয়। বাইশে ফেব্রুয়ারির কথা বলছি। কারণ রাজশাহী জেলে ঢাকার কাগজ আমরা একদিন পরে পেতাম। তেইশে ফেব্রুয়ারি দুপুরে কিংবা বিকেলে সিকিউরিটি জমাদার, মানে রাজবন্দীদের তদারকী জমাদার আমাদের একুশ তারিখের খবরের কাগজ দিয়ে গেল। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, নতুন কি খবর এসেছে দেখবার জন্য। কিন্তু খবর কই? কাগজই বা কই? অবাক চোখে দেখলাম, কাগজের মাথায় কাগজের নাম বাদে আর কিছুই যে আস্ত নেই। জানালা তো জানালা, সমস্ত কাগজ কেটে ওরা বিরাট এক দরজা বানিয়ে দিয়েছে। সে দরজা দিয়ে ইচ্ছে করলে আমরা পুরো মানুষ মাথা গলিয়ে এপার-ওপার যাওয়া-আসা করতে পারি।

আমরা করলামও তাই। খবরের কাগজের অত বড় জানালা দেখে আমাদের মনে ফূর্তি আর ধরে না, চোখ থেকে আনন্দের পানি ঝরতে আরম্ভ করেছে। আমরা ছেলে বুড়ো, কিশোর অ-কিশোর, কৃষক, শ্রমিক যত রাজবন্দী এক সাথে ছিলাম তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরতে লাগলাম। আমরা চীৎকার করে বলতে লাগলাম: আমরা জীবন পেয়েছি। আর আমাদের মারে কে? দেখ, দেখ, কত বড় জানালা। জানালা নয়ত দরজা। শেকল ভাঙ্গার দরজা। মুক্তির দরজা। আর সেদিনকার সন্ধ্যা না ঘনাতে সত্যি সেই খবরের কাগজের দরজা দিয়েই শুনতে পেলাম ছাত্র-জনতার মিছিলের আওয়াজ: রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। ছাত্র হত্যার বিচার চাই।

১৯৭২

নানা কথা এবং নানা কথার পরের কথা

সরদার ফজলুল করিম, প্যাপিরাস, ১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

একুশে ফেব্রুয়ারির নতুন প্রেক্ষিত

একুশে ফেব্রুয়ারির সঙ্গে আমাদের একটা গভীর আবেগের সম্পর্ক আছে। সে আবেগ হচ্ছে সংগ্রামের রক্তের। সে '৫২ সাল থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত প্রায় বিশ বছর ধরে একুশের ফেব্রুয়ারি সংগ্রামের শুধু প্রতীক নয়, সাক্ষাৎ সংগ্রাম হয়ে বাংলাদেশের চেতনশীল মানুষের মধ্যে এসেছে। তার শ্রমিক মধ্যবিত্ত এমনকি জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাকারী বাংলাদেশের ধনিক শ্রেণিও একুশের আবেগে বোধ করেছে। তখন এমন একটা প্রতিপক্ষ ছিল যে কেবল কোন বৈদেশিক নয়, মূর্খও বটে। সে মূর্খতা অবশ্য তার শ্রেণি-চরিত্রে উদ্ভূত। আজকের যুগে একটা রাষ্ট্রের ধনিক শ্রেণি এবং প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থ রক্ষায় মরিয়া সামন্তশ্রেণীর পক্ষে জাতীয় সমস্যা সমাধান গণতান্ত্রিক এবং উদার কোন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আর তাই ধনিক শ্রেণি ও সামন্তশ্রেণী দেশের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক বিকাশের চেষ্টামাত্রকেই ভয়ার্তের দৃষ্টিতে দেখে। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের চেতনার বিকাশের সাথে সাথে তার আর্থিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। আবার অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক বাস্তব বিকাশ তার চেতনাকে অধিকতর সংগঠিত করে আত্মপ্রতিষ্ঠার নতুনতর স্তরে উন্নীত করে তোলে। দেশের ধনিক ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের এই চেতনা ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে নিজের স্বার্থের হানি ব্যতীত অপর কিছু ভাবতে পারে না। এবং তাদের এ চিন্তা ও আশঙ্কা যথার্থ। এককালে বিকাশমান ধনিক শ্রেণি একটা দেশের শোষিত কৃষক ও মধ্যবিত্তকে ভরসা দিতে পারত, তার অধিনায়কত্বে দেশের শিল্পে বিকাশ সাধিত হলে কৃষক মুক্তি পাবে সামন্ততন্ত্রের শেকল থেকে, জমিহীন কৃষক জীবিকার উপায় পাবে, কলকারখানার সে শ্রমিক হতে পারবে, দরিদ্র কৃষকের জমির উৎপাদন শিল্পের বিকাশের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা ও প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে, তার উৎপাদিত কৃষিসামগ্রীর বাজার বিস্তারিত হবে। শিল্প ও কৃষি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে। এই পর্যায়ে তাই ধনিক শ্রেণি কৃষক ও মধ্যবিত্তকে তার সহযোগী ভাবতে সক্ষম ছিল। এবং সহযোগী রাষ্ট্রীয় অধিকার দানেও সে কিছুটা উদারতা একদিন প্রদর্শন করতে পারত। কিন্তু সে ছিল ধনতন্ত্রের আদিযুগ। তার প্রাথমিক স্তর। সে যুগ আজকের পৃথিবীতে গত। আফ্রিকা হোক, কিংবা এশিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকা হোক-কোথাও আর সে অস্তিত্বশীল নয়। আজ জাতীয় ক্ষেত্রে ধনিক শ্রেণি (যে শ্রেণি ধনিক হতে চায়, সেও) আতঙ্কিত। সে আতঙ্কিত, শ্রমিক-কৃষকের সংগঠিত শক্তির ভয়ে। সে আতঙ্কিত সমাজতন্ত্রের অনিবার্য এবং দ্রুত আগমনের আশঙ্কায়। বিশ্বের বৃহৎ ধনতান্ত্রিক শক্তির কাছে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের, বিশেষ করে এশিয়া-আফ্রিকার উন্নয়নপ্রয়াসী রাষ্ট্রসমূহের ধনিক শ্রেণি নিজেকে দুর্বল মনে করলেও নিজে দেশের শ্রমিক-কৃষককে রাজনৈতিক সাথী বা সহযোগীতে পরিণত করে নিজের দেশের সম্পদকে নিজের দেশের শক্তির ভিত্তিতে বিকশিত করে তোলার দেশপ্রেমিক ভূমিকা সে গ্রহণ করতে পারে না। সে শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তকে নিজের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে। তাই তার আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা হচ্ছে শ্রমিক-কৃষককে অধিকতর শোষণের ভিত্তিতে নিজের স্বার্থকে কায়েম করা। আর এর সহজ পথ হিসেবে সে বৈদেশিক ধনতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির

সাহায্য গ্রহণে দ্বিধা করে না। অথচ তত্ত্বগতভাবে কোন ধনতান্ত্রিক শক্তির বিকাশকে যথার্থভাবে সাহায্য করতে পারে না। তার যে কোন সাহায্য আপাতদৃষ্টিতে যতোই নিঃস্বার্থ বোধ হোক না কেন, মূলতঃ সে সাহায্যের উদ্দেশ্য থাকে বিকাশমান ধনিক শ্রেণির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং শক্তিকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা।

মানুষের চেতনার বিকাশে এক-একটা পর্যায় আছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সেই পর্যায়কে নির্দিষ্ট করে। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষকের চেতনা ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সংকটে ভারতীয় সমাজের দ্বন্দ্বমান শোষক শ্রেণিগুলো, অর্থাৎ মুসলিম সামন্তবাদ ও ধনিক এবং হিন্দু ধনিক ও সামন্তবাদ নিজেদের শোষণের কৌশলকে ব্যাপকতর জনসাধারণ, অর্থাৎ শোষিত জনতার চোখ থেকে আড়ালে রাখার জন্য একে অপরকে জনতার মূল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র তৈরি হয়। কিন্তু স্বার্থহীনভাবে কোন শ্রেণির কাছেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থবহ কোন বস্তু নয়। যে শ্রেণি শাসক, অর্থাৎ স্বাধীনতার মুহূর্তে রাষ্ট্রযন্ত্র যার করায়ত্ত হয়েছে সে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রকে তার নিজের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার যন্ত্র হিসেবেই দেখে। তাই শাসক শ্রেণি রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে শাসিত এবং শোষিত শ্রেণির চেয়ে অধিক মূল্যবান বলে মনে করে। স্বাধীনতার আবেগ সেই সবচেয়ে বেশী বোধ করে। তার কাছে তার স্বার্থ এবং স্বাধীনতা এক বিন্দুতে এসে তখন মিলিত হয়।

কোন একটা পর্যায়ে শ্রমিক ও কৃষক, অর্থাৎ শোষিত শ্রেণি স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া মাত্র রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার সম্ভাবনা না দেখলেও তার চেতনার বিকাশে এবং পরিণতিতে এগিয়ে যাবার স্তর হিসেবে সেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা পরাধীন অবস্থা থেকে তার আবাসভূমির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনকে মূল্যবান বলে মনে করে।

বাংলাদেশের শোষিত শ্রমিক ও কৃষকের কাছে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার একটা তাৎপর্য এই ছিল যে, '৪৭ সালের জাতীয় স্বাধীনতা তাকে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসানের জাতীয় ধনিক ও সামন্ত শক্তির সরাসরি মোকাবেলার সুযোগ দিবে। এবার আর সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি কিংবা অপর সম্প্রদায়ের ধনিক ও সামন্তবাদের উপস্থিতির অজুহাত তার শ্রেণিসংগ্রামকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখতে সক্ষম হবে না। কিন্তু তার চেতনার এবং সংগ্রামের এই বিকাশ-সম্ভাবনা পাকিস্তানের অস্বাভাবিক গঠন অসম্ভব করে তুলল। ভারতেও অবশ্য একাধিক প্রদেশ আছে। সেখানেও এক প্রদেশের শোষকের সঙ্গে অপর প্রদেশের শোষকের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আছে। আর সে দ্বন্দ্বে এখনও প্রদেশের শোষিত শ্রেণির সাক্ষাৎ-সংগ্রাম কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান বা পূর্ববাংলা কেবলমাত্র একটি প্রদেশ ছিল না। পূর্ববাংলা ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ বিশেষ। এ চেতনা পূর্ব বাংলার মনে পাকিস্তানের ধনিক এবং সামন্তবাদী শক্তি তাদের রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনীতিতে শোষণের দ্বারা ক্রমান্বয়ে বাস্তব এবং তীব্র করে তুলেছিল।

বাংলাদেশের শোষিত শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রামের ক্রমবিকাশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়সূচক তারিখ। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই স্বাধীনতা অর্জনে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত এবং বাংলাদেশী উঠতি ধনিক শ্রেণির একটি জাতীয় ঐক্য তৈরি হয়ে উঠেছিল। এই জাতীয় ঐক্যের চরম প্রকাশ ঘটেছে ১৯৭১ সালের

২৫শে মার্চ থেকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আক্রমণের মোকাবেলায়। এই ঐক্য যে বিভিন্ন শ্রেণির রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল এমন নয়। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে যে কেউই পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকুক না কেন, শ্রেণি হিসেবে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত এবং বাংলাদেশের ধনিক শ্রেণি পাক সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা করেনি।

সকল শ্রেণির এই ঐক্য বোধই বাংলাদেশের আন্দোলনকে কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের দলীয় সংগ্রাম থেকে বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে রূপান্তরিত করেছেন। আর সংগ্রামের এই জাতীয় চরিত্র বিশ্ববিবেককে বিমুগ্ধ এবং আলোড়িত করেছিল। বাংলাদেশের আন্দোলন একটা প্রাদেশিক এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা-পাকিস্তানের এ দোহাই বাংলাদেশের সংগ্রামের জাতীয় চরিত্রের সামনে বিশ্বের কাছে অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছি। ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিল। বছরের পর বছর এই আন্দোলন-প্রতিক্রিয়া পৌনঃপুনিক আক্রমণের সামনে সংগ্রামের পতাকা বহন করে অগ্রসর হয়েছে। একুশে আন্দোলনের এই দীর্ঘকালীন জঙ্গী ও সংগ্রামী চরিত্রের মূল্যের আজ অনুসন্ধান আবশ্যক।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের মূল শক্তি বাংলাদেশের উঠতি ধনিক কিংবা তার সামন্তবাদী মুসলিম জোতদার শ্রেণি এবং তার সন্তানরা ছিল না। একুশে আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল বাংলাদেশের মধ্যে কিংবা দরিদ্রতর কৃষক সমাজ, বিকাশমান শ্রমিক শ্রেণি এবং এই কৃষক ও শ্রমিক সমাজ থেকে উদ্ভূত তাদের সন্তান ছাত্র এবং মধ্যবিত্ত কর্মচারী শ্রেণি।

পাকিস্তানী পর্যায়ের বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে শ্রেণি চরিত্রের বিশ্লেষণ আজ নতুনতর স্তরের সূচনায় একান্তভাবেই জরুরী। বাংলাদেশের শোষিত মানুষের আন্দোলন কেবলমাত্র ভাষা আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এবং ভাষা আন্দোলনের অন্তর্গত লক্ষ্য কেবলমাত্র বাংলাভাষার স্বীকৃতি অর্জনেই সীমিত ছিল না। তেমন হলে ১৯৫৬ সনের পাকিস্তানি শাসনতন্ত্রে বাংলাভাষায় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিতেই বাংলাদেশের সব সংগ্রাম শেষ হয়ে যেত। '৫৬-র পরে সে আন্দোলন অধিকতর তীব্র হতে পারত না। বাংলাদেশের শোষিত মানুষের আন্দোলন ভাষা আন্দোলনের পূর্বে ১৯৪৭ সালের শেষদিক থেকেই শুরু হয়েছিল। বস্তুত: শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণির সংগ্রামের কোন রাষ্ট্রীয় কিংবা ইতিহাসগত সীমারেখা খুব অর্থবহ নয়। শ্রেণিভিত্তিক দুনিয়ায় রাষ্ট্র নির্বিশেষে কৃষকের শোষক সামন্তশক্তি শ্রমিকের শোষক ধনিক। তবু ইতিহাসের রাজনৈতিক ঘটনা দিয়ে বিভক্তি করা হয় বলেই বলতে হয় যে, পাকিস্তানী পর্যায়ের বাংলাদেশের শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রাম ১৯৪৭ সালের শেষ কিংবা '৪৮ সালের গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল।

এই সংগ্রামে স্মারক ছিল ১৯৪৮ সালের চট্টগ্রামের মাদ্রাসায় কৃষকদের খাল কাটার জন্য জমায়েত হওয়া এবং জমায়েতের উপর পাকিস্তানী পুলিশের গুলিবর্ষণ। এরই স্মারক ছিল ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের পুলিশ কর্মচারী ধর্মঘট, ১৯৪৯-এ সিলেটের মানেশ্বরের কৃষক আন্দোলন, ১৯৫০-এ নাচোলে সাঁওতাল কৃষকদের সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের আমরণ অনশন ধর্মঘট এবং অনশন ও গুলিতে বহু বন্দীর মৃত্যুবরণ। শোষিত জনতার এই সংগ্রামের সড়ক ধরেই ৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির উদ্বোধন। শোষিত জনতার সংগ্রামের এই মহৎ ঐতিহ্যই একুশে ফেব্রুয়ারির

উদ্বোধন। শোষিত জনতার সংগ্রামের এই মহৎ ঐতিহ্যই একুশে ফেব্রুয়ারির জন্ম সম্ভব করেছিল।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আওয়ামীলীগ ক্ষমতাসীন হয়েছে। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়েছে। শাসনতন্ত্রের মধ্যে এবং বাইরে বিবৃতি বক্তৃতায় সমস্ত দলই সমাজতন্ত্র নিজ নিজ দলের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। বর্তমানে লড়াই চলছে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল প্রতিটি দলের বিরুদ্ধতা করছে। প্রত্যেকে দাবী করছে একমাত্র সেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে, অপর কোন দল নয়। তার সমাজতন্ত্রই একমাত্র বৈজ্ঞানিক ও খাঁটি সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য বলে ঘোষণা করতে কোন শ্রেণিরই আজকাল কোন অসুবিধা হয় না। এখন সমাজতন্ত্রের আবহাওয়াই একমাত্র আবহাওয়া। কার্লমার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় দিতে যেয়ে ১৮৪৮ সালে বলেছিলেন: আজ সবাই সবাইকে কমিউনিস্ট বলে গালি দিচ্ছে। যে সরকারের আছে যে, সে সরকার বিরোধী দলকে কমিউনিস্ট বলছে। যে সরকারের বিরুদ্ধে আছে সেও সরকারী দলকে কমিউনিস্ট বলছে! বিরোধী দলগুলো একে অপরকে কমিউনিস্ট বলছে।

সেদিনের পরিবর্তন ঘটেছে। আজ একে অপরকে কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক বলে অভিযুক্ত করে না। আজ, বিশেষ করে আমাদের দেশে, প্রত্যেক দল নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে দাবী করছে: সরকারী দল করছে; সরকারের বিরোধী দলগুলো করছে।

সমাজতান্ত্রিক বলে দাবী করতে কারুর কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ কেবলমাত্র দাবী ও ঘোষণা অর্থনীতির ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে না। বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের বর্তমান দাবী প্রতিদাবী তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। দলে দলে ব্যক্তিগত নেতৃত্বে পার্থক্য আছে, একথা সত্য। এক দলের নেতা জনাব অমুক। অপর দলের নেতা জনাব তমুক। কিন্তু শ্রেণিগতভাবে বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলই এক। সকল রাজনৈতিক দলই হচ্ছে বাঙ্গালী পাতিবুর্জোয়ার রাজনৈতিক দল। শ্রমিক সংগঠন ও রাজনীতির বর্তমান যা স্তর, সেখানেও শ্রমিক সংগঠনগুলো এই পাতিবুর্জোয়া রাজনীতি ও ব্যক্তিগত নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন। সমাজতন্ত্রের যতরকম ব্যাখ্যাই দেয়া যাক না কেন, সমাজতন্ত্রে যে শ্রমিক শ্রেণির পরিচালনাধীন রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক অর্থনীতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমষ্টিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা, এ সত্যকে অস্বীকার করা নিরর্থক। বুর্জোয়া বা পাতিবুর্জোয়া, ধনিক কিংবা পাতিধনিক কেউই সমাজতন্ত্র তৈরি করতে পারে না। কেননা সমাজতন্ত্রকে এরা নিজেদের চেতনা দিয়ে নিজের স্বার্থবহ মনে করে না। শ্রমিক শ্রেণি শক্তিশালী হলে তার সাংগঠনিক নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র কায়েম হলে তাকে পাতিবুর্জোয়া স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়– কিন্তু নিজ নেতৃত্বে সমাজব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার শ্রেণিচরিত্রের বিরোধী।

পাতিবুর্জোয়ার স্বপ্ন হচ্ছে শ্রেণিগতভাবে বুর্জোয়া হওয়া, ব্যক্তিগত মালিকানায় ধনিক হওয়া। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাতিবুর্জোয়ার কাছে এই আলেয়ার হাতছানি। স্বাধীনভাবে শিল্প বিকাশের মাধ্যমে পাতিবুর্জোয়া আজ জাতীয় বুর্জোয়া বা জাতীয় ধনিক শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার, সম্ভাবনা কম। বৃহৎ দেশের ধনিক শ্রেণিতে তার স্বাধীন শক্তি হিসেবে বিকাশে আগ্রহ পোষণ করতে পারে না। বৃহৎ দেশসমূহের ধনিক শ্রেণিও তার স্বাধীন শক্তি হিসেবে বিকাশে আগ্রহ পোষণ করে না। বৃহৎ দেশসমূহের ধনিক শক্তি ক্ষুদ্রতম দেশের

পাতিবুর্জোয়াকে তার তল্পিবাহক মুৎসুদ্দী ধনিকে পরিণত হতে দিতে পারে: তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর আমদানীকারক কিংবা তারই পুঁজির লগ্নিতে ছোট শরিকের ভূমিকা পালন করতে দেয়ার অধিক সে কিছু দিতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক শক্তিও কোন দেশীয় পাতিবুর্জোয়াকে ধনিক শ্রেণির সাহায্য করতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মিত্রে পরিণত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জাতীয় পাতিবুর্জোয়াকে অর্থনৈতিক সাহায্য করতে রাজী হলেও সে সাহায্যকে পাতিবুর্জোয়া নিজের স্বার্থের দিকে থেকে পরিণামে বিপজ্জনক বলে মনে করে। তার আশঙ্কা সমাজতান্ত্রিক সাহায্য সমাজতন্ত্রের আগমনকেই ত্বরান্বিত করবে। তাই বাংলাদেশ কিংবা বাংলাদেশের অনুন্নত ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্রের পাতিবুর্জোয়ার টান হচ্ছে অপর বৃহৎ দেশের ধনিক শ্রেণির দিকে। তাকেই সে নিজের মিত্র শ্রেণি বলে বিবেচনা করে। যদিও এ বিবেচনাও তাকে পরিণামে রক্ষা করতে অক্ষম। এর পরিণামে সে বৃহৎ ধনিকের প্রভাবের অধীনস্থ হতে বাধ্য। পাতিবুর্জোয়া নিজ দেশে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামী বিকাশকে ভয় করে। কারণ শ্রমিক শ্রেণির পরিচালনাধীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পাতিবুর্জোয়া, বুর্জোয়া হওয়া আশা পোষণ করতে পারে না।

এ কথা ঠিক, আমাদের মত দেশের পাতিবুর্জোয়ার অদৃষ্টে দুটো পরিণামে অনিবার্য: এক-অপর যে কোন দেশীয় ধনিক শ্রেণিকেই সে মিত্র মনে করুন না কেন, পরিণামে জাতীয় পাতিবুর্জোয়া নিজেকে অপর বৃহৎ দেশের ধনিক শ্রেণির হুকুমদার হিসেবে দেখতে পাবে। দেখতে পাবে-নিজের দেশের আর্থিক সংকট সমাধানে সে অক্ষম। দ্বিতীয়ত:, জাতীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিকাশ যেভাবেই ঘটুক না কেন, দেশের শ্রমিক শ্রেণি সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তার চেতনা নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা ও সংকটে ক্রমান্বয়ে প্রখর এবং স্পষ্ট হয়ে উঠবে; বিত্ত, ভূমি এবং সামন্ততান্ত্রিক জীবনের সব টানাপোড়ন যুক্ত হয়ে সে যথার্থ সর্বহারা হয়ে উঠবে। এবং নিজের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকারী রাজনৈতিক সে তৈরী করবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় পাতিবুর্জোয়া শ্রেণিকে শ্রমিক শ্রেণির প্রতিরোধ ও সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হবে।

১৬ই ডিসেম্বর যে পর্যায়ের সূচনা হয়েছে, সেখানে একুশে ফেব্রুয়ারির নিশান আর দেশের সমস্ত শ্রেণি ঐক্যবদ্ধভাবে বহন করতে পারে না। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের মূলগত এবং চরম লক্ষ্য শোষণহীন বাংলাদেশ তৈরী। এ পতাকা কেবলমাত্র শোষিত শ্রমিক, শোষিত কৃষক এবং শোষিত মধ্যবিত্ত এবং তাদের সন্তানরাই বহন করতে পারে। ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বের এবং পরের একুশে ফেব্রুয়ারির চরিত্রের এই মৌলিক পার্থক্য আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। এই নতুন সত্তার উদ্বোধন না ঘটা পর্যন্ত একুশে ফেব্রুয়ারি এখন কেবল শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অনুষ্ঠানমালাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সেখানে কেবলই স্মৃতিদর্পণ, নতুন সংগ্রাম নয়, নতুন চেতনা নয়, নতুন সৈনিকের সাক্ষাৎ নয়।

একুশের প্রবন্ধ সংকলন ১৯৭৩

সরদার ফজলুল করিমের অগ্রন্থিত প্রবন্ধ সংকলন

সংকলন: শেখ রফিক, র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

একুশ থেকে একুশ

মনোবিজ্ঞানে 'ফিকসেশন' বলে একটি কথা আছে। বাংলাতে একে আমরা বলতে পারি 'আবদ্ধতা'। কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে বললেন, 'খুঁটা গাড়া'। এর অর্থ, আমাদের মন অনেক সময়ে একটি ব্যক্তি, বিষয় বা বস্তুতে এমনভাবে আকর্ষিত বা আসক্ত হয়ে পড়ে যে সে আর তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। বাস্তব অবস্থা বা নিজের দৈহিক বয়স হয়ত এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে এমন 'আবদ্ধতা' আর ব্যক্তির পক্ষে মানানসই থাকছে না, তবু ব্যক্তি সেখানে থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না। বলা চলে ব্যক্তি হয়ত বুঝছেই না যে, তার এই স্থানুবৎ আবদ্ধতা আর তাকে মানায় না। এমন হলে ব্যাপারটি অন্যের চোখে রোগ বলে মনে হয়। মনোবিজ্ঞানে এ রোগের নিরাময় বিধি কি তা আমি জানিনে। কিন্তু 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র ক্ষেত্রে আমারও যেন তেমনি একটি আবদ্ধতার ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যাপারটির একটি মনোবিশ্লেষণেরও আমি চেষ্টা করেছি। একুশে ফেব্রুয়ারি ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বোধ হয়েছে একটি রহস্য-পুরুষ হিসাবে। তাকে প্রথম ভেবেছি রহস্য-শিশু হিসাবে যার জন্ম হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি '৫২ সালে। তারপরে তাকে মনে হয়েছে বর্তমান তরুণ হিসাবে। এখন তো সে বয়সের দিক থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকই নয়, প্রায় ত্রিশ বছরের পুরো মানুষ। এমন বোধের কারণ হয়ত এই যে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমি নিজে চোখে দেখিনি। তবু সে যেভাবে পূর্ববাংলার মানুষকে আপাদমস্তক আন্দোলিত করেছিল তাতে তাকে রহস্যময় এক শক্তি বলে আমার মনে হয়েছে যার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার তেমন সাক্ষাৎ ঘটেনি। আমার, –মানে সেই পঞ্চাশ দশকের বামপন্থী অগ্রগামী রাজনৈতিক কর্মী, বিশেষ করে পাকিস্তানের নিশ্ছিদ্র কারাগারগুলিতে বন্দী মানুষের–ব্যক্তিগত ঋণেরও কিছু ব্যাপার আছে। সে অনুভূতির কথা স্থানান্তরে এবং বারান্তরে আমি কিছুটা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু গেল কয়েক বছর আমার একটা বিশেষ আগ্রহ এবং আবদ্ধতা এই দাঁড়িয়েছে যে, প্রতি একুশের প্রতিপালনকে আমি বিশেষ উৎসাহ নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। আবার সকলের সঙ্গে একুশের রাত্রিতে বা প্রত্যুষে নগ্নপায়ে পথে নেমেছি, শহীদ মিনারের কাছে পৌছার চেষ্টা করেছি, বাংলা একাডেমির কবিতা পাঠ বা গানের আসরে হাজির থেকেছি। এমন কি কোন সভাতে অন্য সাথীদের সঙ্গে বক্তৃতাও করেছি। এবং প্রতি একুশের সন্ধ্যাতে সেই একুশের স্মৃতিচারণ করে রোজনামচা লিখেছি। পুরনো খাতার পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়ে দেখলাম, এ রকম একুশের বিবরণ একাধিকই জমা হয়ে গেছে। একুশের উপর এমন রোজনামচা তৈরীর তাগিদ আমার এসেছে প্রধানত: এদিক থেকে যে, আমি বড় দুর্বল স্মৃতির মানুষ। আমি কিছুতেই গতকালকার বাজারের হিসাব লিখতে বসে মনে করতে পারিনে, এক সের ডাল এগার টাকায় কিনেছি না সাড়ে দশে পেয়েছি, কিংবা এক সের তেল সয়াবিন এনেছি, না ভাল তেল এবং তা কততে, কিংবা ডিমের দাম কি ছিল অথবা এক সের টমেটো বা তিতে এখনো ছ'টাকা না চার টাকা। এই আশঙ্কা একুশকে নিয়েও। পাছে আমি ভুলে যাই এবারকার একুশের পথ যাত্রার কথা, কে কেমনভাবে নিল এবারের একুশকে। এ

কথা মনে রাখার কি কোন তাৎপর্য নেই? আমার মনে হয় আছে। একুশ থেকে একুশ বা ফাল্গুন থেকে ফাল্গুন কেবল একুশের বয়স বৃদ্ধি নয়, আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনেরও বিকাশ এবং বিবর্তন। সে কোন দিকে? তার আভাস অন্য কোন দিনের উদযাপন না হোক একুশ থেকে একুশে একুশের উদযাপন তার আভাস নিশ্চয়ই কিছু ভেসে ওঠে। আর সে চিন্তা থেকেই আমার পুরনো খাতা থেকে '৭৭ আর '৮০: এ দুবছরে 'একুশে ফেব্রুয়ারি'কে পাঠকদের কাছে পেশ করার একটা আকর্ষণ বোধ করছি।

'৭৭-এর একুশ

॥২১-২-৭৭॥ সাতাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান আজ শেষ হল। আমি আমার ছোট ছেলে তিতুকে নিয়ে সকালে সাড়ে ছ'টার দিকে বেরিয়েছিলাম শহীদ মিনারে কেমন জন-জমায়েত হয়েছে তা দেখার জন্য। রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলান্টিয়ার বাহিনী এবং সরকারী পুলিশ সকলে জন-জমায়েতকে আজিমপুর গোরস্থানমুখী করে দিচ্ছে। সোজা শহীদ মিনারে যাওয়ার উপায় নেই। আজিমপুর গোরস্থান হয়ে যেতে হবে। শহীদ মিনারে সোজা যাওয়ার সব পথ বন্ধ। এ নির্দেশের একটা তাৎপর্য ভাল বলে বোধ হল। আজিমপুরে ভাষা আন্দোলনের দুজন শহীদের বাঁধানো কবর আছে। একজন বরকত। অপর জন শফিক। অন্যান্য বছর প্রতিষ্ঠানগতভাবে অনেকে গোরস্থানে এসে এঁদের কবরে ফুল দিয়ে যেতেন। আবার অনেকে সোজা শহীদ মিনারে যেতেন। এবার আর তা হবার উপায় নেই। সকলকেই গোরস্থানের মধ্য দিয়ে শহীদ বরকত-শফিকের কবর হাতের ডান রেখে আজিমপুরের রাস্তা ধরে শহীদ মিনারের দিকে এগুতে হয়েছে। আমরা দু'জনও গোরস্থান হয়ে ছাত্র-কিশোর-কিশোরী-শিশু এবং জনতার লাইনে দাঁড়িয়ে আজিমপুর রাস্তা ধরে শহীদ মিনারের দিকে এগুলাম। দুলাইনে। কিন্তু শহীদ মিনারের কাছাকাছি আবার এক লাইন হয়ে এগুবার নির্দেশে সময় এত অধিক লাগছিল যে মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা একাডেমিতে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম বাংলা একাডেমিতে বিরাট শামিয়ানার নীচে কবিতা পাঠের আসর বসে গেছে। এর পরে শুনলাম, শহীদ মিনারে কাউকে দাঁড়াতে দেয়া হয়নি। এমনকি মিনারের বিপরীতে যে সমস্ত বাণীর ফেস্টুন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে পড়ার সুযোগও দেয়া হয়নি। মোটকথা কয়েকবছর যাবৎ একুশের অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করার যে চেষ্টা চলেছে তাতে এবার আর কোনদিকে কোন ব্যতিক্রম ঘটতে পারেনি। আগের দিনে শহীদ মিনারে স্বতঃস্ফূর্ত জন-জমায়েত হত। শহীদ মিনারে রাত বারটা থেকে শিশু কিশোর-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জমায়েত হতে আরম্ভ করত। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত। হয়ত কোন সঙ্গীতের আসর বসত। পোস্টারের প্রদর্শনী হত। তাই দেখত। শহীদ মিনারের কাছে একটি বিষাদ কিন্তু উদ্দীপনার আবেগ তৈরী হত। তা থেকে সহজে কেউ সরে আসতে চাইত না। এখন আর সে আবেগের কোন অস্তিত্ব নেই। সবই সুশৃঙ্খলিত। তবু একুশের একটা টান আছে। সেই টান রাজনীতির বাইরে যারা আছে তারাও পথে বেরিয়ে এসেছে। এই নিয়ন্ত্রণকে মেনেই শহীদ মিনারে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। রাজনীতির দল-উপদল নিজেদের অভিমতও যে কিছু পরিমাণে এ উপলক্ষে প্রকাশ করার চেষ্টা না করেছে, তা নয়। গত রাতে কোন ছাত্রদলের শহীদ মিনারের উপরের চত্বরে ওঠা নিয়ে পুলিশ

বাহিনীর সঙ্গে নাকি বিরোধ ঘটেছে। পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে এ একুশ নিয়ন্ত্রিত এবং আবেগহীন আনুষ্ঠানিকতার একুশ। একজন রিকশাওলা দুপুরে শহীদ মিনার থেকে প্রত্যাগতদের পায়ের জুতোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'শুধু এখন নয়। সকালেও অনেকের পায়েই জুতা ছিল। সাহেব, সে একুশ আজ আর নাই। আর বছর দুই যাও থাকবে, তারপরে আর তাও থাকবে না। এক বন্ধু বললেন, নিয়ন্ত্রণকারী এক স্বেচ্ছাসেবক নাকি শহীদ মিনারের পাদপীঠে নিজে স্বজুতায় থেকেই অপরকে জুতা খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। একুশ উপলক্ষে সরকারী প্রতিষ্ঠান, প্রধানত: বাংলা একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। বাংলা একাডেমিতে জনসমাগম কম হয়নি। তাদের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল সন্ধ্যাবেলার নাট্যানুষ্ঠান কিংবা সঙ্গীতানুষ্ঠান। এর সাথে কিছু আলোচনাও ছিল। ছোটদের বিতর্ক ছিল। '৭৬ সনের জন্য বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে গতকাল। ছ'টি ক্ষেত্রে এঁরা সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে থাকেন। এবার অনুবাদে আমার নাম এঁরা এঁদের এই নির্বাচনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটা আমাকে বিব্রত করেছে বেশী। বেশ কয়েকজন অভিনন্দন জানিয়েছেন আমাকে। আমি নিজেও একদিন বাংলা একাডেমির কর্মচারী হিসাবে এই সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের সংগঠনগত ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এরূপ পুরস্কার প্রদানের আদৌ কোন যৌক্তিকতা নেই, এমন আমি মনে করিনে। কিন্তু বছর থেকে বছরে এই সাহিত্য পুরস্কারের নির্বাচন এমন সব অ-সাহিত্যিক বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে যে এ পুরস্কারের উদ্দীপনামূলক চরিত্র অনেকখানি বিনষ্ট হয়েছে। আর তাছাড়া কোন পুরস্কারের লক্ষ্য নিয়ে আমি আদৌ কোন কাজ করিনি। আমার কাজেরও তেমন বৃহৎ কোন পরিমাণ নেই। আমি পেশাগত সাহিত্যিকও নই। নিজের অনুভূতিতে যে কাজ করা আবশ্যক বোধ করেছি নিজের শক্তিমত তা করার চেষ্টা করেছি। আগামীতেও তা করব। এ সব পুরস্কার প্রদান অনেক ক্ষেত্রে নানা ঈর্ষা এবং কটুক্তি বা বক্রোক্তির উদ্রেক করে। সেদিক থেকে আমাকে একুশের সাহিত্য পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত না করলেই আমি অধিকতর উপকৃত বোধ করতাম। কিন্তু এ নির্বাচনে আমার কিছু করণীয় ছিল না। আমাকে পূর্বাহ্নে জিজ্ঞেস করলে আমি সবিনয় এটি নাকচ করতাম। কিন্তু আজ প্রকাশ্যভাবে বিবৃতি দিয়ে এটি প্রত্যাখ্যান করার তাৎপর্য ভিন্নতর। সে তাৎপর্যকে আমি বুঝি। কিন্তু তেমন রাজনীতিক পদক্ষেপ নেয়াও এক ধরণের বাড়াবাড়ি বৈ আর কিছু নয়। এরূপ উদাহরণ যে ইতোমধ্যে কিছু তৈরী না হয়েছে তা নয়। বদরুদ্দীন উমর বছর দুই আগে তাঁকে প্রদত্ত বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার বিবৃতি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমর তাঁর প্রতিবাদী অভিমতের জন্য বেশ আলোচিত সাহিত্যিক এবং ব্যক্তিত্ব। মতামতের জন্য উঁচু অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করেছেন। সাহিত্য পুরস্কার দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্র সাহিত্যিকদের ক্রয় করার চেষ্টা করে। তিনি সেভাবে ক্রীত হতে চাননি। তাঁর এ কথারও জোর যে নেই তা নয়। কিন্তু এ রাষ্ট্রযন্ত্র জনসাধারণের টাকাতেই চলছে। এর প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান। তার কাগজে, বেতার, টেলিভিশন এবং নানা শিক্ষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ টাকার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যাখ্যানের নীতিতে এর সবগুলিকেই প্রত্যাখ্যান করতে হয়। কিন্তু স্বরূপ প্রত্যাখ্যানের একটি নৈরাজিক অর্থ যে রয়েছে সেটিও অস্বীকার করা চলেনা। এবার আর যাঁদেরকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দেয়া

হয়েছে তাঁদের মধ্যে কবিতায় রয়েছেন মতিউল ইসলাম, ছোটগল্পে সুচরিতা চৌধুরী, নাটকে মমতাজউদ্দীন, উপন্যাসে দিলারা হাশেম, প্রবন্ধ সিরাজ উদ্দিন কাসেম পুরী এবং শিশু সাহিত্য ফয়েজ আহমদ।

'৮০-এর একুশ

॥২৪-২-৮০॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেল পাঁচটায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে একুশের স্মরণে আলোচনা সভা ডেকেছিলেন। গোড়ার দিকে উপস্থিতি হয়ত দশজনও ছিল না। পরের দিকে হয়ত পঁচিশ জনে পৌঁছেছিল। সেখানেও সংগঠকদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে কিছু বলতে হয়েছিল। যারা স্বভাব বক্তা নয়, ভিতর থেকে বক্তৃতার বেগ যারা বোধ করে না। তাদের জন্য এমন অনুরোধ বড় বিব্রতকর। তবু আমাকে কিছু বলতে হয়েছিল। প্রথমে বলেছিলেন ডা. মহব্বত আলী, শরীফ উল্লাহ ভুঁইঞা, ড. অজয় রায়, ড. শামসুল হক মোল্লা, জনাব আবুল কালাম আজাদ–এঁরা। আমার ব্যক্তিগত কিছু আবেগের প্রকাশ ব্যতীত বলার আর কিছু ছিল না। আমি রাজনৈতিক কর্মী, বিপ্লবী বা নেতা নই। একুশে ফেব্রুয়ারির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাও আমার নেই। তবু বয়সের দিক দিয়ে পঞ্চান্ন বছরে পা দিয়ে কারুর অনুরোধ উপেক্ষা করার যেমন ক্ষমতা নেই, তেমনি বলতে গেলেও বয়সগত অভিজ্ঞতার কিছু স্মৃতিচারণ ব্যতীত তেমন বলারও আমার কোন পুঁজি নেই। সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলার চেষ্টা করলাম: ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি এবং '৫২ সালের বন্দীদশার কথা। বন্দীদের মনে '৫২-এর একুশ কি আশা ও ভরসার কথা শুনিয়েছিল, কিভাবে একুশ শত শত রাজনৈতিক বন্দী, যারা বছরের পর বছর ধরে অন্ধকার গুহায় নির্যাতনে, নিষ্পেষণে, নিরাশায় মুষড়ে পড়ছিল তাদের কিভাবে একুশ নবজীবন দান করেছিল, তার কথা। একুশের সপ্তাহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পালিত হচ্ছে। গত কয়েকদিনের আলোচনায় অন্য সবার মত আমিও আজকের একুশের অনুষ্ঠান সর্ব-স্বতায় দুঃখ প্রকাশ করেছি। তথাপি শিক্ষক সমিতির আলোচনায় আমি যখন বলেছি যে, তথাপি একুশ এখনো আমাদের উদ্বেগের বিষয়, আমরা চেয়ে থাকি উদ্বেগাকুল, চিন্তান্বিত শঙ্কিত মন নিয়ে আগামী একুশ কেমন করে আসবে এবং একুশ পার হয়ে গেল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, সরকার থেকে আরম্ভ করে প্রতিষ্ঠান, সমাজব্যবস্থার সকল প্রতিষ্ঠান– তখন আমি নিজের একটি অনুভূতির কথাই বলেছি। একুশ এখনো আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন, একটি জিজ্ঞাসা। সরকার থেকে শুরু করে নানা রাজনৈতিক দল এবং প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত নিজ নিজ ইচ্ছা ও কামনা থেকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে চায়। তবু আশংকা থাকে, এবারের একুশ জীবনের কি সত্যকে উদঘাটন করবে?

*　　*　　*

এবার রাত বারটার পর থেকে 'আমার ভাই-এর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'– হৃদয়ের বেদনার্ত এ সুরের গুঞ্জন আমার বাসার পাশের প্রধান সড়কটিতে যত না শুনেছি তার চেয়ে বেশী শুনেছি নানা রাজনৈতিক দলীয় শ্লোগান: 'জেলের ভেতর গুলি কেন, -জবাব চাই, জবাব চাই', 'জিয়া শাহীর গদিতে–আগুন জ্বালো এক সাথে' কিংবা সরকারী দল বি এন পির শ্লোগান, 'জিয়া

আছে যেখানে আমরা আসি সেখানে।' রাতে আমি নিজে বেরুইনি। মেয়ে স্বাতী রাতের প্রথম দিকেই চলে গেল তার মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে। বারটার পরে সে তার বান্ধবীদের নিয়ে শহীদ মিনারে যাবে ফুল দিতে। ছোট ছেলে তিতুকে নিয়ে মেয়েকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে মিনারের সামনে একুশকে আবাহনের সাজসজ্জার আয়োজন দেখলাম। বেশ কিছু ফেস্টুন কবি সাহিত্যিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে টানিয়ে দিয়েছে মিনারের উল্টোদিকের চত্বর। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার যে চরণের উদ্ধৃতি দিয়েছে তাতে ভুল রয়েছে বলে নজরে পড়ল। তিতুও বলল: আব্বা, এ লাইন তো হবে 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ', অত্যাচারের তো নয়'। আমার ও মনে হল, তাই। কোথাও দেখলাম, শব্দের বানানে ভুল আছে। তবু লাল নীল কালিতে বড় বড় পোস্টার এবং তার উপর প্রক্ষিপ্ত উজ্জ্বল আলো চত্বরটিকে ভরে তুলেছে। জাসদের কর্মীরা দেখলাম আবদুর রব এবং মেজর জলিলের ছবি টাঙ্গিয়ে দিচ্ছে দু'দিকে দু'টো গাছের সঙ্গে আর তার সঙ্গে প্রশ্ন: রব-জলিল জেলে কেন? শহীদ মিনারের চূড়ায় দেখলাম শেখ মুজিবের একটি ছবি টানানো হয়েছে। তাঁর পাশে ফাঁসিতে নিহত জাসদের কর্নেল তাহেরের ছবিও রয়েছে। একুশের পূর্বে শহীদ মিনারের ব্যবস্থাপনায় থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কমিটি। এবার সে কমিটির নেতৃত্ব নির্বাচিত ছাত্র সংসদ 'ডাকসুর' হাতে। ডাকসুর নেতৃত্ব প্রধানত: জাসদ কর্মীদের হাতে। তাদের কর্মী এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না এবং সাধারণ সম্পাদক আখতার-উজ্জামান দু'জনেই প্রথম শ্রেণির বাগ্মী এবং সংগঠক। কিন্তু শহীদ মিনারের চত্বরে এবং চারপাশে যে জনতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী সে হচ্ছে লোহার টুপি পরা সুসজ্জিত পুলিশ বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনীও বোধহয় মজুদ আছে। অনেকে বলেছেন, এবার শহীদ মিনারে যত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে তেমনটি ইতিপূর্বে আর কখনো করা হয়নি। পুলিশ বাহিনী থাকুক বা না থাকুক দেশের রাজনৈতিক যা অবস্থা তাতে শহীদ মিনারের পুষ্পদানের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে, বিশেষ করে সরকারী দল বি এন পি এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে না কোন সংঘাত বেধে যায়–এ আশঙ্কা সবার মনে ছিল। কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। একুশের সকালে আগের রাতের যে বিবরণ পাওয়া গেল তাতে বোঝা গেল যে বারটার পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর মন্ত্রীবর্গকে নিয়ে শহীদ মিনারে গিয়েছিলেন। মিনিট কয়েকের মধ্যে তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ পুষ্পমাল্য স্থাপন করে চলে যান।...

ছোট ছেলে তিতু সকাল ছ'টার দিকে বাসা থেকে বেরিয়ে ঘুরে এল। আমাদের বাসার পাশ দিয়ে নীলক্ষেত সড়ক দিয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল আজিমপুর কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেখান হয়ে সমস্ত সংঘবদ্ধ মিছিল শহীদ মিনারে এসে শেষ হবে। কখন কোন মিছিল রাত বারটা থেকে গিয়েছে এবং তাদের জমায়েতের কোনটি কি রূপ ধারণ করেছিল তা আমি দেখিনি। আমি রাস্তায় বেরিয়েছি সকাল সাতটায়। খালি পায়ে একটি ব্যাগ হাতে পশ্চিম দিকে এগুতে গিয়ে দেখলাম, পেছন থেকে একটি শোভাযাত্রা আসছে। সেটি দেখার জন্য নীলক্ষেত আজ পুরাতন রেল সড়কের রাস্তার চারমাথায় দাঁড়িয়েছিলাম। তখনি বেশ কয়েকটি মিছিল দেখলাম। প্রথমটি জাসদ, মানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং তাদের ছাত্র শাখা ছাত্রলীগসহ অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের ফেস্টুনসহ মিছিল। তারা সবাই শ্লোগান দিচ্ছিল। এর পরে এল

আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গসংগঠনসমূহের মিছিল। এ মিছিলের সামনেও আমার পরিচিত কিছু নেতাকে দেখলাম। আবদুল মালেক উকিল, মহিউদ্দীন আহমদ– এঁদেরকে দেখলাম। ড. কামাল হোসেন শেখ সাহেবের মন্ত্রীসভায় বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। '৭৫-এর আগস্টের পরে বিদেশে ছিলেন। সম্প্রতি বুঝি দেশে ফিরেছেন। আওয়ামী লীগের পরে এল চৌধুরী হারুনুর রশীদের ন্যাপ। ন্যাপ এখন অনেক উপদলে বিভক্ত। হারুনুর রশীদ সাহেবকে দেখে বুঝলাম, এটি তাঁর ন্যাপ। এর পরে মণি সিংহের নেতৃত্বে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং আরো কয়েকটি গণসংগঠনের কর্মীরা এল। তাদের নিজ নিজ নামের ফেস্টুন দেখলাম। জেনারেল ওসমানী সাহেবকে দেখলাম, তাঁর দলের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। হাসপাতাল কর্মীদের, বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের মিছিলের দৃশ্যটিও চোখ পড়ল। মোট কথা মারামারি না করে একের পর এক নিজেদের দলীয় বা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিযোগের আওয়াজ এবং ফেস্টুনসহ আজিমপুরের মাজার হয়ে শহীদ মিনারের দিকে অগ্রসর হওয়ার এই দৃশ্য আমার ভাল লেগেছে। অন্ততঃ বিরোধী কিছু দল যে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের দাবীদাওয়া এবং অভিমত দেশের সামনে পেশ করতে চাচ্ছে, তার একটি আভাস শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান এই মিছিলে প্রকাশ পেয়েছে।

আমিও কিছু রাস্তা ঘুরে শহীদ মিনার হয়ে বাংলা একাডেমির কবিতা পাঠের আসরের দৃশ্য দেখতে গিয়েছিলাম। শহীদ মিনার পার হওয়ার সময়ে দেখলাম, মাহমুদুর রহমান মান্না তাঁর আকর্ষণীয় কণ্ঠে দক্ষতার সঙ্গে অক্লান্তভাবে মিছিল ও জন-জমায়েত সম্পর্কে ধারা বিবরণী দিয়ে যাচ্ছেন। মাহমুদুর রহমান মান্নার বিভিন্নমুখী পারদর্শিতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বাংলা একাডেমিতেও বিরাট শামিয়ানার নীচে কবিতা পাঠের আসর অন্যান্য বছরের মতোই বসেছে। মঞ্চে কবি আবুল হোসেন সভাপতিত্ব করছেন। প্রধানতঃ তরুণ কবিরা তাঁদের কবিতা পড়ছেন। নির্বাধ পাঠ। কারুরই পাঠ করতে কোন অসুবিধা নেই। একাডেমির পক্ষ থেকে কারুরই কোন অভিমতে আপত্তি নেই। এ ঐতিহ্যটি ভাল তৈরী হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। হয়ত অনেকের কবিতা অনেকে শুনছে না। হয়ত অনেক কবিতাই দুর্বল। তবু আজকের দিনের কোন কবিতা বক্তব্যহীন নয়। এবং সাধারণ শ্রোতা-দর্শক সপ্রশংসভাবে গ্রহণ করছে কবিদের সব প্রকাশকে। বক্তব্যের প্রধান সুরঃ অন্যায়, অবিচার বা শাসনের অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী সুর। কবি সানাউল হকের সঙ্গে দেখা হল। এখন তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন। তরুণ কবিদের এই তেজী মনোভাবে সানাউল হক দেখলাম বেশ উজ্জীবিত বোধ করছেন। সানাউল আমার শিক্ষা জীবনেরও সাথী, যদিও আমার চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন আমার আগে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে 'তুমি' সম্বোধনে হৃদ্যতা বিদ্যমান। সানাউল ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের একুশের সপ্তাহ উদ্বোধনে বাংলা একাডেমিতে বেশ জোরালো বক্তব্য রেখে সকলের প্রশংসা পেয়েছেন। আজ যে চারদিকে শাসনযন্ত্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল মহৎ ঐতিহ্য এবং চেতনাকে বিকৃত করার একটা অপচেষ্টা চলছে, সানাউল হক তার প্রতি তীক্ষ্ণভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

*　　*　　*

গতকাল মানে ২৩ তারিখের বিকেলে সাংবাদিকতা বিভাগের একুশের আলোচনাতে যোগদানের জন্য আমার প্রতি আহ্বান আমার কাছে বেশ আকস্মিকভাবে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগই একুশকে যে তেমন গুরুত্ব সহকারে পালন করে, তার কোন পরিচয় নেই। সবাই অপর সব অনুষ্ঠানের অযুহাত দিয়ে নীরব থাকে। কিন্তু একুশ তারিখে কিংবা বাইশ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের সহযোগে বিভাগে বিভাগে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। এটি বিভাগীয় কাজ হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এর কোন আগ্রহ কোথাও আছে বলে মনে হয় না। আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভাগে তো নয়ই। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখলাম সাংবাদিকতা বিভাগে। তাঁদের কি একটি ক্লাব (গণ-সংযোগ ক্লাব বোধহয়) আছে। তাঁদের তরফ থেকে ২৩ তারিখ বিকেলে বিভাগীয় একটি কক্ষে তাঁরা আয়োজন করেছিলেন 'আমাদের সংস্কৃতি চেতনা এবং একুশ'–নামে একটি আলোচনার। বিভাগীয় সংগঠকগণ, বিশেষ করে ছাত্র-কর্মীরা গত দুদিন ধরেই আমাকে খুঁজে বার করে বারবার অনুরোধ করেছেন, আমি যেন আলোচনাটিতে যোগদান করি। তাঁদের এমন ঐকান্তিক আমন্ত্রণ এবং অনুরোধ আমাকে বিব্রত করেছে। কেন যে আমার উপর তাঁদের দৃষ্টি পড়ল, তা আমি এখনো বুঝতে পারছিনে। একটি কারণ হয়ত এই যে, এমন একটি ধারণা তাঁদের হয়েছে যে লোকটি দুর্বল এবং কোন অনুরোধ বা আদেশ অমান্য করতে পারে না। এ ধারণা যথার্থ।

তাই মনের অস্বস্তি সত্ত্বেও আমি তাঁদের আলোচনাটিতে যোগ দিয়েছিলাম। আলোচনায় ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক আহমেদ হুমায়ুন, 'অবজারভার' পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব নজরুল ইসলাম, বিভাগীয় অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, ওয়াজির হোসেন। তাছাড়া ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এবং এই বিভাগেরই ছাত্র সুবক্তা আখতারউজ্জামান এবং আরো কয়েকজন আলোচনা করলেন। আহমেদ হুমায়ুন সংক্ষিপ্তভাবে এবং সুনির্দিষ্ট করে বললেন, একুশের মূল চরিত্র হচ্ছে জনগণের সার্বিক মুক্তি। সে মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত একুশ সার্থক হয়েছে বলা চলে না। এবং বললেন যে, এটাও লক্ষণীয় যে সেই '৫২ সালের আন্দোলনের সঙ্গে ব্যাপকতম জনতা যতটা সম্পৃক্ত ছিল আজ একুশের আবেদনে তারা যেন ততটা উদ্বুদ্ধ বা সম্পৃক্ত নয়। যেন একটা দূরত্ব দাঁড়িয়ে গেছে একুশের শহরভিত্তিক উদযাপন আর শ্রমিক কৃষক জনতার দূর থেকে নিস্পৃহ দর্শনের মধ্যে। কথাটা ঠিক। কয়েকজন আলোচক বাংলা ভাষার প্রচলন বা শিক্ষা প্রসঙ্গে ইংরেজী অবহেলিত যেন না হয় এবং ইংরেজী অবহেলিত হওয়ার পরিণাম সম্পর্কেও বললেন। আখতারউজ্জামান বললেন, একুশের স্মৃতিচারণের যে আবর্তে আমরা আবর্তিত হচ্ছি তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে একুশ তার সার্থকতা লাভ করতে পারবে না। সংগঠকরা আমাকে উপস্থিত করতে গিয়ে 'প্রধান অতিথি' ইত্যাদি বলে আমার অবস্থা আরো সঙ্গীন করে তুললেন। আমার বক্তব্যের পূর্ব পর্যন্ত যারা বলেছিলেন তাঁদের সকলের বক্তব্যই আমার বেশ ভাল লেগেছিল। সেদিক থেকে আলোচনাটি বেশ ভাল হয়েছিল। আমি সেজন্য সংগঠকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানালাম। আমার নিজের বক্তব্য বলতে গিয়ে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বললাম। বললাম: আমার অনুভূতিতে 'একুশ' নিজেই একটা নতুন সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি এর পূর্বে আমাদের ছিল না। বাংলাদেশের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক দীনতার ফাঁককে একুশের চেতনা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনেকখানি পূর্ণ করে দিয়েছে। কিন্তু একুশ ভাষা আন্দোলন হলেও একুশ অবশ্যই একটি প্রতীকী আন্দোলন। ভাষার জন্য ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। ভাষা মানুষের জীবনের মুক্তি এবং প্রকাশের জন্য। তাই মানুষ মাত্রের যে স্বপ্ন, একটি সুখী জীবন-যাপন করার স্বপ্ন এবং সমাজ-রাষ্ট্রগতভাবে একটি সঙ্গতিপূর্ণ সুখী সমাজ গঠন করার স্বপ্ন তার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একুশের সংগ্রামী তাৎপর্যপূর্ণ নিঃশেষিত হবে না। অবশ্য সরকারের পর সরকার এসেছে ও গেছে এবং তাদের চেষ্টা হয়েছে ক্ষমতায় আসার পূর্বে একুশের সংগ্রামী শক্তিকে ব্যবহার করে ক্ষমতাকে লাভ করার এবং ক্ষমতা লাভের পরে একুশকে অনুষ্ঠানে মাত্র সীমাবদ্ধ করে রাখার। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই একুশ অগ্রসর হয়ে এসেছে। এবং সেদিক থেকে এবারের একুশ কোন ব্যতিক্রম নয়। এবারের একুশেও প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিরোধী শক্তির চরিত্র। আর তাই আমি নিজে হতাশা বোধ করছিনে চারদিকের একুশের অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান-সর্বস্বতায়। একুশকে অবশ্যই সংগ্রামী তরুণ তার অনুষ্ঠান-সর্বস্বতার আবর্ত থেকে বার করেনিয়ে আসবে এবং তরুণদের সেই সংগ্রামী প্রয়াস আগামী একুশেতে আবার কিভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে তা দেখবার দুর্বার আগ্রহ অপর সকলের ন্যায় আমারও। সেদিক থেকে শুধু অতীতে নয়, বর্তমানও এক একুশ থেকে আর এক একুশকে দেখার আগ্রহ এবং আকর্ষণও আমাদের এই কষ্টকর জীবনে বেঁচে থাকার প্রেরণা বিশেষ। আর তাই একুশ আজো আমাদের জীবনের সঞ্জীবনী। বক্তব্যটি এভাবে বলার চেষ্টা করে সংকুচিতভাবে আমি বসে পড়লাম। সংগঠকগণ এবং সমবেতরা সহর্ষে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। আমার নিজের প্রসন্নতা এখানে যে, তাঁদের এই আকস্মিক আমন্ত্রণের দায়িত্ব আমি যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করেছি।

॥১৯৮১॥

নানা কথা এবং নানা কথার পরের কথা
সরদার ফজলুল করিম, প্যাপিরাস, ১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

একুশের সংকলন '৮০: স্মৃতিচারণ

২১শের সাথে যাঁরা জড়িত ছিলেন– যাঁরা এখনো বেঁচে আছেন তাঁদের কাছ থেকে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ২১ সম্পর্কে তথ্যাদি উপস্থিত করা এবং তাকে ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখা প্রয়োজন। আমার নিজেরও ব্যক্তিগত ইচ্ছা, যদি সম্ভব হত তা হলে যাঁরা আজও বেঁচে আছেন- বয়োবৃদ্ধ হয়েছেন, ২১শের স্মৃতি যাঁদের আজো আছে, তাঁদের কথা আমি ধরে রাখতাম। বাংলা একাডেমির এ-প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবীদার।

'২১শের স্মৃতিচারণ–' এ শিরোনামটি ভাল। কারণ একুশ বলতেই আমরা বুঝি 'ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ'। আবার ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ শুধুমাত্র বাহান্ন সালের স্মৃতিচারণে সীমাবদ্ধ রাখলে ভাষা আন্দোলনের যে সামগ্রিকতা বুঝতে হলে আমাদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ, বিশেষ করে তার সচেতন যে অংশ– বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ, শিক্ষক, কেরানী, কর্মচারী তাঁদের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি বা রাজনৈতিকভাবে বলা চলে, পাকিস্তান থেকে মোহমুক্তি– এটা আমাদের স্মরণ করতে হয়। কেননা যেখানেই ভাষা আন্দোলনের সূচনা সেখানেই এই মোহমুক্তির সূত্রপাত।

একুশের স্মৃতিচারণ করা আমার পক্ষে কষ্টকর। কারণ পূর্বেই বলেছি, সীমাবদ্ধ অর্থে একুশ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করা আমার পক্ষে অসুবিধাজনক। বাহান্ন সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যে আন্দোলন অর্থাৎ যখন ভাষা আন্দোলনের চরম প্রকাশ তখন কিন্তু আমি মুক্ত মানুষ নই, তখন আমি বন্দী। আমি ১৯৪৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ঢাকাতে গ্রেপ্তার হই। তখন থেকেই ধারাবাহিকভাবে আমি ১৯৫৫ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে কারাগারে আটক থাকি। ১৯৫৫ সালের মধ্যভাগে আমি পাকিস্তানের গণপরিষদে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হই। কয়েক মাস পরেই আবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক বছর পরে ১৯৫৬ সালে আমি পুনরায় মুক্তিলাভ করি এবং পাকিস্তান গণপরিষদে সদস্য হিসেবে কিছুকাল কাজ করি। তারপর ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান প্রথম সামরিক আইন জারী করলে উক্ত সালের অক্টোবর মাসে আবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। '৫৮ সাল থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত আমি নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে আবার আটক থাকি। ১৯৬২ সালের শেষের দিকে মুক্তি পাই। এবার আমি আমার সাহিত্য জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা করি। তারপর থেকে প্রায় ন' বছর একজন কর্মী হিসাবে বাংলা একাডেমিতে আমি কাজ করেছি। আবার ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয় তখন সেপ্টেম্বর মাসের দিকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আমাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনী যেদিন ১৭ই ডিসেম্বর কারাগারের বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়– সেদিন আমি অন্যান্যদের সাথে বেরিয়ে আসি। তাই আমার জীবনের একটা দীর্ঘকাল কেটেছে কারাগারে। কাজেই সেদিক থেকে বায়ান্ন সালের ২১শের স্মৃতিচারণ করা অর্থাৎ ছাত্ররা সেদিন যে শহীদ হয়েছেন, ঢাকা শহরের অযুত মানুষ যে রাস্তায় নেমে এসেছেন– গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, জাতীয় জীবনে যে ঘটনা খুব কমই ঘটে– একে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে প্রকাশ করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

কিন্তু ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র বায়ান্ন সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়– এর পূর্ব আছে এবং পর আছে। এদিক থেকে কিছু কিছু কথা আমার মনে পড়ে– মনকে নাড়া দেয়। ১৯৪৭ সাল থেকেই আমার ব্যক্তি জীবনের যে প্রবাহ বিভিন্ন পথ-ঘাট অতিক্রম করে এসেছে- সেই পটভূমির কিছু স্মৃতিচারণ প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। কেননা এর ফলেই পূর্ব-বাংলার গণ-মানুষের মুক্তি বা মোহ-মুক্তি এবং তার চেতনার বৃদ্ধি। এগুলো আমার তরুণকালের উপর যেমন প্রভাব ফেলেছে- তেমনি সীমাবদ্ধ জীবন থেকে আরো কিছু মুসলিম তরুণও সচেতনভাবে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। আর এসবের ফলশ্রুতিতে বিন্দু বিন্দু করে বিপ্লবের পথ তৈরি সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকে আমারও পরবর্তীর সঙ্গে একটা যোগাযোগ রয়েছে– তা' অস্বীকার করা যায় না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব-বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের মূল হোতা ছিল সমাজগতভাবে মুসলিম সমাজ। এটা অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজে যে রাজনৈতিক ঐতিহ্য, যে সংগ্রামী ঐতিহ্য ছিল সে ঐতিহ্য তখনও মুসলিম সমাজ জীবনে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। একজন যুবক রাজনৈতিক কারণে বন্দী থাকবে এবং সেটা আরও পাঁচজনের কাছে আদর্শ হিসাবে অনুভূত হবে– ঐ ঐতিহ্য তখনও আমাদের মুসলিম সমাজে ছিল না। কথাটা এ কারণেই বলছি যে, পূর্ববঙ্গকে ভাষা ও জাতীয়তার ভিত্তিতে নতুন অস্তিত্ব দিতে হলে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের তরুণকেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মোচন ঘটাতে হবে। সেদিক থেকে আমরা যাঁরা ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে ছাত্র আন্দোলন কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম-তাদের এই কামনা ছিল যেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুসলিম সমাজ বৃহত্তর রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে পারে। যে সাম্প্রদায়িক একটা পরিমণ্ডল এ ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক কারণে সৃষ্টি হয়েছে, যার বাস্তবতা এবং ঐতিহাসিকতা আমরা অস্বীকার করতে পারিনে তার সীমাবদ্ধতার কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা একটা সম্প্রদায়কে মুক্তি দিতে পারে না। মুসলিম সমাজ একটা সম্প্রদায়, হিন্দু সমাজ একটা সম্প্রদায়– এসব সম্প্রদায় নিয়েই ভারতবর্ষ। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা কোন সম্প্রদায়কে তার বাস্তবজীবন, অর্থাৎ তার সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জীবনের যে অভাব, অনটন, বন্দীত্ব– তা থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা বাস্তব সত্য। সেজন্য বিভিন্ন কারণে যখন মুসলিম সমাজে সচেতন লেখাপড়া জানা কেরাণী, ছাত্র, কর্মচারী ইত্যাদির মধ্যে এই সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে চেতনা জাগতে শুরু করলো, তখন এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটা আনন্দের বিষয় হয়ে উঠলো। আমাদের মনে হল আমাদের রুদ্ধ দ্বার এবার খুলে যাচ্ছে। মানুষের জীবনে নানা পর্যায় থাকে। একটা ব্যক্তি আসলে এক ব্যক্তি নয়। বহু ব্যক্তি নিয়েই একটা ব্যক্তি-জীবন। এক ব্যক্তি বৃদ্ধ অবস্থায় যা আছে তরুণ অবস্থায় তা ছিল না। সেদিক থেকে বলতে হয়, সরদার ফজলুল করিম নামে যে তরুণ ছাত্রটি ১৯৪৭-৪৮ সালে ঢাকার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে কিছুটা সক্রিয় ভূমিকায় ছিল অবস্থার প্রেক্ষিতে তারও একটা তাৎপর্য ছিল। সে তাৎপর্য অন্তত: এই যে, যে তরুণ সেদিনকার মুসলিম লীগের প্রধান আন্দোলনের ধারা দ্বারা আচ্ছন্ন হতে চায়নি। সচেতনভাবে সে তৎকালীন বামপন্থী আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত হওয়ার চেষ্টা করে। এটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পরবর্তীকালে যে অগ্রগতি– সে অগ্রগতিকে

বুঝার জন্যই এর একটি সম্পর্ক আমাদের স্বীকার করতে হবে। বিষয়টি ব্যক্তিগত হলেও পূর্ব-বাংলার মুসলিম তরুণ সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি তাৎপর্যবহ। এ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আমি জড়িত থেকেও দর্শন শাস্ত্রে ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সকলের প্রশংসা পেয়ে পাশ করেছি।

তার আগের বছর দর্শন শাস্ত্রে অনার্সে আমি কৃতিত্বের সাথে পাশ করেছি। স্বাভাবিক ভাবে তখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষকই বেশি ছিলেন। তাঁদের যত্নে, আদরে, স্নেহে আমি ধন্য হয়েছি। তাঁরাই আমাকে আমার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ দেখে দর্শন শাস্ত্রের বিভাগে ১৯৪৮ সালে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করতেন তাঁদের সকলেই জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। তাঁরা ভারতবর্ষের মধ্যেও খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। হরিদাস ভট্টাচার্য তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইতিহাস আরও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৫, ৪৬, ৪৭ সালের দিকে হিন্দু শিক্ষকই বেশী ছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তারাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একদিকে মুসলিম ছাত্রের আধিক্য, অপরদিকে হিন্দু শিক্ষকের আধিক্য, এই বলে সম্প্রদায়গত কোন মারাত্মক দ্বন্দ্ব তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না। শিক্ষকরা সকলেই ছিলেন সর্বজন পূজিত। হরিদাস ভট্টাচার্য, ডি. এন. ব্যানার্জি, অধ্যাপক এ. বি. রুদ্র, ড. মাহমুদ হোসেন, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রফেসর রাজ্জাক প্রমুখ- এঁরা ছিলেন আমাদের গৌরব। তৎকালীন ছাত্র সমাজও তাঁদের লেখাপড়ায় ছিল উন্নত- শিক্ষকমণ্ডলী এ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

আমার শিক্ষকমণ্ডলীও আমাকে নিয়ে আশা করেছিলেন যে, আমি শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকব। আমি ক্রমান্বয়ে আরও ব্যুৎপত্তি লাভ করবো, বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে আনবো। কিন্তু তাঁরা আমার একটি দিক তখনও জানতেন না। আমার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়া আরও যে একটি দিক আছে সে বিষয়ে তাঁরা অবগত ছিলেন না। ১৯৪২-১৯৪৩ সাল থেকে– মোট কথা দুর্ভিক্ষের সময় থেকে আমি ছাত্র হলেও এ সময়ে অবিভক্ত বাংলাদেশ কি হচ্ছে- এ সম্পর্কে আমি শুধু সচেতনই ছিলাম না- এর সাথে আমি জড়িতও ছিলাম। আমি ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের কথা বলছি। এ দুর্ভিক্ষ আমার মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল। আমি তখন একটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির আদর্শ অর্থাৎ সাম্যবাদী আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলাম। সে সময় একজন মুসলিম ছাত্রের পক্ষে এমন রাজনীতির সাথে জড়িত হওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগে যখন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও একটি কাঠামোগত পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। এখান থেকে বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু-শিক্ষক কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে তখন চলে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় একজন মুসলিম তরুণ শিক্ষকের অধ্যাপনা ক্ষেত্রে টিকে থাকা দরকার ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগে যে একটা চেতনা আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিল সে কথা বলার জন্য বলছি, পূর্ববঙ্গে যে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তার আমি সক্রিয় সদস্য ছিলাম। ১৩৫০ সনের দুর্ভিক্ষকাল থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আমি জড়িত ছিলাম। কমিউনিস্ট পার্টি শুরু থেকেই জনগণের কাছাকাছি ছিল, দুর্ভিক্ষে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন– তাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নিবারণের চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে ভারতীয় উপ-

মহাদেশে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করে স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করার চেষ্টাও করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। এসব কারণেই আমি কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে যাই। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও সাম্প্রদায়িকতা থেকে শোষিত মানুষের মুক্তি আসেনি। একটা রাষ্ট্র আছে। কিন্তু রাষ্ট্র থাকাটাই বড় নয়। বড় হচ্ছে শোষণ থেকে মানুষের মুক্তি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, পূর্ব-বাংলার কৃষক শ্রমিক তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত দেখতে পাবে, এ ধরনের একটা বোধ সকলের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান ব্যতীত অন্য কোন চেতনা তখন মানুষের মনে ছিল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে বহু কর্মচারী পশ্চিম-বাংলা, বিহার ইত্যাদি স্থান থেকে ঢাকায় এসেছেন- এখানে ভিন্ন উদ্যমে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ ক্রিয়াকাণ্ড শুরু হবে এ ধরনের একটা আশা তাদের প্রত্যেকের মনে ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালেই ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা আঘাত এল। এতদিন একটা কৈফিয়ৎ ছিল যে পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের দ্বারা শোষিত। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা এখন মুক্ত ও স্বাধীন। স্বাধীন বাংলায় তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা জাগরণ ঘটাবে, তাকে উন্নত করবে, তার চর্চা করবে– কিন্তু এই আশার ক্ষেত্রে পূর্ব-বাংলার মানুষ পেল তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর কাছে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে এক বড় ধরনের আঘাত।

১৯৪৮ সালের কথা বলছি। ছাত্র সমাজ তখন যুবলীগ গঠন করেছে। যুবলীগের ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। বাংলা ভাষাই শিক্ষার বাহন হবে, শিক্ষার মাধ্যম হবে। কিন্তু ভাষাকে কেন্দ্র করেই ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঢাকার বুকে ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, আন্দোলন হয়েছিল। সে শোভাযাত্রায় পুলিশের হামলা হয়। সে সময়ের একটা শোভাযাত্রার কথা আমার চোখের সামনে এখনও ভাসছে। জগন্নাথ হলে তখন প্রাদেশিক সংসদের অধিবেশন বসতো। বোধহয় ১২ মার্চ আমরা মিছিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) থেকে শুরু করে আবদুল গণি রোড ধরে সেক্রেটারিয়েটের দক্ষিণ গেটে উপস্থিত হলাম। একজন ছাত্র মন্ত্রী আবদুল হামিদ সাহেবকে ধরে এনে বক্তৃতা দেওয়ালেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "বাংলা ভাষা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ভাষা। সবচেয়ে ভাল ভাষা।" এভাবে তিনি তার জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। এ মিছিলের প্রধান ভাগ ছাত্রই ছিল।

'কায়েদে আযম' ঢাকায় প্রথম এসেই রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন। সেখানে প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছিল। আমি কিন্তু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ আমি মনে করেছিলাম দেশের এ পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে চাকুরী করা সঙ্গত হবে না, আমার দায়িত্বের কথা চিন্তা করে ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি পদত্যাগ করে চলে যাই। জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা শোনার জন্য ঢাকা শহরের অসংখ্য লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। জিন্নাহ সাহেব উর্দুতে ভাষণ দেন। আমি এর পূর্বে জিন্নাহ সাহেবকে দেখিনি। ক্ষীণ দেহ, বেশ দীর্ঘ, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ বেশ বলিষ্ঠ। তিনি বক্তৃতা করতে করতে এক জায়গায় বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কমিউনিস্ট আছে, তোমাদের মধ্যে গুপ্তচর আছে, তোমাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করছে। আমি বলছি ভাষার ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন উঠেছে তাতে উর্দু, কেবল উর্দুই হবে

পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' একথা বলেই তিনি বক্তৃতা শেষ করেন কিংবা তাঁর বক্তৃতায় এটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। সে সময় ছাত্ররা বিশেষ করে, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা সম্বর্ধনার তোরণ জিন্নাহ সাহেবের নামে তৈরি করেছিল। জিন্নাহ সাহেবের ভাষণ শোনার পর ছাত্ররা এতই মর্মাহত হয়েছিল যে, হলে ফেরার পথে সে তোরণ তারা ভেঙ্গে ফেলে। অনেকে বলেছেন- জিন্নাহ সাবেহ রেসকোর্সে ভাষণ দানকালে ভাষার প্রশ্নে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার প্রতিবাদ সেখানেই হয়েছিল। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমি একজন সচেতন কর্মী হিসাবেই সেখানে গিয়েছিলাম এবং জিন্নাহ সাহেব কি বলেন, না বলেন, তার প্রতিক্রিয়া কি হয় এসব জানার জন্য সেখানে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে কোন বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ আমি লক্ষ্য করিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় কার্জন হলে। কার্জন হল মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানে যেসব ছেলেমেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় পাশ করেছেন তাদের সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। আমি ১৯৪৬ সনে পাশ করেছি। কিন্তু ইতিপূর্বে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিনি। চিঠি পেয়েছিলাম উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু আমি ছাত্রদের নির্দিষ্ট জায়গা না বসে শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসি। হলের মধ্যে পেছনের দিকে একটা অংশে ছাত্রদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সার্টিফিকেট বিতরণ পর্ব শেষে জিন্নাহ সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিতে উঠেন। তিনি ইংরেজিতে ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণের এক জায়গায় এসে আবার স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেন: Urdu and Urdu alone shall be the state language of Pakistan.

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চমকে উঠলাম– আমরা পেছনে তাকাতে বাধ্য হলাম। পেছনে ছাত্রদের যে ব্লক ছিল হয়তো ডিগ্রী গ্রহণকারী ছাত্ররাই সেখানে ছিল। সেখান থেকে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে তিনটি শব্দ উচ্চারিত হল 'নো, নো, নো'। এ তিনটি শব্দই মাত্র উচ্চারিত হয়েছিল। এ ছাড়া কোন আওয়াজ বা শ্লোগান সেখানে উচ্চারিত হয়নি। এ তিন শব্দই জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতাকে থামিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। তিনি মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়েছিলেন। তারপর স্বভাবসুলভভাবে ভাষার বিষয়ে আর কোন বক্তব্য না রেখে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেন। জিন্নাহ সাহেব হল থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত হলের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাউকেই বের হতে দেয়া হয়নি। ভাষা আন্দোলনের এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জিন্নাহ সাহেব আরও কয়েকটি জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। কোন কোন জায়গায় বিক্ষোভের কথা শুনেছি। কিন্তু তার কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি এ পর্যন্ত যে স্মৃতিচারণ করলাম এ ছাড়া আর কিছু বলা আমার পক্ষে কঠিন। ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ব্যক্তিগত কারণে সাংগঠনিক দায়িত্বের দিক থেকে আমি ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাই। আমি ঢাকা জেলায়ই এক গ্রামে ক্ষেত-মজুরদের সাথে থাকি। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করি। এ ছাড়া তাদের সাথে সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, দেশের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করে তাদের সচেতন করে তোলার চেষ্টা করি। আমি সেখানে তাদের মাঝে ছদ্মনামেই একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করি। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসের দিকে সাংগঠনিক কাজের জন্য আমি ঢাকায় এসে উঠি। একটা বাসায় আমি থাকি। সেখানে আরও কয়েকজন

কর্মীবন্ধু জড়ো হয়। সেখানে পুলিশের হামলা হয় এবং আমরা গ্রেপ্তার হই। এই সংগঠন তখনকার সরকারের নিকট সবচেয়ে ভয়ের বিষয় ছিল। কারণ এ সংগঠন খেতে খামারে কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছিল। এ কারণেই মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশের নজর ছিল এই সংগঠনের উপর। যদি সরকারিভাবে এটা নিষিদ্ধ সংগঠন নয়। তা সত্ত্বেও এদেরকে কাজ করতে দেয়া যাবে না, এ ছিল সরকারি মনোভাব। ফলে নিরাপত্তা আইনের আওতায় সংগঠনের কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে থাকে। এই আইনের বলে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রয়োজন হয় না, সরকার এই আইনের আওতায় যে কোন লোককে গ্রেপ্তার করতে পারে। বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সরকার এ আইনের আওতায় গ্রেপ্তার করে। সরকারের এ কর্মসূচীর আওতায় আমিও অন্যান্য কর্মীবন্ধুদের সাথে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হয়ে জেলখানায় যাই।

তখন জেলখানার ভিতর রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে একটা অস্থিরতা চলছিলো। ১৯৪৯ সালে আমি জেলে গিয়েই তা বুঝতে পারি। জেলখানার মধ্যে সে সময় বন্দীরা নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অনশন সংগ্রাম চালিয়েছিল। এ সংগ্রাম ৫৮ দিন যাবৎ চলেছিল। জেল কর্তৃপক্ষ অনশনরতদের জোর করে দুধ খাওয়ানের চেষ্টা চালিয়েছিল। আমি যেদিন জেলে যাই সেদিন এ সংগ্রামের ২০ দিন অতিক্রান্ত। জোর-জবরদস্তি করে দুধ খাওয়াতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নিবেদিত কর্মী শিবেন রায় নিহত হন। জোর করে নল দিয়ে দুধ খাওয়াতে গিয়ে শ্বাসনালীর মধ্যে দুধ চলে যায়। ফলে, তার মৃত্যু ঘটে। শুধু একটিমাত্র ঘটনা নয়। ১৯৫০ সালে রাজশাহীতে জেলখানার ভেতরে খাপরা সেলে যেসব রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন পুলিশ তাদের উপর গুলি চালালে সাতজন রাজনৈতিক কর্মী মৃত্যুবরণ করে।

আমি বলছিলাম, তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রগামী অংশ বামপন্থী মহল কী করে জেলে গেছেন, অসহনীয় নির্যাতন সয়েছেন– কিন্তু এসব পরিবেশের মধ্য দিয়েও আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে গেছেন, মনোবল রক্ষার চেষ্টা করেছেন, অনেকে মৃত্যুবরণও করেছেন– এর কথা। '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। পূর্ববঙ্গের যে রাজনৈতিক কাঠামো, যে নেতৃত্ব তা সরকার পরিবর্তনে তখন যথেষ্ট ছিল না। একটা হতাশা আমরা জেলখানার মধ্যে বিশেষভাবে অনুভব করতাম। তথাপি কমিউনিস্ট পার্টি একটি সুসংবদ্ধ পার্টি। জেলখানায় যেসব কর্মী মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আবদ্ধ রয়েছে তাদেরকে সতেজ ও তাদের মনোবল অটুট রাখার চেষ্টা সে করেছে। জেলখানার ভেতরের রাজবন্দীরা বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতেন না। ফলে সব সময় তাদের মনের ভেতরে একটা হতাশা, একটা বেদনা তাদেরকে অনবরত আঘাত করতো। দেশীয় বা আন্তর্জাতিক কোন খবরই যা রাজনৈতিক বন্দীদের মনোবলকে সতেজ করতে পারে তা' জেলখানার বন্দীদেরকে কোনক্রমেই সরবরাহ করা হতো না। সরকারি কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে চাইতো না।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় আমি ছিলাম রাজশাহী জেলে। সেখানেও আমাদের কানে দূর থেকে ভেসে আসত 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' 'ছাত্র হত্যার বিচার চাই' ইত্যাদি শ্লোগান। আমাদের বন্দীদের তখনকার মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। এ শ্লোগান শুধু রাজশাহী কারাগারে উঁচু দেয়াল ভেদ করে রাজবন্দীদের কানে ঢোকেনি,

ঢাকা সহ সব কারাগারের বন্দীদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বহু ছাত্র কারাগারের বন্দীদের সাথে দেখা করে বলেছিল চিন্তার কোন কারণ নেই- আমাদের আন্দোলন জোরসে চলছে। অনেকে বন্দীদের জড়িয়ে ধরে বলেছে, জয় আমাদের সুনিশ্চিত ইত্যাদি। অনেক ছাত্র, দলীয় কর্মী দলে দলে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। এসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভাষা আন্দোলন জাতীয় জীবনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। এ সম্পর্কে 'গল্প নয়' বলে আমার একটি প্রবন্ধ আছে। তাতে আমি এ মনোভাবই ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি, কিভাবে এ ভাষা আন্দোলন আমাদেরকে এ বন্দীশালার মধ্যে উজ্জীবিত করেছিল।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে রাজশাহী জেলে একশতের উপরে নতুন রাজবন্দী এলো। আমরা পরস্পরে মিলতাম শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময়। জুম্মার নামাজই একমাত্র উপযুক্ত সময় ছিল যখন সরকারী কর্তৃপক্ষের কোন বাধা দেয়ার সুযোগ ছিল না। আমরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা ঐ সময়েই সেরে নিতাম। শুক্রবারের জুম্মার জামাতও আমাদের দাবীর মাধ্যমে আদায় করে নিতে হয়েছিল।

আজকের অবস্থা থেকে যদি আমরা পুরোনো দিনের দিকে তাকাই তবে বলা চলে সমগ্র পূর্ব বাংলা একটা বন্দীশালায় রূপান্তরিত ছিল। শ্রমিক, কৃষক তথা বাংলার মেহনতী মানুষ তাদের স্বপ্নভঙ্গ থেকে নানা হতাশার মধ্যে নিপতিত ছিল। যখন তারা আলোর আশা করছিল ঠিক সেই সময়েই ভাষা আন্দোলন নতুন পর্যায় নতুন বিস্ফোরণ এনে সমস্ত পূর্ববঙ্গকেই নতুন জীবন দান করেছিল। সেদিক থেকেই আমরা এখনও ভাষা আন্দোলনের কথা বলি।' এত বছর পার হয়ে গেছে, তবুও আমরা বলি এ আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। এ আন্দোলনের খুঁটিনাটি, ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, এটা যাঁর স্মৃতিতে যে রকম থাক না কেন, সমস্ত কিছু আমাদের সংগ্রহ করতে হবে।

সঙ্গ-প্রসঙ্গের লেখা: সরদার ফজলুল করিম

সংগ্রহ ও সংকলন: শেখ রফিক, রোদেলা প্রকাশনী, ১১/১ ইসলাম টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

একুশের ডায়েরি: ৮৪

॥২২-২-৮৪॥ বছরান্তে আমার মনের সেই এক প্রশ্ন: এবার একুশ কেমন করে কাটবে? এবারের একুশ কেমন হবে? ১৯৮৪-তেও এই প্রশ্ন ফেব্রুয়ারি শুরু না হতেই মনে জেগেছিল।

একুশের সাজসাজ রব চারদিকে ফেব্রুয়ারির গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল। একুশের চিন্তা যেন শহীদ মিনারের চেষ্টা। একুশ মানেই যেন শহীদ মিনার। এবং ১৯৭১-এর পর থেকে সরকার এবং সরকার-বিরোধী—এই উভয়পক্ষের মান-সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ শহীদ মিনারে যেতে পারা, না-পারা নিয়ে। সরকার নিয়ম করেছে, সরকার প্রধানের রাত বারোটা এক মিনিটে শহীদ মিনারে গিয়ে মিনারের পাদদেশে পুষ্পস্তবক রাখতে হবে। সরকার প্রধানই প্রথমে যাবেন। তারপরে অন্যদের কথা। সরকার প্রধানের আগে আর কেউ যেতে পারবে না। এ রেওয়াজটা যে কে করেছিলেন, তা এখন গবেষণার ব্যাপার। হয়তো শেখ সাহেবই করেছিলেন, ১৯৭২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু তখন তো স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত। ১৬ ডিসেম্বরের পরে প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি। শেখ সাহেবের রাত বারোটা এক মিনিটে যাওয়াটা তখনো প্রথা হয়ে দাঁড়ায়নি। শেখ সাহেব স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয়ভাবে স্বীকৃত নেতা। তিনি প্রথমে শহীদ মিনারে যাবেন শ্রদ্ধা জানাতে, তাতে কোনো অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু তারপর থেকে, কেবল শেখ সাহেবের জীবনকাল পর্যন্ত নয়। তাঁর হত্যার পরবর্তীকালে আসীন সরকার প্রধানরাও শেখ সাহেবের সেই রীতিটি অনুসরণ করে আসছেন। স্বাধীনতার পূর্বে এমনটি ছিল না। স্বাধীনতার পূর্বে সরকারগণ চাইতো শহীদ মিনারকে ভাঙ্গতে, তাকে আঘাত করতে। ১৯৫৮ সালে নির্বাচিত সরকারের উচ্ছেদের মাধ্যমে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭১ সাল অবধি পূর্ববঙ্গের কোনো সরকার প্রধান ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এসেছে, এমন স্মরণ করা যায় না। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল ১৯৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারি। তখনো ২৫ মার্চ আসেনি। গণআন্দোলন দিন থেকে দিনে অধিকতর উত্তাল হয়ে উঠছে। এমন দিনে এসেছিল ২১ ফেব্রুয়ারি বোধহয়। তখন ভদ্রলোক অ্যাডমিরাল আহসান পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গের গভর্নর। একটু ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। আমার স্মরণ হয়, তিনি এসেছিলেন সেই '৭১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ মিনারে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে শহীদদের উদ্দেশ্যে হাত উঠিয়ে সামরিক কায়দায় তিনি সালাম জানিয়েছিলেন।

কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের আর শহীদ মিনার ভাঙ্গার প্রশ্ন নয়। যদিও শহীদ মিনারে মিনার থাকবে, না মসজিদ হবে, তার বাহেস দেশের একটি মহলে প্রকাশ্যে, গোপনে এখনও চলছে। কিন্তু দৈহিকভাবে শহীদ মিনারকে আঘাত করার সাহস চরম প্রতিক্রিয়াশীল মহলও দেখাতে পারেনি। ১৯৭১-এর পরবর্তী পর্যায়ে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রধান প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, শহীদ মিনারকে দখল, বেদখল করা নিয়ে।

পৃথিবীর কোনো দেশেই কোনো সরকার তর্কাতীত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয়।

সরকার সম্পর্কে সরকারের বাইরে যারা অবস্থান করে তারা নানাভাবে নানা প্রশ্নে সরকারের আলোচনা-সমালোচনা করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ না করেও বলা যায়, প্রতিষ্ঠিত ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের সরকারও সাধারণত এই আলোচনা-সমালোচনা বরদাশত করে। তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এবং কোনো ক্ষেত্রে যদি ভোট কিংবা অভিমত গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশিত হয়, তাহলে সরকারে অধিষ্ঠিত দল বা ব্যক্তিবর্গ সরকারের আসন ছেড়ে দিয়ে বিরোধী দল বা পক্ষকে সরকারে আসীন হওয়ার পথ করে দেয়। কিন্তু বাংলাদেশে তথা বাংলাদেশের মতো এমন আরো বেশ কিছু দেশে দেখা যায়, সরকারে যারা একবার আসন গ্রহণ করেছে, সে নির্বাচনের ভেতর কিংবা বাইর, যেদিক দিয়েই হোক না কেন, তারা আর আসন পরিত্যাগ করতে চায় না। কাজেই এসব দেশে সরকার মানেই বিতর্কিত সংস্থা। সরকার মানেই দেশে বিদ্যমান দুই পক্ষের এক পক্ষ। সে বিরোধী পক্ষ কোনো সময়ে অসংগঠিত ও বিভক্ত এবং বিপর্যস্ত থাকতে পারে। কিন্তু ক্ষমতা দখলের দিন থেকে সময় যতো অতিক্রান্ত হতে থাকে, বলা চলে, দেশ ক্রমান্বয়ে ততো অধিক পরিমাণে সরকার-পক্ষ এবং বিরোধী-পক্ষ– এই দুইয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়তে থাকে।

অন্য দেশের এমন জাতীয় শহীদ দিবস ও শহীদ মিনারে কি ঘটনা ঘটে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৭১-এর পর থেকেই দেখা যাচ্ছে, একদিকে সরকার যেমন রাত ১২টা এক মিনিটে শহীদ মিনারে যাওয়াটাকে একটা সম্মান ও মর্যাদার, তথা তার নিজের শক্তি প্রদর্শনের ব্যাপার বলে গ্রহণ করেছে, সরকার-বিরোধী পক্ষও তেমনি ঐ ক্ষণটিতে সরকার পক্ষকে নির্বিবাদে, নিঃশ্লোগানে শহীদ মিনারে যেতে না দেয়াকে নিজেদের মর্যাদা, তথা শক্তি প্রদর্শনের বিষয় বলে গ্রহণ করেছে। এই প্রক্রিয়াটি বছর থেকে বছরে কেবল যে প্রথাগত রূপ ধারণ করছে, তা নয়। বছর থেকে বছরে তা তীব্রতর আকারও গ্রহণ করছে। এরই প্রকাশ ঘটছে নানা ঘটনাতে: রাত বারোটাতে সরকার পুলিশ আর সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা শহীদ মিনারকে সরকার প্রধানের জন্য দখল করে নির্বিঘ্ন রাখা এবং শহীদ মিনারের এ-পাশ ও-পাশ থেকে বিরোধী পক্ষের ছাত্র-যুবক-তরুণদের শ্লোগান উচ্চারণ, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ইত্যাদিতে।

আমরা নিরীহ শহরবাসী একুশ এলে আজকাল প্রধানত উত্তেজনা বোধ করি, এবার কি ঘটে, তার আশঙ্কায়।

১৯৪৮-র একুশে ফেব্রুয়ারিতে আশঙ্কা আমার গেলবারের চাইতেও বেশি ছিল। ১৯৮৩-তে একুশে ফেব্রুয়ারির আগে এসেছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি, কার্জন হলের কাছে ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর হামলা ও নির্যাতন। এবং তারপরে একুশ যখন এলো, তখন একুশের শহীদ মিনার এবং তার সব আনুষ্ঠানিকতা দখল করে নিলো সরকারি সশস্ত্র বাহিনী। এমন অবস্থায় রাজনীতিক এবং ছাত্র, যুবকদের তরফ থেকে শহীদ মিনার বর্জিত না হলেও একুশের সকল প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানই প্রায় বর্জিত হয়েছিল।

১৯৮৪-তে রাজনৈতিক অবস্থা অধিকতর সঙ্গিন। এবারও একুশে ফেব্রুয়ারির আগে সংঘটিত হয়েছে ২৮ নভেম্বরের আর এক রক্তাক্ত ঘটনা, সচিবালয়ের সামনে। তারপর চাপা এবং অর্ধ-চাপা ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশের মাধ্যমে বিরোধী রাজনৈতিক জোটগুলো ১৯৮৪-র একুশকে প্রতিরোধের একুশ বলে ঘোষণা করেছিল।

সরকারপক্ষও তার নিজস্ব পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। একদিকে যেমন সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ রেখে সে নিজে রাজনৈতিক প্রচার, আক্রমণ ও আওয়াজ চালাচ্ছিল, তেমনি শহীদ মিনারকে সম্প্রসারণের উদ্যোগের মাধ্যমে একুশের প্রতি তার করণীয়কেও দেখাতে চাচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যেই বেশ কিছুদিন ধরে শহীদ মিনারের সামনের রাস্তাটি টিনের ঘরে দিয়ে ভেতরে সরকারের পূর্ত বিভাগ কী যেন করছিল। তখন থেকেই আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, শহীদ মিনারে এবার কি ঘটনা ঘটবে? আমার মনে একটা আশঙ্কা এই জাগছিল যে, দেশে যে আবহাওয়া এবং স্রোত চলছে তাতে একদিকে শহীদরা যতো আমাদের কাছে বিস্মৃত এবং দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছে, শহীদ মিনার ততো এ-পক্ষ ও-পক্ষের লড়াইয়ের বেদিতে পরিণত হচ্ছে। আমার মনের এই আশঙ্কাটিই প্রকাশ পেয়েছিল আমার একটি ব্যক্তিগত রচনাতে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখাটির শিরোনাম ছিল: 'শহীদের মিনার কিংবা মিনারের শহীদ'। আমার আবেগটি ছিল এই যে, শহীদ মিনার যতো সম্প্রসারিত হচ্ছে, ততো শহীদরা যেমন বিস্মৃত হচ্ছেন, তেমনি শহীদ মিনার মিনারের শহীদে পর্যবসিত হচ্ছে। এখন আর শহীদরা বড় নন। বড় হচ্ছে মিনার কিংবা তার বাহারি উঁচু-নিচু চত্বর। কিন্তু মিনারের 'শহীদ' কথাটির একটা অর্থ এও হয় যে, 'মিনারের শহীদ' মানে মিনারের নিচে নিহত 'শহীদ'। কেবল যারা মিনারে শহীদ হয়েছে, তারাই নয়। ভবিষ্যতে এই মিনারের নিচে যারা শহীদ হবে, তারাও।

কিন্তু মিনারের নীচে শহীদ হওয়ার আশঙ্কা এবং সম্ভাবনা যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীহ শিক্ষক আমাদের ওপরই এমন নিদারুণভাবে আসবে, তেমন চিন্তা আমিও করতে পারিনে।

গত বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেমন করে সরকারের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে শহীদ মিনারের শৃঙ্খলা রক্ষার ভার, তথা শহীদ মিনারের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব ১৯৮৪-এর একুশ তারিখে নিয়েছিলেন, তা আমি ভেবে পাইনে। উপাচার্যের পক্ষ থেকে প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এই দায়িত্ব পালনের সারকুলারও এসেছিল। আমিও তার একটি পেয়েছিলাম। আমি নিজের বয়স আর অকর্মণ্যতাকে বিবেচনা করে এ-দায়িত্বে তেমন জড়িয়ে পড়িনি। তবু আমি কেবল উদ্বিগ্নতার অপেক্ষা করছিলাম ২০ তারিখ রাত দশটা থেকে শহীদ মিনারে কি ঘটে, তা জানার জন্য। আমার মনের কামনা ছিল যেন অবাঞ্ছিত দুঃখজনক কিছু না ঘটে। আগের দিনের মতো ২০ তারিখ বিকেলেও সম্প্রসারিত শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে ঘুরে এসেছি। দেখেছি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ঘোষিত জমায়েতে তাদের বক্তব্য পেশ করছে। তাদের অনুষ্ঠান কতোক্ষণ চলার কথা ছিল, তা আমি জানতাম না। কিন্তু রাত দশটার দিকে হাতবোমা বিস্ফোরণের শব্দে চমকিত হলাম। আমার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু তবু রাতে কখন কি ঘটেছে, তা সঠিকভাবে কিছু বুঝতে পারলাম না।

২১ তারিখ সকালে বেরিয়েছিলাম আবার, শহীদ মিনারের দিকে অগ্রসরমান বিপুল জমায়েতকে দেখতে। সকাল দশটাতেও দেখলাম, দলে দলে মানুষ তাদের নিজ নিজ পরিচয়মূলক ব্যানার নিয়ে শহীদ মিনারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ১৫ দল ও ৭ দল তাদের ঘোষণায় বলেছিল, তারা সকাল ন'টায় শহীদ মিনার চত্বরে জমায়েত হবে। এই জমায়েত কেমন হয়, তা দেখার একটা আগ্রহও আমার ছিল। আমি যখন জগন্নাথ

হলের কাছে গিয়ে একটি অগ্রসরমান মোর্চাকে দেখছিলাম, তখন হঠাৎ সামনে একটা হুটোহুটি পড়ে গেল। আতঙ্কে সবাই পেছন দিকে দৌড়াতে লাগলো। আমিও দৌড়ালাম। কিছুদূর গিয়ে থামলাম। ভাবলাম, নিশ্চয়ই শহীদ মিনারে পুলিশ হামলা চালিয়েছে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করছে। কিন্তু কিছু পরে দেখলাম, লোকজন আবার ফিরে দাঁড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে। হয়তো অসৎ কেউ একটা আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। যাহোক, আমিও আবার এগুলাম। ফুটপাত থেকে দেখলাম, যে-বড় মোর্চাটি ফুলের মালা হতে এগুচ্ছে, তার নেতৃত্বে রয়েছেন সাদা শাড়ি পরিহিতা বেগম খালেদা জিয়া। তিনি দু'পাশের মানুষের দিকে চেয়ে হাত তুলে হাত নাড়ছেন। এগুতে এগুতে শহীদ মিনার পর্যন্ত এলাম। তেমন কোনো অসুবিধে হলো না। মনে হলো যেন এবারের একুশ নির্বিঘ্নেই কেটেছে।

কিন্তু আমি বেখবরের লোক এমনটি ভাবতে পেরেছি। বাসায় এসে কাগজ খুলতে দেখলাম, কাগজে রিপোর্ট বেরিয়েছে, রাত বারোটার আগে-পরে শহীদ মিনারে নানা ঘটনা ঘটেছে। জনদলের মিজানুর রহমান চৌধুরী লাঞ্ছিত হয়েছেন। এ-পক্ষ ও-পক্ষ থেকে ইট-পাটকেলের বর্ষণ হয়েছে এবং ফাঁকা গুলি ছোঁড়া হয়েছে। মিজানুর রহমান চৌধুরী রাজনৈতিক নেতা। তাদের লাঞ্ছিত কিংবা সমাদৃত হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু যে খবরে চমকে উঠলাম, সে হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ড. খায়রুল বাশারের আহত হওয়ার খবর। ড. বাশার কেবল যে বিজ্ঞানের শিক্ষক, তাই নয়। তেমন হলে আমার পরিচয় ততো ঘনিষ্ঠ হতো না। কিন্তু ড. বাশার আমার প্রতিবেশী। আমার দালানেরই বাসিন্দা। আমি যে-বাড়ির নিচতলাতে থাকি, ড. বাশার থাকেন তারই তিনতলাতে। কিন্তু ড. বাশার আহত হলেন কেন?

উদ্বেগভরা মন নিয়ে আবার গেলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে। ড. বাশারকে নাকি ঐ ওয়ার্ডে নেয়া হয়েছে। আমার এতোক্ষণের না-জানা ঘটনা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেতে লাগলো।

৩২ নং ওয়ার্ডে গিয়ে দেখলাম, ড. বাশারের ডান হাত প্লাস্টার দিয়ে ব্যান্ডেজ করা। পাশে ভিড় করা ছাত্ররা বললো, ডান হাত একেবারে ভেঙ্গে গেছে। মাথার ভেতরে জখম হয়ে থাকলে জীবন সংশয় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মনটা আমার ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। কেবল ভাবতে লাগলাম, কেমন করে এমন হলো? ড. বাশারের মতো এমন সুজন, ভদ্র, সহাস্য এবং কর্তব্যপরায়ণ লোক সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রতি রোজ যেতে-আসতে আমাদের দেখা হয়। দেখা হতেই হাত তুলে বাশার আমাকে আগে থেকেই সালাম জানান। কেমন করে ঘটলো এই ঘটনা, এই প্রশ্ন মনে নিয়েই ২১ তারিখ বিকেলে শিক্ষক সমিতির আহূত সভায় গেলাম, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাশভবনে। শিক্ষক সমিতি আগেই সভা ডেকেছিলেন একুশের আলোচনার জন্য। কিন্তু সভার শুরুতেই সমিতির কর্মকর্তারা বললেন, এই সভা আমাদের প্রতিবাদের সভা। আমাদের সহকর্মীর ওপর সরকারি বাহিনীর নজরের সামনে সমর্থক পেটোয়া বাহিনীর জঘন্য হামলার বিরুদ্ধে।

সহকর্মী যাঁরা ২০ তারিখ রাতে শহীদ মিনারে গিয়েছিলেন তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে, তাঁদের বর্ণনা শুনতে শুনতে মনটা দুঃখ-ক্ষোভে, বেদনা এবং হতাশায় ভরে উঠেছিল। ড. বাশার রাত এগারোটায় বাসা থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাজ বুকে পরে যাচ্ছিলেন শহীদ মিনারে শহীদ মিনারের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য।

কিন্তু ইতোমধ্যে একদিকে যখন শিক্ষক সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অনুরোধে অনুষ্ঠান শেষে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শহীদ মিনার থেকে সরে গিয়ে বেদি মুক্ত করে দিয়েছিল, তখনি দলে দলে লাঠি, ডাণ্ডা হকিস্টিক নিয়ে মুখ ঢেকে জিপ আর গাড়িতে চড়ে অপর এক প্রতিপক্ষ দল এসে শহীদ মিনার ঘিরে ফেলেছিল। যদিও এর মধ্যে পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনী এসে জমায়েত হয়েছিল, কিন্তু তারা এই নবাগত জঙ্গি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে যদি সশস্ত্র বাহিনীর কাউকে প্রশ্ন করেছেন, এর কারণ কি, তখন নাকি তাঁরা জবাব দিয়েছেন, তারা অসহায়।

ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, তথা পাল্টাপাল্টি নাকি ইতোমধ্যে শুরু হয়েছিল। এমন অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মিনার থেকে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু সরল মানুষ ড. বাশার সে কথা জানতেন না। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন মিনারের দিকে। এমন সময়ে জগন্নাথ হলের কোণে তাঁকে একা এবং স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ পরিহিত দেখতে পেয়ে হামলাকারীরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তিনি বারবার বললেন: আমি তো শিক্ষক, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, আমাকে মারছো কেন? কিন্তু তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র কান না দিয়ে বরঞ্চ যেন অধিকতর প্রতিহিংসা নিয়ে হাতের ভারি ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তাঁর ডান হাতটা ভেঙ্গে এবং মাথার পেছনে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিলো। মাথা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তিনি দৌড়ে সাথিদের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন। তারপর মেডিকলে কলেজ হাসপাতালে।...

আমরা, অসহায় শিক্ষকেরা কি করতে পারি! সমিতির সিদ্ধান্তমতো আজ আমরা কালো ব্যাজ ধারণ করলাম আর প্রতিবাদ হিসেবে নিজেদের কর্ম থেকে বিরত থাকলাম। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখলাম, ছাত্রদের ক্লাশও যেমন হচ্ছে না, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনভবনও বন্ধ। ২০ তারিখ রাতে নিরীহ শিক্ষকের ওপর নির্মম হামলার প্রতিবাদে। এমন প্রতিবাদে মনে হয়তো একটু সান্ত্বনা এলো। কিন্তু আহত ড. বাশারের চেহারা মনে ভেসে উঠতেই আবার আশঙ্কা জাগে, হয়তো বাশারের ডান হাতটা আর পুরো ভালো হবে না। আশঙ্কা, পাছে না মাথার আঘাতটা কোনো খারাপ মোড় নেয়।

আহা! একজন শিক্ষককে কেমন করেই-না ১৯৮৪ সালের একুশের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলো! কেমন করেই-না একুশের শহীদ মিনারের পবিত্রতা রক্ষায় নিজের জীবন বিপন্ন করতে হলো! এই কি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত? তাহলে কি সত্যই শহীদের মিনার, মিনারের শহীদে পরিণত হবে? শহীদ মিনারই বধ্যভূমি হয়ে উঠবে আগামীদিনের শহীদদের?

রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ
সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন

ঢাকাতে একুশে ফেব্রুয়ারির মাসে বাংলা একাডেমির কর্মসূচিই প্রধান কর্মসূচি। 'একুশে' এখন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পের বার্ষিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। বিষয়টির তাৎপর্য আছে। একদিন আবার একুশে ফেব্রুয়ারি মিলনমেলাকেও অতিক্রম করে যাবে। নতুনতর একুশ তৈরি করার জন্য। কিন্তু বর্তমানের এই অবদানটিও মূল্যহীন নয়।

ঢাকার জনজীবনের এই মাসের প্রধান আকর্ষণ বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠানমালা। অন্তত ৭ তারিখ থেকে ২২ তারিখ: এই পনের দিনের প্রতিদিন যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ছিল তেমনি ছিল বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। প্রতিদিন সাড়ে চারটা থেকে শুরু করে সন্ধ্যার পরে আলোচনার শেষে ছিল সঙ্গীত-নাটকের অনুষ্ঠান।

বিরানব্বয়ের একুশ তারিখ বিকেলের আলোচনাটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনার শিরোনাম ছিল: একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এর উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বশীর আল হেলাল। আলোচনায় ছিলেন: ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, জনাব গাজীউল হক, অধ্যাপক মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, জনাব ফয়েজ আহমদ, নাট্যকার প্রফেসর মমতাজউদদীন আহমদ, ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রফেসর আহমদ শরীফ। আমারও একটু ভূমিকা ছিল। আলোচনার তালিকায় আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাব তো আকাশ কালো করে মেঘ নেমে এল। মনে দুই রকম অনুভূতি হলো: আহা! আলোচনাটা নষ্ট হয়ে গেল! কিন্তু নিজের মনে আবার ভাবলাম: আলোচকের দুরূহ ভূমিকা আমাকে পালন করতে হলো না। কিন্তু একাডেমির ভাগ্য ভালো। আধঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়া মোটামুটি ভালো হয়ে গেল। বাসা থেকে খোঁজ নিয়েই জানলাম: হাজার হাজার দর্শকশ্রোতা জমে গেছে। আমার আলোচনার দুর্ভাবনা নিয়ে আমিও শেষ পর্যন্ত একাডেমিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।

আলোচনার বিস্তারিত বিবরণে যাব না। সবটা মিলিয়ে আমার ভালো লেগেছিল। পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলেছিল। নির্ধারিত আলোচক সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন। জনাব বশীর আল হেলালের উপস্থাপিত প্রবন্ধটির উপর বিভিন্ন আলোচকই বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকারের একটি ইতিহাসবোধ এবং বিবরণশৈলী প্রকাশিত হয়েছিল। তার পক্ষে-বিপক্ষে বলার নিশ্চয়ই সুযোগ ছিল। এবং তাতেই আলোচনাটি জমে উঠেছিল।

একুশের এবারকার এই আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থার প্রসঙ্গ উঠেছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি সরকারের প্রশ্রয়ে কেমন করে তার প্রতিহিংসার থাবা বিস্তার করে এগুচ্ছে তার আলোচনা ছিল এবং তাতে জবাবদিহির দিকটিও সোচ্চার ছিল। আমি ভাবলাম, এমন আবহাওয়ায় সরকারের অন্যতম মুখপাত্র ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী হয়তো কিছুটা বিব্রতবোধ করবেন। কিন্তু না, তেমন বোধ হলো না। সেদিক থেকে তিনি যে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যেই সহজে বিচরণ করতে পারেন তার আরেকটি প্রমাণ এদিন পাওয়া গেল। তাঁর সম্পর্কে সভা পরিচালনাকারীর পরিচয়মূলক কথাকে ডা. চৌধুরী সংশোধন করে বক্তৃতার শুরুতে

বললেন: 'আমার নিজস্ব পরিচয়েই আমি এখানে এসেছি। সরকারের মুখপাত্র হিসেবে নয়।' আলোচনায়ও তিনি দক্ষ। তাঁর বক্তৃতা শেষে আলোচনার গোড়ার দিকে আমাদের সকলের সঙ্গে তিনি সহাস্যে হাত মিলিয়ে মঞ্চ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সেটা হয়তো পরবর্তী আলোচকদের জন্য স্বস্তিদায়কই হয়েছিল। আর যাই হোক, পক্ষে-বিপক্ষের সব লোকই তো আমরা বাঙ্গালি–বাংলাদেশী। পরস্পরের ভাই-ভ্রাতা, চাচা-ভাতিজা ও মামা-ভাগ্নে।। তাই কারো সামনের চাইতে পাশে বা পিছনে বলাতেই আমাদের স্বস্তি। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলেও আমরাও বুঝি: এখন মঞ্চ থেকে সরে যাওয়াই উত্তম।

আমার নিজের আলোচনাতে আমি বিব্রত হয়েছি এ কারণে যে, আমি গোড়া থেকে আলোচনার শিরোনাম উল্টো করে চিন্তা করেছিলাম। সেই উল্টো চিন্তা কিংবা পার্শ্বচিন্তা পেশ করতে যখন উঠলাম তখন আলোচনার বয়স দু'ঘণ্টা হয়ে গেছে এবং সম্মুখে উপবিষ্ট জনতার ঘন ঘন করতালির অর্থ হচ্ছে: আলোচনা আর কত? গান কোথায়? 'শেষ করুন। বসে পড়ুন।' আমি দেখলাম: একটু ধমক না দিলে নয়। জনতা মানে আবেগে উদ্বুদ্ধ কিশোর কিংবা তরুণ। তার আবেগ একবার উত্থিত হলে তা ডাইনে-বাঁয়ে কোথায় যাবে জনতাও জানে না। জনতার পরিচালকও জানে না। আমি টেবিল চাপড়ে বললাম, 'গান শোনা সহজ। নতুন বাংলাদেশ গড়া কঠিন। একুশের অস্তিত্বের পরিচয় বাদে একুশ পালনের অনুষ্ঠান প্রহসন বৈ আর কিছু নয়।' এতটুকু বলেই বক্তৃতার দণ্ড থেকে সরে এলাম। বাহ্যত একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু কথাটির প্রয়োজন ছিল। আসলে মূল ভুল সংগঠকদের। এমন আলোচনায় সভাপতিসহ দশজন বিশিষ্ট আলোচককে আলোচনায় উপস্থিত করা সময়ের সীমাবদ্ধতার দিক থেকে নিতান্তই অনুচিত। দ্বিতীয়ত, এমন আলোচনার শেষে সংগীত তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আকর্ষণ রাখাও অনুচিত। সাধারণ শ্রোতা-দর্শকের কাছে ক্রমান্বয়ে আলোচনার চাইতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এবং তখন তার অস্থিরতায় মূল আলোচনাই ভেস্তে যেতে বাধ্য হয়।

কিন্তু সে কথা থাক। আমি বরঞ্চ এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমার চিন্তার কথাটি বলি।

* * *

'একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন।'

আগে শিরোনামের অর্থটা ধরার চেষ্টা করি। একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন: পূর্ববঙ্গ-পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' একটি প্রতীকী তাৎপর্য আহরণ করেছে। গোড়াতে, সেই '৫২ সালে, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আমরা 'একুশের' জন্ম তারিখ বলে চিহ্নিত করেছি। সেদিন থেকে 'একুশকে' আত্মদানের মহৎ আবেগের একটি আধার হিসেবে আমরা বিবেচনা করেছি। এই আবেগ দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছি। যাতে সেদিন নিহত হয়েছিলেন তাদের জীবনকালের বাস্তব সুখ-দুঃখ-কর্মকাণ্ডের অতিরিক্ত তাদের জীবনদানের ঘটনাটি সেকালের পরিবেশে বিপুল আলোড়নকারী ঘটনা বলে বিবেচিত হয়েছে। বলা চলে '৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা সমগ্র পূর্ববাংলাকে আলোড়িত করেছিল। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতিক্রিয়া ঢাকাকে অতিক্রম করে পূর্ববাংলার নানা নগর এবং তাকেও অতিক্রম করে পূর্ববাংলার শেকড় তথা তার কৃষকসমাজকে আলোড়িত করেছিল। '৬৯ এবং '৭১-এর পরবর্তীতে এরূপ জাতীয় আলোড়নকারী ঘটনার সাক্ষাৎ আর আমরা পাইনে।

'৭১-এ অবশ্যই বাঙ্গালির জীবনে একটা পর্যায়ান্তর সংঘটিত হয়েছে। '৭১-এর পরবর্তী পর্যায়ে একুশের আলোচনাকারীদের মধ্যে একটা প্রশ্ন সাধারণত জিজ্ঞাসিত হয়ে আসছে: একুশ কি তার মূল আবেগ ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলেছে? এখন কি একুশ বার্ষিক একটি

তারিখ কিংবা মাসব্যাপী বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য, সাংস্কৃতিক-শৈল্পিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে?

কথাটা বেদনা বা ক্ষোভের নয়। এটাও একুশের কম অবদান নয়। আমাদের জাতীয় জীবনে বার্ষিক এমন পর্ব পূর্বে ছিল না। এতদিনে এই পর্বটি দেশের প্রধান শহরে এবং উপশহরে একটি স্থায়ী অস্তিত্ব ধারণ করেছে। একুশের জন্মবৃত্তান্ত নতুন থেকে নতুনতর প্রজন্মের অজ্ঞাত থাকলেও ২১শে ফেব্রুয়ারির মিলনমেলা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হতে থাকবে বলে আমরা মনে করি। অবশ্য এমন হতে পারে এই মিলনমেলাটির চরিত্র নিয়ে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের পক্ষাপক্ষীর মধ্যে নানা টানাপোড়ন ঘটবে। কিন্তু তাতেও একুশের স্থায়ী অস্তিত্বের স্বীকৃতি ঘটবে।

কিন্তু এ কথা সত্য যে, '৭১ পর্যন্ত একুশের যে রাজনৈতিক চরিত্র এবং অবদান প্রধান ছিল অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির প্রতিবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছিল–'একুশে'র মধ্যে: '৭১-এর পরবর্তীতে সেই রাজনৈতিক চরিত্র একুশের কাছে আশা করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না এবং তার কাছ থেকে তা না পেলেও আমাদের হতাশ হওয়ারও কোনো কারণ থাকা উচিত হবে না।

সেদিক থেকে 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন' শিরোনামে আমাদের ক্রমবিকাশমান সংগ্রামী রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একুশের অবদান বোঝাতে চাইলে '৭১ পর্যন্ত যেমন তার অবদানকে '৫২-এর পরবর্তীতে '৫৪, '৬২, '৬৬, '৬৮-'৬৯ এবং '৭১-এর রাজনৈতিক স্মারকগুলোর সঙ্গে 'একুশ' এবং তার আবেগকে সংযুক্ত করে থাকি, '৭১-এর পরবর্তীতে তেমন করাটা সহজ নয়। তার প্রধান কারণ: '৫২-এর আগে এবং পরে থেকে '৭১ পর্যন্ত পূর্ববাংলার একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য যেমন ক্রমান্বয়ে নেতৃস্থানীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণিগুলোর কাছে অর্জনীয় লক্ষ্য বলে ক্রমাধিকভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছিল, '৭১-এর পরবর্তীতে তেমন কোনো লক্ষ্য এখন পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।

'৭১-এর পূর্ববর্তী এই লক্ষ্যকে আমরা স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেছিলাম। '৭১-এর পরবর্তী পর্যায়ে স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী গণতন্ত্রের পক্ষীয় আন্দোলনের কথা আমরা উচ্চারণ করলেও এই কথাগুলোর অভিন্ন অর্থ আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে আজও নির্ধারিত হয়নি। এ কেবল রাজনৈতিক চেতনার বিষয় নয়। অর্থনৈতিক রূপান্তরেরও বিষয়। কথাটা এখনো যতই অস্পষ্ট হোক, ক্রমান্বয়ে সেটি অনস্বীকার্য হয়ে উঠবে যে, বর্তমান পর্যায়ের যে-শ্রেণিগুলো সবচাইতে বঞ্চিত আর নিপীড়িত তাদের জীবনের চাহিদা মেটানোই এই পর্যায়ের প্রধান বিষয়।

এ পর্যায়ের ভবিষ্যৎ মেয়াদের পরিমাপ করা সহজ নয়। কিন্তু এ কথা সত্য জনজীবন কখনোই ঘটনাহীন থাকবে না। তার সংকট যত বৃদ্ধি পাবে, ঘটনাও তত সংঘটিত হবে। এই মেয়াদ পর্যায়ক্রমে স্বৈরতন্ত্রী গণতন্ত্রীতে এবং গণতন্ত্রী স্বৈরতন্ত্রীতে রূপান্তরিত হতে থাকবে। এবং এরই মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে শোষিত শ্রেণির আপন রাজনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক কর্মী এবং রাজনৈতিক নেতারও উদ্ভব ঘটবে। এবং এই নতুন শক্তির অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস যে তখনো 'একুশে ফেব্রুয়ারি' হবে এবং নতুনভাবে হবে: এটি আশা নিয়ে বলা যায়। কারণ '৫২-এর একুশের আগে ও পরে সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামে, আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছে, সংখ্যাগতভাবে তার প্রধান অংশের আগমন ঘটেছে নিষ্পেষিত কৃষক-শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকেই।

তাদের সেই অবদানের দিকটি এখনো পর্যন্ত আত্যন্তিক গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটিত

হয়নি। এখন পর্যন্ত শহীদের সংখ্যা পরিচিত কয়েকটি নামেই সীমাবদ্ধ। এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে উদঘাটিত করে বিস্তারিত আলোচনায় তার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় আমাদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সরকার ও শক্তির সচেতন অনীহা ও প্রতিরোধের বিষয়টি কি আমাদের অজানিত?

বস্তুত যাঁরা এদিকটির আলোচনাতে গরজ বোধ করেন তাদের বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক।

সেদিক থেকে 'একুশ' নামে যে একটি অস্তিত্বের কথা আমরা বলে থাকি তার যথার্থ পরিচয় এখনো বিবৃত হয়নি। এবং বর্তমানের অনুষ্ঠানাদির পিছনের রাষ্ট্রশক্তির সুকৌশল চেষ্টা হচ্ছে 'একুশে'র সেই যথার্থ পরিচয়টি যেন উদঘাটিত হতে না পারে।

আমার এই অনুভবটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক। সে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যেমন আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাইরে তেমনি সেমিনারের এই সময়টিও তার উত্তম সময় নয়। কিন্তু ব্যাখ্যায় অক্ষম হলেও এই অনুভূতিটি মূল্যহীন হয়তো নয় বলেই আমি তার উল্লেখ করলাম।

একুশের সেই অবয়বটির পরিচয় সংগ্রহে একটি দিকের উল্লেখ করে আমার বক্তব্যটি শেষ করতে চাই।

'একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন' কথাটি বললে একুশে ফেব্রুয়ারির জন্ম থেকে তার পরবর্তী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জাতীয় আন্দোলনের বিকাশে 'একুশে'র অবদানের কথাটিই প্রধান হয়ে আসে। শিরোনামের এ বিন্যাসে এটিই স্বাভাবিক। এবং এটি গুরুত্বপূর্ণও বটে।

বশীর আল হেলালের সুলিখিত উপস্থাপনাতে এদিকটি উপযুক্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সাথে সাথে একুশের ঐতিহাসিক পূর্বপটও তিনি অঙ্কিত করেছেন। তাতে প্রবন্ধটি ক্ষুদ্রাকারের হলেও সমগ্র উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি বহিঃরেখায় পরিণত হয়েছে। এটির প্রচার এবং বহুপঠন আবশ্যক।

কিন্তু আমি যদি শিরোনামটিকে ঘুরিয়ে বলি: 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি' তাহলে কি নতুন কিছু অর্থ তাতে আরোপিত হয়? কিছু যে নতুন অর্থ এ শিরোনামে আসে তা বশীর আল হেলালের উপস্থাপনাও প্রকাশ করেছে। তারও একটি দিক হচ্ছে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি' 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে'র পরিপূরক।

এই পরিপূরকের একটি উপেক্ষিত উপাদান হিসেবে আমি সেই '৪৮ সাল থেকে '৭১ সাল অবধি, অন্তত '৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত (২৫ মার্চের পরে '৭১-এর কথা আলাদা। সেটি সাধারণ আলোচনার আয়ত্তের বাইরে) কারাগারে রাজবন্দীদের জীবনকে বোঝাতে চাই।

রাজবন্দীদের আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি: কথাটি এভাবেও বলা যায়। কিন্তু রাজবন্দী কথাটি পরিচিত হলেও রাজবন্দীদের আন্দোলন কথাটা পরিচিত বা স্বীকৃত কথা নয়।

'৪৮ সাল থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত বিস্তারিত পর্যায়ে সমগ্র পূর্ববঙ্গব্যাপী সকল কারাগারের শত সহস্র রাজবন্দীর কথা আমার জানা নেই। কিন্তু আমার জানা না থাকলেও এটা একটা ঐতিহাসিক অস্তিত্ব: রাজবন্দী। অন্তত '৪৮ সাল থেকে '৫২ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার কারাগারগুলোর মধ্যে যে রাজনৈতিক কর্মীরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী মুসলিম লীগ সরকার দ্বারা, তাদের কারাগারের ভেতরের জীবন নিয়ে এখনো পর্যন্ত তথ্য এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনো আলোচনা হয়নি। এজন্যই এদিকটি আজও

উপেক্ষিত। অথচ '৪৮ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ববঙ্গে আন্দোলনের যে-আবেগ তৈরি হচ্ছিল তার একটি বড় অবদান এসেছিল কারাগারের রাজবন্দীদের কাছ থেকে।

'রাজবন্দী' বললে কথাটির অর্থ দেশের মধ্যে আন্দোলনরত রাজনৈতিক কর্মীদের সরকার আর পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়া বোঝায়। এই নিক্ষিপ্ত হওয়ার মুহূর্তটিতেই যেন রাজনৈতিক কর্মীর রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে যায়। পরবর্তীকালে গণআন্দোলনের ফলে তাদের মুক্তির দাবি যখন বাস্তবায়িত হয় অর্থাৎ রাজবন্দীরা যখন মুক্তি পায় তখন তার রাজনৈতিক জীবন আবার শুরু হয়। কিন্তু মধ্যবর্তী ২, ৫ কিংবা ৭ বছরের তার যে কারাজীবন, এটা যেন তার অরাজনৈতিক জীবন এবং সে কারণে গণআন্দোলনের ঐতিহাসিকের সেই 'অরাজনৈতিক' জীবনের দিনাদিনের কড়চা সংগ্রহের কোনো গরজ থাকে না।

কিন্তু এমন একটি গণআন্দোলনের অস্তিত্ব কি চিন্তা করা যায়, যে-আন্দোলনের আওয়াজের মধ্যে 'রাজবন্দী' কথাটি নেই? 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', দাবি নেই? কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী রাজবন্দী হয়ে যদি 'অরাজনৈতিকে' পর্যবসিত হয়ে যায়, তবে তার উৎস, বাইরের আন্দোলনও কি রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র ধারণ করে অগ্রসর হতে পারে?

আমার মনে হয়, তা পারে না। রাজনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক থাকতে হলে তার রাজবন্দীদেরও রাজনৈতিক থাকতে হয়।

কিন্তু রাজবন্দীর রাজনৈতিক থাকা কি মুখের কথা? সুখের কথা? বিনা ঘানি টানা, ডাণ্ডাবেড়ী পরা, বিনা অনশন ধর্মঘটের এবং কারাগারের ভেতরে অসহায়তমভাবে গুলি খেয়ে শহীদ না হওয়ার ব্যাপার?

না, কারাগারে একজন রাজবন্দীর রাজনৈতিক থাকার প্রতিমুহূর্তের সচেতন সংগ্রাম কারাগারের বাইরের গণআন্দোলনের একজন কর্মীর রাজনৈতিক থাকার চেতনা ও কষ্ট এবং ত্যাগের চাইতে অচিন্তনীয়ভাবে অধিক চেতনা, কষ্ট এবং ত্যাগের ব্যাপার।

এই ইতিহাস আজও লিখিত হয়নি। শুধু দু-একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। এর অধিক নয়। কিন্তু একুশের জন্মের পটভূমিকে যদি আমাদের বুঝতে হয়, এমন কি জন্মের পরে তার রাজনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির দিকটিও যদি আমাদের বুঝতে হয় তবে রাজবন্দীদের কারাগারের অভ্যন্তরের জীবনের ইতিহাস আমাদের গবেষণার মাধ্যমে জানতে হবে।

পাকিস্তানের গোড়াতে, সেই '৪৮ সালের দিকে, রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তার করে যখন জেলখানায় পোরা হতো তখন তাদেরকে একেবারে খতম করার নীতি নিয়েই পোরা হতো।

বিভিন্ন জেলে নিরাপত্তা আইনে আটক রাজবন্দীদের সরকার একেবারে মানবেতর পর্যায়ে নিক্ষেপ করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের আমলেও যেসব সুযোগ রাজবন্দীরা ভোগ করত, মুসলিম লীগ সরকার সেসব সুযোগও রাজবন্দীদের নির্যাতন করার নীতিতে নাকচ করে দেয়। তেমন অবস্থায় রাজবন্দীরা মানুষের মতো আচরণ লাভের দাবিতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে পরিশেষে অনশন ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়। '৪৮-৪৯-৫০ সালে বিভিন্ন জেলের রাজবন্দী বিভিন্ন মেয়াদে অনশন ধর্মঘট করেছিল। এসব ধর্মঘটের বিস্তারিত বিবরণ এখনো সংকলিত হয়নি। এ জন্য স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং বিভিন্ন জেলের '৪০ ও '৫০ দশকের নথিপত্রের উপর গবেষণা প্রয়োজন।

একাধিক ব্যর্থ অনশন ধর্মঘটের পরে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের শতাধিক রাজবন্দী শেষ মরণপণ সংগ্রাম হিসেবে '৪৯-এর ডিসেম্বরে আবার অনশন ধর্মঘট শুরু করে।

'৪৯-এর ডিসেম্বরে কয়েকজন সাথীর সঙ্গে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে আমি যখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিক্ষিপ্ত হই তখন বোধহয় জেলের রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘটের বিশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ৫৮ দিনের শেষে এই ধর্মঘটের একটা সুরাহা হয়েছিল। রাজবন্দীদের কিছু দাবি জেল কর্তৃপক্ষ ও সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। রাজবন্দীদের জীবনের বিরাট মাশুলের বিনিময়ে এই সাফল্য এসেছিল। এই অনশন ধর্মঘটের এক পর্যায়ে কুষ্টিয়ার শ্রমিকনেতা শিবেন রায়কে নিঃসঙ্গ খুপরিতে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। এই অনশন ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়াতেই ধর্মঘটের অব্যবহিত পরে ঢাকার খ্যাতনামা কমিউনিস্ট নেতা ফণী গুহ অস্বাভাবিকভাবে মারা যান। চট্টগ্রামের কৃষকনেতা ধীরেন শীল এবং অমর সেন অনশনের প্রতিক্রিয়ায় তাঁদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এবং এই সময়েই '৫০ সালের এপ্রিল মাসে, ২৪ এপ্রিল, রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে একটা ছোট্ট বাংলাঘরে (খাপড়াওয়ার্ডে) রাজবন্দীদের আটক করে জেলের 'পাগলা ঘণ্টি' বাজিয়ে সশস্ত্রবাহিনীকে জেলখানার ভেতরে ঢুকিয়ে একেবারে নিকট থেকে জানালার গরাদে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বিরামহীনভাবে গুলিবর্ষণ করে ৭ জন রাজবন্দীকে হত্যা করা হয়। এই সাতজন রাজবন্দী ছিলেন: হানিফ শেখ, বিজন সেন, সুধীন ধর, কম্পরাম সিং, আনোয়ার হোসেন, দেলোয়ার হোসেন এবং সুখেন ভট্টাচার্য। এই গুলিবর্ষণের ফলে অনেক রাজবন্দী জীবনের জন্য পঙ্গু হয়েও যান।

কারাগারের মধ্যে অনশন ধর্মঘটের মতো সচেতন সাহসী আর মারাত্মক সংগ্রামের কথা চিন্তা করা যায় না। শুধু একটি বাক্যে অনশন ধর্মঘটের মেয়াদ কিংবা তার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিয়ে একজন রাজবন্দীর কারাগারের মধ্যে রাজনৈতিক জীবন রক্ষা করার প্রতিমুহূর্তের জীবনপণ সংগ্রামের কথা বোঝানো সম্ভব নয়।

একদিন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজবন্দীরা দূর আন্দামানের সেলুলার জেলে অনশন ধর্মঘটে আত্মদানের যে ঐতিহাসিক অধ্যায় তৈরি করেছিলেন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান পর্যায়ে পূর্ববঙ্গের কারাগারে গণআন্দোলনে নিবেদিত প্রাণকর্মী রাজবন্দীদের এই অনশন ধর্মঘট এবং রাজশাহী জেলে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণদান। নাচোলে সাঁওতালদের তেভাগা আন্দোলনের বন্দীনী ইলা মিত্রের উপর পাকিস্তানি পুলিশের নির্মম পাশবিক অত্যাচার এবং বহু সাঁওতাল কর্মীর হাজতে নির্যাতনে প্রাণত্যাগও এই সঙ্গে স্মরণীয়।

'একুশের' জন্মের এই হচ্ছে রক্তাক্ত প্রেক্ষাপট। এর আন্তরিক অনুভব ব্যতিরেকে 'একুশের' অস্তিত্ব এবং তার জন্মগত আবেগ ও শক্তিকে উপলব্ধি করা বর্তমানের প্রজন্মের পক্ষে সম্ভব হবে না। ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপট বাদে 'একুশকে' আকস্মিক এবং অলৌকিক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণে এই পর্যায়টির উপর বিস্তারিত গবেষণা ও তার বিবরণের প্রয়োজনের কথা আমি উল্লেখ করলাম। এ হচ্ছে একুশের সৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবদান: তথা 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি।'

২১-২-৯২

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ

সরদার ফজলুল করিম, কথা প্রকাশ, ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট, তৃতীয় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

ভাষা আন্দোলন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস

সমাজ ও রাষ্ট্রের নায়ক হচ্ছেন রাজাগণ, প্রেসিডেন্টগণ এবং রাজনৈতিক নেতাগণ। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাস তাই রাজা, প্রেসিডেন্ট এবং রাজনৈতিক নেতাগণের কাহিনী। তাদের শৌর্যবীর্য, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য খেয়াল ও খুশির ইতিহাস। আজও ইতিহাসে আমরা সামাজকে পাইনে। সমাজের ব্যাপকতম জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা এবং তাদের সংগ্রামের ইতিহাস আমরা পাইনে। অথচ আমাদের প্রেসিডেন্টগণ একটা দেশের প্রেসিডেন্ট। রাজনৈতিক নেতাগণ দেশের জনসমাজেরই নেতা। জনতা নিজেরা কোন নগর, কোন প্রাসাদ নয় যে ধ্বসে পড়লে তার কোন ধ্বংসাবশেষ থাকবে আর প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মাটি খুঁজে তাদের মহেনজোদারো আবিষ্কার করবেন। মহেনজোদারোতেও পাকা নর্দমা কিংবা ইমারত আবিষ্কৃত হয়েছে। হয়তো জনতার কিছু কঙ্কালও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সে-যুগের জনতা আবিষ্কৃত হয়নি। জনতার আকাঙ্ক্ষাকে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা যায়নি। জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা উদ্ধার করা যেত ইতিহাসকারের রচনা থেকে। কিন্তু সেদিনও যেমন আজও তেমনি ঐতিহাসিকগণ জনতার কথা লিপিবদ্ধ করেন না। তাঁরা রাজাদের কাহিনী রচনা করেন। শাহনামা তৈরি করেন, তাঁরা 'প্রভু নয় বন্ধুর' ইতিকথা লেখেন। এই রীতির কোন পরিবর্তন আজো হয়নি। অন্তত: আমাদের সমাজে বা দেশে হয়নি। শুধু সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই নয়। ইতিহাসকে অস্বীকার করে ইতিহাস রচনার রীতি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যেও অনুপস্থিত নয়। আর তাই 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে' পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস নেই। তার কোন বিবরণ, তার তাৎপর্যের কোন বিশ্লেষণ আমাদের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষদের রচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইতিহাস কিংবা কাহিনীতে আমরা খুঁজে পাইনে।

এ অনুযোগ আমি কোন ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে করেছিনে। আমি যথার্থই খোঁজ করেছি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকারগণের গ্রন্থে ভাষা-আন্দোলনের উল্লেখ ও বিবরণের। এই অনুসন্ধানের পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল না যে কোন সাহিত্যিক ভাষা-আন্দোলনের উল্লেখ না করে পূর্ব বাংলার আধুনিক পর্বের কোন সাহিত্যকর্ম আলোচনা করতে পারেন। অনুসন্ধানেই মাত্র এই বিস্ময়কর সত্য সম্পর্কে আমার প্রত্যয় ঘটল।

অথচ আমরা সাহিত্যিক, লেখক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ এবং আমাদের ইতিহাসকারগণ আর সববারের মত এবারেও ২১শে ফেব্রুয়ারির শহীদ দিবসে ভাষা-আন্দোলনের স্মরণে বক্তৃতা করব। এবং দরদভেজা কণ্ঠে শহীদ বরকত সালামদের আত্মদানের প্রশংসা করব। বরকত সালাম কবি ছিল না। তারা গবেষক, প্রবন্ধকার ঔপন্যাসিক বা ছোটগল্পকার ছিল না। এ জন্যে আমরা ভেবে পাইনে আমাদের ইতিহাসে কোথায় তাদের স্থান দেব।

আজো আমরা ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করি। কিন্তু মনে করা যাক অনেক বছর পরের কথা। হয়তো সেদিন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হবে না। ২১শে ফেব্রুয়ারির নতুনতর উত্তরপথিক '৬৯ কিংবা '৭১ তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে। সে প্রতিষ্ঠা একুশে ফেব্রুয়ারির বরকত সালামের কোন অমর্যাদা নয়। নতুনতর জীবন

ও ঘটনা একুশে ফেব্রুয়ারির শক্তি ও সার্থকতাই বহন করে চলবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিবরণের দিক থেকে তা হলে কোথায় আমরা বরকত সালাম এবং একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনকে খুঁজে পাবো? আসলে আমাদের বিবেকের জবাবদিহি এবং সত্য যাচাই-এর মুহূর্ত এসেছে। জনতার যুগ যুগব্যাপী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে রচিত হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অস্তিত্ব। তার বিবরণ ব্যতিরেকে যেমন আমাদের রাষ্ট্রের ও সামাজের সত্যিকার ইতিহাস রচিত হতে পারে না তেমনি ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলনের বিবরণ ও বিশ্লেষণ ব্যতীত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও রচিত হতে পারে না। এটা কোন আবেগের কথা নয়।

মানুষের মুখের কথাই ভাষা। মানুষই তাকে রাখে এবং মারে। মানুষই তাকে আঘাত করে, সংকীর্ণ করে, কিংবা তাকে সমৃদ্ধ করে, উদার করে এবং তার প্রবাহে গতি সঞ্চার করে। বাংলা ভাষা হাজার বছরের পুরানো। কেবল এই কথার জোরেই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার বর্তমান প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতো না। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কেবল বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও ইতিহাসকারগণই রচনা করেন না। তার মূল পটভূমি রচনা করে জনতা প্রতিকূল শক্তির আঘাতের বিরুদ্ধে নির্বাচিত জনতার সংগ্রামেই তার বিকাশের সড়ক তৈরি হয়। সেই সংগ্রামের কথা অস্বীকার করে ব্যক্তিগত সাহিত্যিকের সৃষ্টির শক্তি ও দুর্বলতার পরিচয়-দান যথার্থ হতে পারে না।

জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের ন্যায় ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ধারা-প্রতিধারায় নিরন্তর সংগ্রাম চললেও মাঝে মাঝে সংগ্রামের ক্রান্তিকাল উপস্থিত হয়। ১৯৫২ সালের পূর্ব বাংলার কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার যথার্থ বিচার হবে ভাষা-আন্দোলনের প্রভাবে কোন সাহিত্য বা সাহিত্যিক কতটুকু প্রভাবিত কিংবা প্রভাবিত নয় তারই মাপকাঠিতে।

সমাজ ব্যতীত সাহিত্যিক নয়। কবি নয়। গল্পকার-ঔপন্যাসিক কিংবা কবি তাদের সকলের রচনাই মানুষ নিয়ে। সে মানুষ একটা বিশেষ যুগ ও সমাজের মানুষ। বাস্তব কিংবা বিশিষ্ট যে ভাবেই হোক না কেন, সাধারণ বা নিত্যকালের যে রূপেই হোক না কেন সে সমাজের মানুষের পেশা আকাঙ্ক্ষা কবি ও সাহিত্যিকের কলমের মুখে ভাষা পাবে। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের তাৎপর্য আজ বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের রাষ্ট্রীয় যন্ত্র সেই আন্দোলনকে যেমন সেদিন গুলির মুখে স্তব্ধ করতে চেয়েছে তেমনি তাতে পরাস্ত হলেও তার তাৎপর্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা সে করে চলেছে। সেই কারণেই রাষ্ট্রীয় বিধান, শিক্ষায় কিংবা ইতিহাসে কোথাও আজ পর্যন্ত ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের স্বীকৃত ও আলোচিত হয়নি। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকারগণও এ পর্যন্ত তাঁদের রচিত সাহিত্যের ইতিহাসে ভাষা-আন্দোলনকে অস্বীকার করে এসেছেন। এ কথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

বিদ্রোহী বর্ণমালা: একুশের সংকলন ১৯৭০
ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত।

সঙ্গ-প্রসঙ্গের লেখা: সরদার ফজলুল করিম

সংগ্রহ ও সংকলন: শেখ রফিক, রোদেলা প্রকাশনী, ১১/১ ইসলাম টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বাংলা মাধ্যম প্রসঙ্গে

অদ্ভুত প্রশ্নের কোনো স্বাভাবিক জবাব হয় না।
পা দিয়ে কি হাঁটা যায়?
হাত দিয়ে কি লেখা যায়?
মায়ের ভাষায় কি মাকে ডাকা যায়?
বাংলাদেশকে কি বাংলাদেশ বলা যায়?
বাংলা ভাষায় কি সরকারি সাহেব তাঁর নাম দস্তখত করতে পারেন?
বাংলা ভাষায় কি জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা যায়?
সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা কি এই মুহূর্তে চালু করা যায়?
এর কোনো প্রশ্নেরই স্বাভাবিক জবাব হয় না। গত ২৪ বছর ধরে এমনি করে চলেছে পা উপরে তুলে মাথায় হাঁটার আত্মবিধ্বংসী প্রয়াস। আর তার পরিণামে যাদের ধ্বংস অনিবার্য তারা ধ্বংস হয়েছে। অযুত প্রাণের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাভাবিক সত্য, সূর্য-সত্য: পা দিয়ে হাঁটা যায়, পা দিয়েই হাঁটতে হয়; হাত দিয়ে লেখা যায়, হাত দিয়েই লিখতে হয়; মায়ের ভাষায় মাকে ডাকা যায়, মাকে মায়ের ভাষাতেই ডাকতে হয়; বাংলাদেশকে বাংলাদেশ বলা যায়, তাকে স্বাধীন বাংলাদেশই বলতে হয়; নিজের ভাষাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা যায়, তাই করতে হয়। পৃথিবীর সব দেশে তাই করে। তাই করেছে। এবং সর্বশেষ প্রশ্ন: এই মুহূর্তে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করা যায় এবং তাই করতে হবে।
তবু যদি এই শেষ প্রশ্নের জবাব স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছেন তাকে অস্বাভাবিক স্বভাবের কোনো শ্রেণি আটকে দেবার, বিলম্বিত করার চেষ্টা করে তাহলে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক জবাবে তার মীমাংসা হবে না। হবে অস্বাভাবিকভাবেই।
এই অস্বাভাবিক স্বভাবের কথা মনে আসত না যদি না এই সেদিনও এবং আজও সরকারি প্রায় চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ইংরেজির মাধ্যমে হতে না দেখতাম।
বাংলাদেশ স্বাধীন করতে কোটি মানুষের রক্ত ক্ষরিত হয়েছে। তার পরিণতিতেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। সেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বত্ব সর্বজনীন করার জন্য, তাকে শ্রমিক, কৃষক আর গরিব মধ্যবিত্তের স্বদেশে পরিণত করার জন্য এই মুহূর্তে আবশ্যক হচ্ছে শিশু-শ্রেণি থেকে শিক্ষার শীর্ষ-শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভাষায় জীবনের সব জ্ঞান সব স্তরের মানুষের কাছে হাজির করার। কেবল এই পথেই খুলে যাবে মানুষের সার্বিক বিকাশের মহাসড়ক। সম্ভব হবে সত্যিকারভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা।
সেক্রেটারিয়েট থেকে পত্র আসে ইংরেজিতে। সাধারণ কথা। পত্র প্রেরক লিখেছেন পত্র প্রাপককে: এ বিষয়ে আপনার মতামত জানাবেন। কিন্তু এ কথা কটি বাংলায় লেখা সরকারি সাহেবের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ হিসেবে তিনি হয়তো বলবেন: তাঁর কাছে বাংলা টাইপরাইটার নেই। কিন্তু অযুত শহীদের প্রতি মমতা কিংবা বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে সরকারি সাহেবের এরূপ ইচ্ছাও হয় না যে চিঠির নিচে তিনি নিজের হাতে বাংলাতে লিখে

দেন: টাইপের অসুবিধার জন্য চিঠিখানা বাংলায় লেখা সম্ভব হলো না। চিঠির শেষে সুন্দরভাবে ইংরেজিতে তিনি নিজের নামটি দস্তখত করেছেন।
বাংলাতে দস্তখত করলেও বোঝা যেত, বাংলার প্রতি তাঁর একটু মমতা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিজে বাংলাতে সহি করতে পেরেছেন; তাঁর দফতর থেকে টাইপের সুবিধা থাকলেও হাতের লেখায় তৈরি হয়ে তাঁর চিঠি বাংলাতে পৌঁছতে পেরেছে শিক্ষাবিদ সাহিত্যিকদের কাছে।
কাজেই প্রশ্নটা উপায়ের চেয়ে বেশি হচ্ছে ইচ্ছার, ঐকান্তিকতার।
আজকের কথা নয়। ১৯৪২-৪৩ সালের কথা বলছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। দর্শনে অনার্স পড়ি। সাথে আছে রাষ্ট্রনীতি আর ইংরেজি সাহিত্য। রাষ্ট্রনীতি খুব সাহিত্যমূলক বিষয় নয়। রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানে অনেক কঠিন ইংরেজি শব্দ আছে। শুধু স্টেট, পার্লামেন্ট, প্রেসিডেন্ট, প্রাইম-মিনিস্টার নয়। আছে কনসটিট্যুশন, আলট্রাভায়ারস, ডি জুরি, ভি ফ্যাক্টো, অ্যারিস্টোক্রাসি, ব্যুরোক্রাসি–এমনিতর অনেক শব্দ। সব অধ্যাপকই ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন। গড়গড় করে ইংরেজি বইয়ের ভাষা বলেন: লাস্কি, ডাইসি, গেটেল গিলক্রাইস্ট–ইংরেজি পণ্ডিতদের সব পুস্তকই যেন মুখস্থ। এটাই সেদিন রীতি ছিল। আর সেদিন ছিল বলে আজও আমরা তাকে অনড় বলে মনে করি। কিন্তু প্রায় ত্রিশ বছর আগে সেদিনও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক অজিতকুমার সেন ক্লাশে বক্তৃতা করতেন বাংলায়। আমরা সংক্ষেপে বলতাম 'এ কে সেন'। আমাদের ট্যুটুরিয়াল খাতা সংশোধন করতেন বাংলায়। সুন্দর হস্তাক্ষরে খাতার পাশে অভিমত লিখতেন: 'এ বিষয়ে লাস্কির গ্রামার অব পলিটিক্সের প্রথম অধ্যায়টি পোড়ো। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলনীতি ব্যাখ্যা করতেন বাংলায়, দৃষ্টান্ত দিতেন আমাদেরই পরিপার্শ্ব থেকে। ক্লাশে না আসতে পারলে ডিপার্টমেন্টের হেডকে চিঠি লিখতেন বাংলায়। সেদিনকার ইংরেজিতে পড়াবার এবং পরীক্ষা দেবার রীতির মধ্যে তাঁর এ ব্যতিক্রমে কোনো জবরদস্তি ছিল না; একে অস্বাভাবিক মনে হতো না। অপর অধ্যাপকদের মুখস্থ করা অলঙ্কারবহুল ইংরেজি বক্তৃতার চেয়ে অধ্যাপক এ কে সেনের ক্লাশে আমাদের পাঠ্য বিষয় যে অধিক প্রাঞ্জলভাবে বুঝতাম, ত্রিশ বছরের দূরত্ব থেকেও স্মৃতিতে তা আজও উজ্জ্বল হয়ে ভাসছে।
ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, দর্শন, আইন–অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের কোনো শাখাই আজ আর বাংলা ভাষার অধিকারের বাইরে নয়। পশ্চিম বাংলার উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা না হলেও শিক্ষাবিদ এবং লেখকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাজবিজ্ঞানের সব শাখায় বহু বই রচিত হয়েছে, এমন আভাস আমরা পূর্বেও পেয়েছি। আজ তার তথ্যাদি আমরা পূর্ণতরভাবে পেতে পারি।
বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে অসুবিধার প্রশ্ন আপাতদৃষ্টিতে অধিকতর কঠিন বলে বোধ হয়। কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছাসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ মাত্রই স্বীকার করবেন, বস্তুত বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান বাংলার মাধ্যমে শেখানো সমাজবিজ্ঞানের চেয়েও সহজ। কারণ প্রাজ্ঞজনরা বলেন, বিজ্ঞান ও কারিগরির অধিকাংশ মৌলিক শব্দ আজ আর কোনো বিশেষ জাতীয় ভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই। তার প্রায় শব্দই একই উচ্চারণে আন্তর্জাতিকতা লাভ করেছে। তাকে আমরা বাংলা ভাষায় প্রতিলিখনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারি। যেসব শব্দের পরিভাষা করা সম্ভব হবে, তার পরিভাষা আমরা

করে নেব। বিভিন্ন শাখায় পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে পরিভাষা বেশ পরিমাণ তৈরিও হয়েছে। যার পরিভাষা হয়নি তার ইংরেজি শব্দকে বাংলায় লিখে এবং যাদের পরিভাষা হয়েছে তাকে ক্রমান্বয়ে পরিচিত এবং অর্থবহ করে তোলার জন্য মূল শব্দকে পরিভাষার সঙ্গে রেখেও আমরা ব্যবহার করতে পারি। ব্যাপকতম ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে পাঠ্য বিষয়, যাতে ভালো করে অনুধাবন করতে পারে তার জন্য প্রাঞ্জলভাবে অধ্যাপকদের তরফ থেকে ব্যাখ্যাদান। আর এ ব্যাখ্যা অধ্যাপক বাংলায় দিতে পারুন আর না পারুন, ছাত্র-ছাত্রীরা যে মাতৃভাষা বাংলাতেই তা অধিকতর কার্যকর এবং ফলপ্রসূভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এ সত্যকে কুযুক্তির আড়ালে আর যেন আমরা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা না করি।

সাধারণ মানুষের সাধারণ চলতি কথাই জীবনের বড় কথা। বাধ্য হলে সবাই সব কিছু করতে পারে। আজকে প্রয়োজন বাধ্য করার: অনিচ্ছুক মনকে, অনিচ্ছুক এবং অহংবোধ আচ্ছন্ন তথাকথিত শিক্ষক আর অধ্যাপক অফিসারকে দেশের সর্বজনীন ও বৃহত্তর কল্যাণের পথ অবলম্বনে বাধ্য করা।

রক্তের প্লাবনে যে দেশের জন্ম, রক্তসমুদ্রের জোয়ারে পৃথিবীর বর্বরতম পশুশক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যে সরকারের প্রতিষ্ঠা, জনকল্যাণের বোধে উদ্বুদ্ধ তার যে কোনো আহ্বান অলঙ্ঘনীয়। জনতাই তাকে অলঙ্ঘনীয় করে তুলবে।

সরকার হুকুম করতে পারে: বাংলা টাইপ থাকুক আর না থাকুক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিটি কাজে বাংলা ব্যবহার করতেই হবে। প্রতি মুহূর্তে করতে হবে। বাংলাকে ব্যবহার করার আন্তরিক প্রয়াসের সাক্ষ্য প্রত্যেক নাগরিককে দেখাতে হবে। অফিস-আদালতে যে কর্মচারী, যে অফিসারের বাংলা লেখার চেষ্টা আন্তরিক হবে তার দৃষ্টান্ত আদর্শ হিসেবে অপর পাঁচজনের কাছে তুলে ধরতে হবে। যার এক্ষেত্রে অনিচ্ছা এবং ত্রুটি দেখা যাবে তার দৃষ্টান্তও ধিক্কারসহ অপর সকলকে জ্ঞাত করাতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বস্তরে প্রবেশিকা, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শ্রেণির সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা শিক্ষকগণ বাংলাতে পেশ করতে বাধ্য থাকবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত চেষ্টা ও যত্ন তাদের করতে হবে এবং এ ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি, আন্তরিকতা, সাফল্য-অসাফল্যের পর্যালোচনা প্রত্যেক স্তরের অধিনায়কদের করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয় সকল পাঠ্যপুস্তক এক বছরের মধ্যে অনুবাদ, রচনা ও প্রকাশের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে বাংলা ভাষায় রচনার ক্ষেত্রে মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করেছেন এরূপ লেখকদের তালিকাবদ্ধ করে তাঁদের অবিলম্বে পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে নিযুক্ত করতে হবে। এ জন্য যদি সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক এবং বিশেষজ্ঞগণকে তাদের বর্তমান দায়িত্ব থেকে এক বছরের জন্য অব্যাহতি দিতে হয়, তাহলে সরকার সেরূপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবেন।

চীনের নেতৃবর্গের নাম উল্লেখ করতে আজ প্রতিটি বাঙ্গালির মনে ক্ষোভের উদ্রেক হয়। সংকীর্ণ শক্তির রাজনীতির যূপকাষ্ঠে কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামকে বলি দেওয়ার চীনা নীতিতে আমরা ক্ষুব্ধ এবং মহাচীনের মহান ঐতিহ্য আজ আমাদের কাছে কালিমায় আচ্ছন্ন। তবু মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারে চৈনিক দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ করলে কোনো ক্ষতি হবে না। শুনেছি, চীনেও '৪৯ সালের পূর্বে বিদেশী ভাষারই প্রভাব ছিল অধিক। একদিন চীন সরকার সংকল্পবদ্ধ হয়ে এক বছরের জন্য সব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে তাকে শিক্ষক, অধ্যাপক,

সাহিত্যিকদের নিযুক্ত করেছিল চীনের নিজস্ব প্রধান ভাষায় সব প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের অনুবাদ রচনা ও প্রকাশনার কাজে। একটি বছরেই হাজার হাজার পাঠ্যপুস্তক তাই চীনা ভাষায় তৈরি হয়েছিল। তার ভালোমন্দ, মান, অ-মানের কথা স্বতন্ত্র। জাতীয় ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের এই আপোসহীন প্রচেষ্টাই গুরুত্বপূর্ণ। আজ আর চীনে বিদেশী ভাষায় কোনো কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না। জাতীয় প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ আর কূটনীতিজ্ঞ তৈরির প্রয়োজনে বিদেশী সব প্রধান ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও চীনে আছে। কিন্তু তাই বলে সর্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষা আজ আর চীনের সমাজজীবনে কোনো প্রতিবন্ধক নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মাতেও শিক্ষার সকল স্তরেই জাতীয় বর্মি ভাষাই ব্যবহার করা হয় বলে আমরা শুনেছি। বার্মার অনুবাদ সংস্থা তার কাজের ব্যাপকতা ও প্রয়োগের বিস্তারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ বহু ভাষার দেশ নয়। তাই কোন কোন ভাষা আমরা যোগাযোগের মাধ্যম বা শিক্ষার বাহন করব– এরূপ প্রশ্নও বাংলাদেশের কোনো মহলকে দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারে না। একক ভাষার সৌভাগ্য বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা ও সৃষ্টির এক মহাসুযোগ সৃষ্টি করেছে।

আজ প্রয়োজন হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র এবং সামাজিক শক্তির একাগ্রচিত্ত হয়ে এই মহাসুযোগেরই পরিপূর্ণ ব্যবহার।

১৯৭২

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ

সরদার ফজলুল করিম, কথা প্রকাশ, ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট, তৃতীয় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

একুশে ফেব্রুয়ারির সেই দিনটি

সৈয়দ মোয়াজ্জাম সাহেবের কথা বলতে যেয়েই '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা উঠে যায়। '৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার অন্যতম রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনই পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার সংগ্রামেরও সূচনা ঘটায়। ঢাকা শহরের, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করে। শিক্ষকদের মধ্যেও ভাষা আন্দোলন সহানুভূতি ও সমর্থনের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যেতে চাইলাম না। কেবল রাজ্জাক সাহেবের যা স্মৃতি আছে এ সম্পর্কে, তা জানতেই আমাদের আগ্রহ ছিলো। ভাইস চ্যান্সেলর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেনের কথা বলতে যেয়েই অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন: ১৯৫২-তে ভাষা আন্দোলনের সময়ে, আর কিছুর জন্য নয়, সাহসের অভাবে, হি অকেজন্ড মাচ ট্রাবল। আমার মনে আছে যেদিন গুলিটা হলো, ইউনিভার্সিটির ঐ পুরানা দালানে (বর্তমান মেডিকেল কলেজ হসপিটাল বিল্ডিং-এর দক্ষিণ দিক) ছাত্র-শিক্ষক সব মিলিং অ্যারাউন্ড। একবার হঠাৎ এই ভিড়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। ছাত্ররা প্রসেশন করে বাইরে যাবার চেষ্টা করছে। রাস্তার পাশের গেট বন্ধ করে দিয়ে তাদের কোন রকম ঠেকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি বললাম– সৈয়দ সাহেবকে, ইট ক্যান ইজিলি বি হ্যান্ডলড।

: কেমন?

আমি বললাম: এইগুলো ছেলেরা করছে ক্যান? দে হ্যাভ নো কনফিডেন্স ইন ইউ। আপনি তাদের সঙ্গে আছেন, এই বিশ্বাস তাদের নাই। এই বিশ্বাস যদি তাদের হয় তাহলে নিশ্চয়ই তারা এক্সট্রিমে যাবে না। সৈয়দ সাহেব বললেন: আমার কি করতে হবে? আমি বললাম, আপনি ছেলেদের বলুন যে, ইট ইজ ইন অ্যাডভাইজেবল টু গো আউট ইন প্রসেশন। তবে তোমরা যদি প্রসেশন নিয়ে বার হও, তবে সে প্রসেশন আমিই লিড করবো। আপনি ভি. সি. হিসেবে যদি বাইরে যান তবে পুলিশ নিশ্চয়ই গুলি করবে না। করতে পারে না এবং ছেলেদের ইমোশন ক্যান বি কামড ডাউন। তাদের শান্ত করা যায়। এই কথা আমি সৈয়দ সাহেবকে বলবার লাগছি, এমন সময়ে এক কলিগ, সিনিয়র শিক্ষক, তিনি এখনো ইউনিভার্সিটিতে আছেন, তিনি এসে জিগ্যেস করলেন, রাজ্জাক কি বলছে?

সৈয়দ সাহেব রিপোর্ট করলেন: রাজ্জাক সাহেব তো এই বলছে। আমি বললাম: হ্যাঁ, আমি একথা এখনো বলি। একথা শুনে আমার সেই কলিগ উড়িয়ে দিলেন: না, এসব কি কথা? চলুন আমার ওদিকে যাই।

সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদের কাছে আবার বললেন: আই রিমেইন স্টিল কনভিন্সড যে, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন যদি সেদিন একথা বলতেন, তাহলে সেদিনকার ট্র্যাজেডি এড়ানো যেত!

অধ্যাপক রাজ্জাকের কথা শুনে আমি বললাম: তাঁর কাছ থেকে এমন ডিসিশন আশা করা কি একটু বেশি আশা করা নয়?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন: না, ব্যাপার হচ্ছে: ছাত্রদের তাঁর বিরুদ্ধে গ্রিভ্যান্স ছিলো যে, তিনি ছাত্রদের এক কথা বলেন, বাইরে আর এক কথা বলেন। পুলিশের এস. পি.

তখন ইদ্রিস। আমার মনে আছে, গেটের সামনে ছাত্ররা পুলিশকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছে। আমি গেটের সামনে গেছি। ইদ্রিসকে দেখলাম গেটের বাইরে। ইদ্রিস ওয়াজ ওয়ান অব মাই আরলি স্টুডেন্টস। আমি তাকে চিনি। আমি একবার গেটের বাইরে গেলাম। দেখলাম, ইদ্রিস খুব এক্সাইটেড হয়ে ছাত্রদের বলছে: আপনারা যদি এরকম করেন, আমি গুলি করার অর্ডার দেব। এই কথা শুনে আই ওয়াজ এক্সটিমলি শকড। আমি ইদ্রিসকে ডেকে বললাম: আপনি কি কইলেন? ইদ্রিস আমাকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল। আমতা-আমতা করে বললো: কি বলেছি স্যার? আমি বললাম, আমি শুনেছি আপনি বলেছেন, গুলির অর্ডার দিবেন! তখন সে নরম হয়ে বললো: আই ডিড নট মিন ইট স্যার। আমি বললাম, আপনার ফৌজ আছে সামনে। আপনি এস. পি. কিংবা অ্যাডিশনাল এস. পি। আপনি যে এরকম বলতে পারেন, আমি ভাবতে পারি নাই। ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, আপনার এই বলার এফেক্ট কি হতে পারে?

: না স্যার, আমি এটা মিন করি নাই।

অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদের বললেন, একথা বলছি আমি আজ এজন্য যে, আমি মনে করি, ইট ওয়াজ পসিবল টু অ্যাভয়েড দি ট্র্যাজেডি, অন্তত ঐদিন। পুলিশ, প্রসেশন বার করতে দিতে চায় না। কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর মোয়াজ্জম হোসেন সাহেব যদি প্রসেশনের সামনে থাকতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে পুলিশ তার তাৎপর্যটা বুঝতো এবং যা ঘটেছে তা ঘটতো না। বাঙ্গালি যে অফিসারই থাকতো, তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভি. সি'র গায়ে হাত তুলতে পারতো না। আমার সঙ্গেও একটি বাঙ্গালি অফিসার কথা বলতে একটু সমীহ না করে পারে না।

আমি জিগ্যেস করলাম, স্যার ওদিনই কি ফায়ারিং হয়েছিলো?

: হ্যাঁ, ওদিনই শেষে ফায়ারিং হলো। সেদিন ফায়ারিং-এর সময়ে আমি ইউনিভার্সিটির কম্পাউন্ডে ছিলাম না। সকাল থেকেই গণ্ডগোল চলছে। তিনটা গেটেই জমায়েত। আমরা দেওয়ান বাজারের দিকের গেটে। বেলা সাড়ে বারটার সময়ে দেয়ার ওয়াজ এ লাল এবং ভেরি স্টুপিডলি আই কনক্লুডেড দ্যাট অ্যাট লিস্ট ফর দ্যাট ডে, দি থিং ইজ ওভার। সাড়ে সাতটার দিক থেকেই আমি এদিকে ঘুরছি। আমি তখন থাকি তাঁতখানা। সাড়ে সাতটা থেকেই এ অবস্থা। আই ফেল্ট সো টায়ার্ড। আমি দুপুরের দিকে বাসায় চলে যাই। গুলিটা হয়েছে আড়াইটার দিকে। আমি তাঁতখানা থেকে শুনলাম যে গুলি হয়েছে।

সঙ্গী ফজলে রাব্বি কাহিনী শুনতে শুনতে আমার কথা উল্লেখ করে বললেন: সরদার সাহেব তখন কোথায়?

অধ্যাপক রাজ্জাকের খেয়াল আছে। তিনি বললেন: সরদার তো তখন জেলে।

আমি বললাম: হ্যাঁ, স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি তখন জেলে। আমি অ্যারেসটেড হয়েছিলাম '৪৯-এর ডিসেম্বরে। তখন থেকেই জেলে।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন: এর কয়েকদিন পরেই বোধহয় মুজাফফরকে ধরে নিয়ে গেল, মুনীরকে ধরে নিয়ে গেল।

আমি বললাম, অজিত গুহ, পৃথ্বিশ চক্রবর্তী এঁরাও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কিন্তু স্যার, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষকরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, এদের কি ভাষা আন্দোলনে কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিলো?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন: এঁদের কারোরই ভাষা আন্দোলনের ব্যাপারে কোন লিডিং পার্ট ছিলো, এমন বলা চলে না। '৫২-এর ব্যাপারে শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কেউ যে তেমন প্রমিনেন্ট পার্ট নিয়েছেন, এমন মনে পড়ে না। একুশে ফেব্রুয়ারি মোর অর লেস সবাই অ্যাফেক্ট করেছিলো। কিন্তু কোন শিক্ষক যে এর পেছনকার অরগানাইজার ছিলো, এমন নয়। কেউ না। মুনীরও নয়। মুজাফফরও নয়। পরে শুনি মুজাফফরের অ্যারেস্টের কারণ।

আমরা জিগ্যেস করলাম: কি কারণ ছিলো?

: মুজাফফর তখন প্রক্টর ছিলো এবং দেওয়ান বাজার সাইডে ইউনিভার্সিটি গেটে তার বাসা ছিলো। বাসার নিচের ঘরে, প্রক্টরের অফিসে একটা টেলিফোন ছিলো। এই টেলিফোনটা যে কেউ ব্যবহার করতো। এবং এই টেলিফোন থেকে আওয়ামী লীগ অফিসে ফোন যেত। দিস মোস্ট প্রবাবলি ওয়াজ দি বেসিস ফর হিজ ইনকারসেরেশন। এরা যে এগিয়ে যেয়ে সট মার্টায়েরডম, তা নয়। নাইদার মুজাফফর, নর মুনীর। ইনফ্যাক্ট মুনীর ডিলিবারেটলি ডিউরিং দিস টাইম ট্রাইড টু আন্ডারপ্লে হিজ অ্যাসোসিয়েশন উইথ পলিটিক্যাল মুভমেন্টস। তার ভাব ছিলো, আমি এসবের মধ্যে থাকতে চাই না। আই থিংক হি মেন্ট ইট। ভাষা নিয়ে যে সমস্ত গোলমাল হয় তাতে কোন একজন শিক্ষকের নাম নিয়ে বলতে পারবো না যে, হি ওয়াজ হার্ট অ্যান্ড সোল ডেডিকেটেড টু ইট। আই থিঙ্ক '৫২ জাস্ট ডেভেলপড। এ নিজের গতিতে ঘটেছে। এ খুব যে পূর্ব পরিকল্পিত ছিলো, এমনও মনে হয় না। কয়েকদিন আগ থেকেই ট্রাবল ডেভেলপ করছিলো।...

এখানে অধ্যাপক রাজ্জাককে আমরা একটা প্রশ্ন করলাম: স্যার, ফায়ারিংয়ের পরে ভি. সি. কি শিক্ষকদের মিট করেছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন: হ্যাঁ রিভালশন অব ফিলিং ওয়াজ কমপ্লিট, দেয়ার ওয়াজ নো আসপেক্ট অব লাইফ দ্যাট ডিড নট ফিল ফর দি স্টুডেন্টস, অ্যান্ড হুইচ ওয়াজ নট অ্যান্টি গভর্নমেন্ট। সবচেয়ে রিমার্কেবল ব্যাপার হলো, '৫২-এর ফেব্রুয়ারির ঘটনাতে ঢাকা শহরের স্থানীয় সাধারণ মানুষের ফিলিং অব সিমপ্যাথি ফর দি স্টুডেন্টস। সমস্ত শহরটাই ছেলেদের পক্ষে ছিলো। ইট ওয়াজ অল স্পনটেনিয়াস। সব স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু ছাত্রদের জন্য ঢাকার সাধারণ মানুষের এই যে সহানুভূতি, এটা পরবর্তীকালে নষ্ট হয়েছে বলেই আমার ধারণা। এখন আর তেমন নাই। দিস ওয়াজ প্রোবাবলি দি লাস্ট মেনিফেস্টেশন অব দি ফিলিং বিফোর ঢাকা লস্ট ইটস ওল্ড ক্যারেক্টার। ঢাকার সেই পুরনো চরিত্রও আজ আর নাই। শিক্ষকরা আন্দোলনকারী ছিলো না। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কাউকে লক্ষ্য করি নাই যার ভাষা আন্দোলনের ব্যাপারে কোন রিজার্ভেশন ছিলো।

আমরা আর একটি প্রশ্ন করলাম: শিক্ষকরা মিলিতভাবে কি এই ফায়ারিং-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন: হ্যাঁ, দেয়ার ওয়াজ এ মিটিং অব দি টিচার্স। সেই মিটিংয়ে সকলেই ছিলো।

: ভি. সি. ছিলেন?

: না, সে ছিলো না। মুনীর, মুজাফফর– এরা তখনো কেউ অ্যারেস্টেড হয় নাই।

অধ্যাপক রাজ্জাক আর একটু বিস্তারিতভাবে বলতে যেয়ে বললেন: ঘটনাটা আমার মনে আছে এই জন্য যে, ড. শহীদুল্লাহ সাহেব তখন টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর

প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমি ভাবছিলাম, কোন রিজোল্যুশন শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে নেওয়া হলে তিনি কি খুশি মনে তা মেনে নিতে পারবেন, হোয়েদার হি উড ফিল হ্যাপি। তাই আমি আর মযহার সাহেব (সরওয়ার ছিলো কিনা মনে নাই), –আমরা ড. শহীদুল্লাহর কাছে যেয়ে বলি, আমরা শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে মার্ডার অব দি স্টুডেন্টসকে কনডেমন করে, 'ছাত্র হত্যাকে' নিন্দা করে প্রস্তাব নেব। আপনাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই রিজোল্যুশন মুভ করতে হবে। দেখলাম, ড. শহীদুল্লাহ মার্ডার কথাটা মানতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন: 'মার্ডার' কথাটা কওয়ার দরকার কি? আমরা বললাম, না। 'মার্ডার' কথাটা থাকতে হবে। তিনি আবার যখন বললেন: 'মার্ডার' কথাটা ঠিক হবে না, তখন আমরা বললাম, স্যার, তাহলে মিটিংয়ে উপস্থিত না থাকলেন। তাতে ড. শহীদুল্লাহ বললেন: আচ্ছা তাই হবে। আমি মিটিংয়ে থাকবো না। পরের দিন আমরা মিটিংয়ে উপস্থিত হলাম।

আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের পূর্ব দিকে দোতলায় পুরনো দিনের শিক্ষকদের কমনরুমের উল্লেখ করে অধ্যাপক রাজ্জাককে জিগ্যেস করলাম: মিটিংটা কি পুরনো দালানের সেই পূর্ব পাশের কামরাতে হয়েছিলো।

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন: না, তার বিপরীত দিকে একটা বড় ঘর ছিলো। এটাতেই পরবর্তীকালে মনজুর কাদেরকে ছেলেরা নাজেহাল করেছিলো। মিটিং এ ঘরে হয়েছিলো।

এই প্রতিবাদ সভার কথা বলতে যেয়ে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন: সকলে ঠিক করলো, মিটিং প্রিসাইড করবো আমি। আমরা মিটিং শুরু করবো। নিয়মমাফিক কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করলো: ঠিক এই সময়ে ড. জুবেরী এসে উপস্থিত হলেন। ড. জুবেরীর সঙ্গে আগে আমাদের কোন কথা হয় নাই। কিন্তু তিনি এসে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে যেয়েই বসলেন। আমরা প্রথমে একটু থতমত খেলাম। তারপর আমি যেয়ে তাঁকে রিজোলিউশনটা দেখালাম। আমি বললাম: এই রিজোলিউশনটা প্লেস করা হবে। এবং আপনি যখন প্রিসাইড করছেন তখন চেয়ার থেকে এই রিজোলিউশনটা আপনি মুভ করবেন। তিনি 'মার্ডার' কথাটা দেখে আপত্তি করলেন। আমি বললাম, না, এই রিজোলিউশনটাই নেওয়া হবে। এই সময়ে ইকনমিক্সের প্রফেসর আয়ারও বললেন, মার্ডার কথাটার দরকার কি? 'ডেথ' শব্দটা ব্যবহার করলেই তো হয়। দোজ টু আর সিনোনিমাস। একথা শুনে আমি বললাম, সিন্স হোয়েন মার্ডার অ্যান্ড ডেথ হ্যাভ বিকাম সিনোনিমাস? আয়ার অমনি চুপ করে গেলেন। আর কিছু বললেন না। তখন জুবেরী সাহেবও সমাবেশের অবস্থা দেখে আর কিছু বললেন না।

আমি প্রশ্ন করলাম: কিন্তু তিনি, মানে জুবেরী সাহেব কি মিটিং ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন: না। তিনি, রিজোলিউশনটা মুভ করলেন। এই মিটিংয়ে মুনীর ও মুজাফফর বক্তৃতা দিল। আমি বক্তৃতা দিলাম না। আমি ড. জুবেরীর পাশে দাঁড়িয়ে রিজোলিউশনটার দিকে খেয়াল রাখছিলাম। বক্তৃতার ব্যাপারে মুজাফফর স্পোক স্ট্রংলি, অ্যাজ হি ইউজুয়ালি ডাজ এবং মুনীর স্পোক, ইফ নট স্ট্রংলি, অ্যাট লিস্ট ভেরি এফেক্টিভলি এবং বোধহয় সরওয়ার মুর্শেদও বক্তৃতা করেন।

আমি প্রশ্ন করলাম: তখন ড. জুবেরী ইউনিভার্সিটির কি ছিলেন?

: তিনি ইংরেজির চেয়ারম্যান এবং ডিন অব আর্টস ছিলেন।

: অ্যাটেন্ডেন্স কি রকম ছিলো?

: অ্যাটেন্ডেন্স বেশ বড় ছিলো। সমস্ত ঘরটা প্যাকড-আপ ছিলো। রিজোলিউশনটা বোধহয় কাগজে বেরিয়েছিলো। তখনকার কাগজে থাকতে পারে।

অধ্যাপক রাজ্জাক, মুনীর চৌধুরী এবং মুজাফফর চৌধুরীর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে আর একটু বলতে যেয়ে বললেন: টিচার্সদের অ্যারেস্টের ব্যাপারে আমার মনে হয়, মুনীরের আগেই একটা রাজনীতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছিলো। মুজাফফরের টেলিফোনের ব্যাপারটা ছিলো। এসব মিলিয়েই এদের অ্যারেস্ট ঘটেছে বলে আমার মনে হয়। ইউনির্ভাসিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিক থেকে সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন ওয়াজ প্রাইমারিলি কনসার্নড দ্যাট দি ইউনির্ভাসিটি ডাজ নট সাফার। তবে আবার ছাত্র মেরেছে, এটাও আনপ্রেসিডেন্টেড। ইট মুভড হিম অ্যাজ মাচ ডিপলি অ্যাজ ইট মুভড আজ। এরা অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়ার পরে ইউনিভার্সিটির মেইন কনসার্ন ওয়াজ নট সো মাচ দি ল্যাংগুয়েজ মুভমেন্ট, অ্যাজ দি অ্যারেস্ট অব দি টিচার্স।

আমি জিগ্যেস করলাম: মুনীর, মুজাফফর সাহেব, এরা কি তখন ইউনির্ভাসিটির বাসায় ছিলো?

: মুনীর নীলক্ষেতের একটা বাসায় আর কারোর সঙ্গে শেয়ার করে ছিলো। আর মুজাফফর ইউনিভার্সিটির ঐ দক্ষিণ দিকের গেট হাউসে ছিলো।

অধ্যাপক রাজ্জাক বলতে লাগলেন: ...এদের সকলকেই আমি চিনতাম। মুনীরের স্ত্রীর তখন প্রথম বাচ্চাটা হয়তো হয়েছে। অ্যারেস্টের পরে এদের ফ্যামিলি নিয়ে প্র্যাক্টিক্যালি কেউ মাথা ঘামায় নাই। এ ব্যাপারে আমি মনে করি সারওয়ার মুর্শেদ ওয়াজ এক্সেপশন। এটা প্রশংসার ব্যাপার। হি ওয়াজ প্রোবাবলি অ্যালোন এমোং দি টিচার্স হু কন্টিনিউয়াসলি এদের দু'জনার বাসার খবরাখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমিও চেষ্টা করেছি, এদের সম্পর্কে কিছু করা যায় কি না। এই সময়ে ২৭-২৮ তারিখের একটা কথা আমার পার্টিকুলারলি মনে আছে। সেদিন ভি. সি-র বাড়িতে অনেকে হাজির হয়েছে। শিক্ষকরা লেনের এদিক-ওদিক পায়চারি করছে। আমি ভি. সি-কে বললাম এদের (শিক্ষকদের) অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। আমরা তো কিছু করতেও পারছি না। তবে একটা কাজ আপনি করতে পারেন। ভি. সি. বললেন, কি? আমি বললাম, এদের অ্যারেস্ট সম্পর্কে গভর্নমেন্ট তো আপনাকে কিছু জানায় নাই। এদিকে ২৮ তারিখে এদের মায়না দেওয়ার প্রশ্ন আছে। আপনি তো এই অ্যারেস্টের ব্যাপারটা নোটিসে না নিলেই পারেন। আপনাকে কিছু না জানানো পর্যন্ত এদের মায়না আপনি দিয়ে যান, অ্যাট লিস্ট অ্যাজ লং অ্যাজ গভর্নমেন্ট ডাজ নট রাইট টু ইউ, দ্যাট দিজ টিচার্স হ্যাভ ডান দিস অব দ্যাট। কথাটা আমি ভি. সি-কে খুব প্যাশনেটলি বলছিলাম। ঠিক এমন সময়ে, জাস্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট, হাদি সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। আমার এখনো মনে আছে, তিনি খালি পায়ে এসেছিলেন। পায়ে কিছু চোট পেয়ে হয়তো ব্যান্ডেজ করেছিলেন।

: তিনি তো তখন রেজিস্ট্রার?

: হ্যাঁ, তখন তিনি রেজিস্ট্রার। আমার কথার মধ্যে তিনি ইন্টারভেন করে ভি. সি-কে বললেন, কি বলছে, আবদুর রাজ্জাক? আমার প্রস্তাব শুনে তিনি ভি. সি-কে বললেন, চিন্তা না কইরা এসব করবেন না। এতে রিস্ক আছে। সৈয়দ মোয়াজ্জাম হোসেন সোজা মানুষ। এই রিস্কের কথা শোনার পরে আর তাকে এদিকে আমি টানতে পারলাম না। হাদি সাহেবের ওপর আমার সেদিন ভয়ানক রাগ হয়েছিলো। হাদি সাহেব আমার সিনিয়র।

আমি তাঁকে মান্য করি। কিন্তু আই লস্ট মাই টেম্পার। হাদি সাহেব আমার রাগ দেখে বলতে লাগলেন, দেখেন আবদুর রাজ্জাক, একথা আমি ভালো মনে করেই কইছি। আমি তার কোনো কথা না শুনে বললাম, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি নই।...

তারপর অধ্যাপক রাজ্জাক আমাদের বললেন: সেদিন ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে এটা করতে পারলে আমার মনে হয়, একজন শিক্ষকের এধরনের পার্টিসিপেশন ইন পাবলিক লাইফ উড হ্যাভ অ্যাপিয়ার্ড লেস ফিয়ারসাম দ্যান ইট টার্নড আউট টু বি। এরকম অ্যারেস্ট ইত্যাদি শিক্ষকদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করতো না।

অধ্যাপক রাজ্জাক বলতে লাগলেন: শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্টিকুলারলি হিরোয়িক আমরা কেউই ছিলাম না। সবাই সাবধানে থাকার চেষ্টা করতাম। যারা অ্যারেস্টড হলো তাদের সম্পর্কে তেমন কেউ চিন্তা করতো না। সবাই এদের চিনতাম। আর ছাত্রদের সঙ্গে টিচার্সদের সম্পর্ক এমন নয় যে, তারা অ্যারেস্টেড টিচার্সদের সম্পর্কে খোঁজখবর করবে।

... আমি এরপরে ড. ওসমান গনির সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন ইউনিভার্সিটির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পাওয়ারফুল মেম্বার এবং এস. এম. হলের প্রভোস্ট। আমি বললাম, অ্যারেস্টেড টিচার্সদের বিরুদ্ধে আপনারা কোনো ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিবেন না। এদের মায়না দেওয়া বন্ধ করবেন না। তিনি বললেন, ই. সি'তে এমন প্রস্তাব দিলে গ্রহণ করানো যাবে না। আমি বললাম, তাহলে অন্তত এদের ব্যাপারে ই. সি'র আলোচনা ডেফার করেন। ইন দি মিনটাইম, দেখি কি করা যায়। তখনো আমি ভাবি নাই যে, এদের দীর্ঘদিন থাকতে হবে। যেদিন ই. সি'র মিটিং, তার আগের দিন আমি গ্রামের বাড়িতে যাই। বাড়ি থেকে আসার পরে আমার তাঁতিবাজারের বাসায় খবরের কাগজে হেডলাইন দেখলাম, ইউনিভার্সিটির অ্যারেস্টেড টিচার্সদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

'সাময়িকভাবে বরখাস্ত' কথাটি শুনে আমরাও একটু চমকে উঠলাম। এটা কি জিনিস? অধ্যাপক রাজ্জাক এই মনোভাবটি প্রকাশ করে বললেন: এই আমি প্রথম শুনলাম, একজনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা যায়। বরখাস্ত কথাটা বোঝা যায়। কিন্তু সাময়িকভাবে বরখাস্তের অর্থ বার করা মুশকিল। আমার বাসার একটু দূরে মিউনিসিপ্যালিটির এক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আবুল খায়ের থাকতেন। সেখানে ই. সি'র মেম্বার ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে আমার দেখা।

আমি প্রশ্ন করলাম: কোন ইব্রাহিম খাঁ? প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন: হ্যাঁ, তিনি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। তাঁকে যখন বললাম, আপনারা এটা কেন করলেন, তখন তিনি বললেন, তিনি তো চাননি। কিন্তু অন্য মেম্বাররা রাজি নয়। আমি বললাম, আপনাদের যাকে জিগ্যেস করি, তিনিই বলেন, তিনি এটা চান নাই। এভাবে সবাইকে যোগ করলে দেখা যায় কেউই আপনারা অ্যারেস্টেড টিচার্সদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে চান নাই। তাহলে ব্যাপারটা হলো কি করে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা
সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

একাত্তর

১৬ই ডিসেম্বর অবশ্যই ১৬ই ডিসেম্বর। ১৬ই ডিসেম্বর যদি ১৬ই ডিসেম্বরকে স্মরণ করাতে না পারে তবে এই নাম অর্থহীন। আমি তাই ১৬ই ডিসেম্বরের আগমনে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ১৬ই ডিসেম্বরকে খোঁজ করছিলাম। এমন কিছু কি পাওয়া যায় যা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই ১৬ই ডিসেম্বর সেই ১৬ই ডিসেম্বরকে?

এই প্রয়োজনের সময়েই সৌভাগ্যবশত: হাতে এসে পৌছল বঙ্গভবনের একখানি সুমুদ্রিত সফেদ ভারী কার্ডের দাওয়াত পত্র: 'বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনায়' যোগদানের আমন্ত্রণ। এটা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয়। নিশ্চয়ই বিপুল সংখ্যক নাগরিককে এই 'বিজয় সংবর্ধনায়' আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাই স্বাভাবিক। ভেবেছিলাম এই দাওয়াতপত্র নিশ্চয়ই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে সেই ১৬ই ডিসেম্বরকে, বলে দিবে সেই ১৬ই ডিসেম্বর, দশম বিজয় দিবস এবং আমাকে কিছু হদিস দিবে কিসের বিজয়, কার ওপরে বিজয়? কিন্তু তার কোন হদিস বিজয় দিবসের এমন মনোহর কার্ডটিতে পাওয়া গেল না। বঙ্গভবনই অবশ্য বাংলাদেশের সব নয়। তবু বঙ্গভবনের একটি প্রতীকী অর্থ এবং মর্যাদা আছে। বঙ্গভবন হচ্ছে বাংলাদেশের পরিচালন কেন্দ্র। সেখানে যেই যান, তিনি শেখ মুজিবই হোন আর জিয়াউর রহমানই হোন, তাঁর দায়িত্ব দেশকে দিগদর্শন করাবার। তাই দেশবাসী চেয়ে থাকে বঙ্গভবনের দিকে। কোন দিকের নির্দেশ দিচ্ছেন বঙ্গভবনের পরিচালকবৃন্দ এবারের ১৬ই ডিসেম্বর?

– সরদার ফজলুল করিম

৬৯ এর গণআন্দোলন

১৯৬৯ থেকে শুরু করে ১৯৭০ এবং ১৯৭১-এর ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম। আই ওয়াজ এ কনসাস অবজার্ভার অব দি টোটাল প্রসেস। আই ওয়াজ ভেরিটেবলি এ ক্যামেরাম্যান। আমি ফটোগ্রাফারও ছিলাম। ৭১ সালের উত্তাল দিনগুলোর বিভিন্ন ঘটনা খুব সুন্দরভাবে আমি কালেক্ট করেছিলাম আমার ইয়াশিকা ক্যামেরায়। এগুলো প্রিজার্ভেবল ছিল।

১৯৬৯-এর গণআন্দোলন আমি নিজের চোখে দেখেছি। আসাদের যে ঘটনা অর্থাৎ আসাদকে যখন মার্ডার করা হল, সে দিনের কথাও মনে আছে। সেদিন কাজী দীন মুহম্মদ মটর গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন কক্সবাজার। সেখানে একটি মিটিংয়ে তিনি বক্তৃতা দেবেন। আমরা যখন মাঝপথে তখন এই নিউজটা এল যে, হাতিরদিয়াতে, আসাদ ওয়াজ কিলড। আমরা আর কক্সবাজার যেতে পারলাম না। আমরা ঢাকায় ব্যাক করলাম। আসাদকে আমি জানতাম না। কিন্তু তার মৃত্যুতে ঢাকায় সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হয়। এক মন্ত্রীর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় মর্নিং নিউজ অফিস। আমার এসব ঘটনা মনে আছে। সত্যেন সেনের মতো একটি নিরীহ লোক একটা লাঠি হাতে কয়েদিদের সাথে মিছিল করে যাচ্ছে শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে, চিন্তা করুণ একবার! এ ঘটনাটা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। ইট ওয়াজ রিয়েলি এ গণঅভ্যুত্থান।

১৯৬৯-এ আগরতলা মামলা থেকে যে বঙ্গবন্ধু বের হয়ে এলেন–এটা একটা বিরাট ব্যাপার। তাকে দেখার জন্যে আমি গেলাম তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে। আমি অবশ্য জানতাম যে জনতার ভিড়ে শেখ মুজিবের কাছে আমি যেতে পারব না। কিন্তু তবু আমি গেলাম, কারণ আমি মনে করতাম জনতাই হচ্ছে শেখ মুজিব এবং শেখ মুজিবই হচ্ছে জনতা। এভাবে আমার একটা রাইট আপ আছে। রাইট আপটির শিরোনাম: তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।

১৯৭০ এর নির্বাচন ও অতঃপর

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করল। এই জয়ের পর বাংলা একাডেমি আয়োজিত ২১শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এ ব্যাপারে কবীর চৌধুরী ওয়াজ দি টপমোস্ট পার্সন। তিনি তখন পরিচালক। আমি এবং কবীর চৌধুরী (এ এইচ এম আবদুল হাইও ছিলেন বোধহয় আমাদের সঙ্গে) তাকে আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা গিয়ে পৌঁছার আগেই বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমিতে এসে গিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমিতে একটি উদাত্ত বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি সবার জবাবদিহিতার কথা বলেছিলেন। তিনি বলছিলেন: 'আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলেন, আপনারা ভাষার জন্যে কি করেছেন? দেশের জন্য আপনারা কি করেছেন?' তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমরা যেদিন ক্ষমতায় যাবো সেদিন থেকে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে।' পরবর্তীকালে ক্ষমতায় গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কথা রক্ষা করেছিলেন।

শেখ সাহেব যখন বাংলা একাডেমিতে বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন খবর এল যে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছেন: 'সিডিউলড মিটিং অব দি ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি ওয়াজ পোস্টপনড'। এই মেসেজ ওয়াজ গিভেন টু শেখ সাহেব এবং দি মোমেন্ট দি মেসেজ ওয়াজ গিভেন টু হিম, শেখ সাহেব বাংলা একাডেমির মিটিং থেকে চলে যান। মিটিংটা ওভার হয়ে যায়। 'আমি যাই, পরে দেখা হবে'– বলে আমাদের দিকে হাত নেড়ে শেখ মুজিব চলে গেলেন আওয়ামী লীগ অফিসে।

তখন ফান্ড-টান্ড রেইজ করার প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হচ্ছে এবং সেই কমিটির জন্য চাঁদা তোলা হচ্ছে। আমরা চাঁদা তুলেছি, চাঁদা দিচ্ছি। আহমদ শরীফ স্যারসহ আমরা শহীদ মিনারে মার্চ করে যাচ্ছি। এই সমস্ত জঙ্গি ব্যাপার ৭১-এর প্রথম থেকেই শুরু হয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানের বিখ্যাত জনসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি বারবার বর্ধমান ভবনের ছাদে উঠে দেখেছিলাম কী রকম গণজমায়েত হয়েছে। তখন রেসকোর্স ময়দানের উপর পাকিস্তানি বিমান চক্কর দিচ্ছিল বারবার।

৭১ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে বাংলা একাডেমি ওয়াজ অ্যাটাকড। তিন তলায় একটা আধফাটা শেল পাওয়া গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, শেলের খোলসটা মিউজিয়ামে রাখতে। ২৫শে মার্চের শেলিংয়ে তিনতলার তেমন ক্ষতি হয়নি। দোতলার ক্ষতি হয়েছিল বেশি। ২৭শে মার্চ তারিখে অফিসে এসে দেখলাম, আমার ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। দেয়ালে অনেকগুলো বুলেট চার্জ করা হয়েছে। আমার টেবিলের পিছনে যে স্টিলের আলমারি, সেটার জিনিসপত্র সব তছনছ করে ফেলা হয়। সেই ঝাঁঝরা দেয়ালের সামনে, ভাঙ্গা দরজাওয়ালা ঘরে বসেই পুরো ৭১ সালটা আমি অফিসের কাজ করেছি।

আই কনটিনিউড ওয়ার্কিং ইন মাই অফিস। ইফ আই অ্যাম নট অ্যাভেইলেবল টু আর্মি, দেন আর্মি উইল জাম্প ওভার মাই ফ্যামিলি ইন মতিঝিল এ জি বি কলোনি। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম না আমার ছেলেমেয়েদের সামনে আমাকে গ্রেপ্তার করা হোক। সে জন্যে আমি সকাল-সন্ধ্যা বাংলা একাডেমিতে অফিস করতাম। কবীর চৌধুরী সাহেব ওয়াজ কোয়াইট ওকে। তিনি তাঁর লেখাপড়া করতেন। আমরা কথাবার্তা বলতাম। সাধারণ কিছু কাজকর্ম হত কিংবা হত না- সেটা বড় ব্যাপার ছিল না। এই যে এখলাস উদ্দিন এখন চোখে প্রায় দেখতেই পায় না, সে তো বড় অ্যাকটিভিস্ট ছিল। এই যে আমার গিয়াস, হিস্ট্রির, সে ক্লাশ এইটে পড়ার সময় থেকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে সরদার ভাই বলতে অজ্ঞান ছিল। গিয়াসের বড় ভাই নাসিরুদ্দীন আহমদ আমার ইন্টারমিডিয়েটের বন্ধু। গিয়াস, এখলাস এরা সবাই বাংলা একাডেমিতে আসত।

আমরা সময় কাটানোর জন্যে এক টেবিলে বসে গল্প করতাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কী বলা হয়েছে, মুকুলের চরমপত্রে নতুন কী বলা হল ইত্যাদি আলোচনা করতাম। কতদিন লাগবে দেশ স্বাধীন হতে, কোন ফ্রন্টে কী হবে? এসব জানার জন্যে আমরা শেষ দিকে প্ল্যানচেট করা শুরু করলাম। প্ল্যানচেটের মধ্যে জিন্নাহ সাহেব আসলেন একবার। তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হল। জিন্নাহ সাহেব কোনো কথাই বলতে চান না। তারপর হক সাহেব আসলেন। হক সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বলেন, দেশ স্বাধীন হতে কতদিন লাগবে?' আমাদের আঙ্গুল নড়ে উঠল। কাগজে

লেখা হল: 'ইট উইল টেক টাইম।' এটা বলেই হক সাহেব চলে গেলেন। এইসব করে আমরা বাংলা একাডেমিতে সময় কাটাতাম।

বাংলা একাডেমির কর্মচারীদের মধ্যে মিলিটারিদের এজেন্ট ছিল। স্বাধীনতারপর তাদের হ্যাকল করা হয়েছে। তাদের থাপ্পড়টাপ্পড় মেরেছে অনেকে। এক এজেন্টের নাম ছিল হেমায়েত। হেমায়েত রেডিও পাকিস্তানে কাজ করত। 'দি সিচুয়েশন ইজ নরমাল' বলে একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করে রেডিও পাকিস্তানের কিছু লোকজন সেই স্টেটমেন্টে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেন। তারা হেমায়েতকে সাথে নিয়ে বাংলা একাডেমিতেও যায়। হেমায়েত আমার কাছে গিয়ে বলল, 'সরদার ভাই, এটা দেখেন। সিগনেচার না দিলে যে কি হবে তা আমরা বলতে পারি না। আপনি নিজে তো বুঝতে পারেন।' তখন আমি নিজে চিন্তা করলাম যে আমি যদি সাইন না দিই তবে আমাকে ইমিডিয়েটলি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হবে অর্থাৎ আমাকে বাসা ছেড়ে চলে যেতে হবে অথবা আমি যদি বাসায় থাকি, তবে আই শেল বি অ্যারেস্টেড।' এটা আমার পজিটিভ কনক্লুশান। আমি দস্তখত দিতে বাধ্য হলাম। অ্যাট দি গান পয়েন্ট। উপায় ছিল না।

আমি ঢাকা ছাড়তে পারিনি, কারণ পরিবার নিয়ে আমি কোথায় যাবো? গ্রামে চলে যেতে পারতাম আবু জাফর শামসুদ্দীন ভাইয়ের মতো। কিন্তু সেখানে গিয়ে পরিবার প্রতিপালন করব কীভাবে? ভারতে যাইনি, কারণ, ঢাকা শহর থেকে ভারতে যাবার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। আমি কোনো দলের নই। সুতরাং কোনো দল আমাকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাবে না। আমি তখন কোনো রাজনীতি করি না। কোনো পার্টির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িতও আমি ছিলাম না। আমি বড় কোনো নেতাও ছিলাম না যে পার্টি আমার ভারতে যাবার সব ব্যবস্থা করে দেবে। তা ছাড়া দল না হয় আমাকে রক্ষা করল কিন্তু আমার ফ্যামিলিকে রক্ষা করবে কে? আর আমি ভারতে গেলেই তো হবে না, আমার পুরো পরিবারটিকেও সেখানে নিতে হবে। আমার ফ্যামিলিকে আমি যদি রক্ষা করতে না পারি তবে হোয়াট উইল আই ডু ইউথ মাই লাইফ? এই জন্য আই ডিড নট লিভ মাই কোয়ার্টার। সকালবেলা নিয়মিত অফিসে গেছি, বিকালবেলা বাসায় ফিরেছি। মাঝখানে অফিসে বসে গল্পটল্প করেছি। অনুবাদও করেছি কিছু।

আমি ইতোমধ্যে আমার বাসায় বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। আমি বিভিন্ন গণ আন্দোলনের অনেকগুলো ছবি তুলেছিলাম। সেসব ফটোগ্রাফ ইত্যাদি আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি। 'বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহিম' লিখে টাঙ্গিয়ে দিয়েছি আমার দরজায়। পাকিস্তানের পতাকাও একটা রাখা হয়েছে, দরকার মতো সেটাও দেখানো হবে। তখন গাড়ি যেমন, ট্রাক বা মাইক্রোবাস আসতে দেখে বা আসার শব্দ শুনে কেঁদে উঠত: 'আব্বা, ঐ আসছে'। তারা বুঝে গেছে, আমাকে এখনো নেয় নাই কারণ, অন্যরা লিস্টের প্রথম দিকে আছে, আমার পালা আসবে একটু পরেই। আর্মি ঘুরে ঘুরে অন্যদের পিক আপ করে নিয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল মাসের দিকে যখন পজিশনটা আরো অ্যাডভান্স করেছে অর্থাৎ মুজিবনগর গভর্নমেন্ট ফর্ম করেছে তখন আরো নানান ঘটনা ঘটছে। ঢাকায় প্রতি রাত্রেই বোমা ফাটছে এদিক ওদিক। যে রাত্রে বোমা ফাটছে না সে রাত্রে মনে হচ্ছে একটা বোমা ফাটলে হত। আমরা রেডিও কানের কাছে ধরে চরমপত্র শুনেছি।

হু ইজ সরদার ফজলুল করিম

১৯৭১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, বাংলা একাডেমি থেকে মিলিটারিরা আমাকে ধরে নিয়ে যায়। এর আগে আবু জাফর শামসুদ্দীনকেও নিয়ে গিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। আমি অপেক্ষা করছিলাম যে জাফর ভাই ফিরে এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব মিলিটারিরা তাকে কী কী ধরনের ইন্টারোগেশন করেছে। জাফর ভাইয়ের কাছ থেকে সব শুনে আমি ডিসিশন নেব আমি কী করবো। জাফর সাহেব ফিরে এসে আর জয়েন করেননি। ঐ যে তাকে ইন্টারোগেশনে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি আর জয়েন করেন নাই। তিনি সেখান থেকেই তাঁর গ্রামের বাড়িতে চলে যান।

৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি অফিসে যাই সকাল ১০টা বা সাড়ে ১০টার সময়। অফিসে গিয়ে বসার কিছুক্ষণ পর কয়েকটা লোক এসে আমার টেবিলের পাশে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে বাঙ্গালি এবং নন বেঙ্গলি দুইই ছিল। তারা জিজ্ঞেস করল: 'হু ইজ সরদার ফজলুল করিম?' আমি উত্তর দিলাম: 'আই অ্যাম সরদার ফজলুল করিম'। তারা আমাকে বলল, 'ইউ কাম ইউথ আস। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।' আমি আশপাশের বন্ধুদের বললাম, 'দেখেন, আমি তো চলে গেলাম। আমার বাসায় একটু খবর দেবার চেষ্টা করবেন।' মোতাহের বলে এক কর্মচারী ছিলেন। এখন তিনি মারা গেছেন। এই মোতাহারই বোধ হয় সেদিন বিকালে আমার মতিঝিলের বাসায় গিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবরটা পৌঁছে দিয়েছিলেন আমার ওয়াইফের কাছে। আমি পরে জেনেছি, ৬ই সেপ্টেম্বরই আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোক বাংলা একাডেমিতে এসে জিজ্ঞেস করে গিয়েছিল, সরদার ফজলুল করিম কখন আসে। এই খবরটা কিন্তু আমাকে কেউ দেয় নাই। অবশ্য খবর দিলেও আমার কিছু আসত যেত না।

বাংলা একাডেমির পাশে একটা আর্মি জিপ রাখা ছিল। জিপে আর্মড ম্যান ছিল। আমাকে ওরা জিপে নিয়ে গিয়ে ওঠাল। আমি ভাবলাম, বাংলা একাডেমির গেট থেকে বের হয়েই ওরা ক্যান্টনমেন্টে যাবে। কিন্তু জিপটা ক্যান্টনমেন্টে গেল না। আমাকে নিয়ে শহরের মধ্যে মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়াতে ঢুকল। ঢুকে তারা এখানে ওখানে ওয়ারলেসে নানা কথাবার্তা বলছে: হ্যালো, হ্যালো। টকিং ফ্রম মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া। হোয়াই ডোন্ট ইউ ফাইন্ড হিম, হি সিটস দেয়ার, হি হ্যাজ এ লিগাল ফার্ম, সার্চ আফটার হিম ইত্যাদি। তখনি আমি বুঝে নিই ব্যাপারটা: ওরা কামরুদ্দীন সাহেবকে খুঁজছে। কামরুদ্দীন সাহেব অনেক বই-পত্র লিখেছেন পাকিস্তান পিরিয়ডটার বিভিন্ন দিক নিয়ে। কামরুদ্দীন সাহেবের অপরাধ হচ্ছে এই যে, তাঁর ছেলে নিজাম ছাত্র ইউনিয়ন করত এবং সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সম্ভাবনাময় এই ছেলেটি সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করত এবং বাপের সঙ্গে এ নিয়ে তার তর্কও হত। ফেনীতে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে মুখোমুখি সংগ্রামে নিজাম শহীদ হয়। এই ছেলেটিকে নিয়ে কামরুদ্দীন সাহেবের অনেক আশা ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উলটো দিকে কামরুদ্দীন সাহেব আর তার পার্টনারের লিগাল ফার্ম ছিল একটা। ওদের কাছে ক্রমাগত নির্দেশ আসছে 'ক্যাচ হিম', 'টেক হিম আপ'। কিন্তু ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরা তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত যেতে যেতে কন্ট্রোল রুমের সাথে আলাপ করতে করতে তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশে

দিয়ে গাড়িটা রাখল এবং এক সময় দেখলাম, কামরুদ্দীন সাহেবকে ওরা নিয়ে আসছে। কামরুদ্দীন সাহেব গাড়িতে এসে আমার পাশে বসলেন। আমরা দুজনে এমন ভাব দেখালাম যেন উই ডু নট নো ইচ আদার। আমরা একে অপরকে চিনি না। জিপটা এর পর আর কোথাও দাঁড়াল না। সোজা চলে গেল এম পি হোস্টেলে। যেটা এখন প্রাইম মিনিস্টারের অফিস তার পিছনে একটা এম পি হোস্টেল ছিল। এম পি হোস্টেল ছিল একটা টরচার প্লেস অব দি আর্মি। ওখানে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে আমাদের দুজনকে বসাল। আমরা বসে আছি। একটা মেজর আসল কিছুক্ষণ পরে। মেজর এসে আমাকে একটা গাল দিল: 'ইউ পিপল, দি বাস্টার্ড সানস অব তাজউদ্দীন। উই শ্যাল টিচ ইউ এ গুড লেসন।' তাজউদ্দীনের নামটা তারা নিল, অন্য কারো নাম না। অবশ্যই শেখ সাহেব তখন ওয়েস্ট পাকিস্তানে আটকা পড়ে আছেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট তখন হয়ে গেছে এবং তাজউদ্দীন তখন সরকার প্রধান। তাজউদ্দীন ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্সন। কিন্তু তাজউদ্দীন সাইলেন্টলি কাজ করত। তাজউদ্দীন বঙ্গবন্ধুর পাশে বসে থাকত, সাইলেন্টলি বের হয়ে আসত। যা ফাইল ওয়ার্ক ছিল তা করত। তার কোনো বক্তৃতাবাজি ছিল না। আমাকে যেটা স্ট্রাইক করল সেটা হচ্ছে, মেজর বেটা আমাকে গালি দিতে গিয়ে তাজউদ্দীনের নামটা উল্লেখ করল কেন!

আমরা বসেই আছি। বিকেল বেলায় আমাদের আর একটা অফিসারের সামনে হাজির করল। অফিসারের র‍্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক আমি জানি না। কামরুদ্দীন সাহেবের তো একটা পরিচয় ছিল। হি ওয়াজ অ্যান এক্স অ্যামব্যাসাডর। ওঁকে ছয় মাসের ডিটেনশন দিল। আমাকে দুই বছরের ডিটেনশন দিল। এর পর আমাদের দুজনকে সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমি তো জেলবার্ড। আমার মনে একটু ভরসা এল যে, জেলে অন্তত সিপাহীটিপাহীদের মধ্যে কিছু পরিচিত লোক পাব।

আমাদের দুজনকে জেলে নেওয়ার পরে যে ট্রিটমেন্টটা আরম্ভ করল সেই ট্রিটমেন্টের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স ছিল। দি ট্রিটমেন্ট হুইচ ওয়াজ গিভেন টু কামরুদ্দীন আহমদ অ্যান্ড দি ট্রিটমেন্ট গিভেন টু সরদার ফজলুল করিম ওয়াজ নট দি সেম। আমাকে তারা জেলের মধ্যে এমন খারাপ জায়গায় পাঠাল যেখানকার খাবার খেলে ব্লাড ডিসেন্ট্রি হতে বাধ্য। কাছাকাছি একটা আর্মির লোকও ছিল যে আমার কাছ থেকে সমস্ত কথা বার করার চেষ্টা করছিল। আমার বাইরের বন্ধুরা চেষ্টা করেছিল যাতে জেলের মধ্যে কোনো একটা ডিভিশন আমাকে দেওয়া হয়। এ জন্যে ওরা অনেক অফিসারের সঙ্গে মিট করেছে। এমনকি তারা মাহমুদ আলীর সঙ্গেও মিট করেছে। মাহমুদ আলী পাকিস্তানিদের সঙ্গে কাজ করছিল। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা বিফলে গিয়েছিল। তারা কিছু করতে পারে নাই। ইন দি মিন টাইম সিচুয়েশনও ক্রমাগত চেঞ্জ করছে। পাকিস্তানিদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ইতোমধ্যে অক্টোবর গেল, নভেম্বর এসে পড়ল। এই দুই মাস আমি খুব সাফার করেছি।

পরাজয় নিশ্চিত–এটা বুঝে যাবার পর ডিসেম্বরের ১৩-১৪ তারিখে রাজাকার-আলবদররা বুদ্ধিজীবীদের খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করে। অনেকে প্রশ্ন করে, শহীদুল্লাহ কায়সারের মতো লোক কেন সে সময় ঢাকা শহরে থেকে গেল? কিসের ভরসায়? মুনীর চৌধুরী কেন তার বাসায় অবস্থান করছিলেন? মুনীরের সাথে বহুদিন যাবৎ রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে ভাবত তাকে কেন পাকিস্তানিরা মারবে? কিন্তু রাজনীতির সাথে কোনো কালে প্রকার সম্পর্ক ছিল না এমন অনেক বুদ্ধিজীবী

যেমন, মোফাজ্জল হায়দায় চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকেও রাজাকাররা হত্যা করেছে। আসলে কোনো বুদ্ধিজীবীই ভাবতে পারেননি তাঁদের এভাবে ধরে এনে হত্যা করা হবে।

আমরা যারা জেলে ছিলাম তাঁরা বেঁচে গেছি জেলে থাকার জন্যে নয় বরং আলবদর রাজাকাররা আমাদের হত্যা করার সময় পায়নি বলে। দেশটা এত তাড়াতাড়ি স্বাধীন হয়ে যাবে এটা তারা ভাবতে পারেনি। তারা ভেবেছিল, এগুলো তো জেলে আমাদের হাতের কাছেই আছে জিয়ল মাছের মতো; যে কোনো একদিন মেরে ফেললেই চলবে। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের দেয়ালের উপর মেশিনগান ফিট করাও ছিল। জেলে আমাদের হত্যা করলে এমন কিছু আসত যেত না ওদের। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগারে ১৯৭১ সালে জেলের ভিতরেই রাজবন্দীদের ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার খবরটা আমরা জেলে বসেই পাই। সিপাহীরাই আমাদের খবরাখবর দিতো। ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আমরা জেলেই ছিলাম। ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে মুক্তিযোদ্ধরা এসে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের দরজা খুলে দেয়। ঐ দিন অন্য সব কয়েদির সাথে আমি আর কামরুদ্দীন সাহেবও মুক্তি পাই এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বহু স্মৃতি-বিজড়িত গেটটি পার হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে পা রাখি।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম, ঢাকা তখনো একটি ভূতের নগরী। ট্রাফিক সিস্টেম তখনো কাজ করছিল না। আমি হেঁটে প্রথমে বাংলা একাডেমিতে গেলাম। সেখানে পুরোনো কর্মচারীরা সব ছিল। তারা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

সেই সে কাল: কিছু স্মৃতি কিছু কথা

সরদার ফজলুল করিম, প্যাপিরাস, ১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

'৭১-এর ডায়েরি

আমি জানি, এই লেখাটির তাগিদ ১৯৮৪-এর ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবস সংখ্যার জন্য। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরের জন্য কিছু লিখতে গেলেই ২৫ মার্চের কথা আমার মনে পড়ে। আসলে ২৫ মার্চ আর ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যকার পার্থক্যের কথাটি এতোদিনেও আমার বোধের মধ্যে আসছে না। আর ক্ষুদ্র বাংলাদেশের ইতিহাসে তারিখ বিভ্রাটের এতো এক রহস্যময় ঘটনা। ক্যালেন্ডারের তারিখে তারিখে তফাত থাকে। ১৬ ডিসেম্বর, ২৫ মার্চ থেকে তফাত। মানুষের জীবনের ইতিহাস অবশ্য বিচিত্র। কোথাও যে তারিখের সংশোধন ঘটে না, এমনও নয়। রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে অক্টোবর মাস নভেম্বরে পরিবর্তিত হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লব তাই নভেম্বর বিপ্লব নামে পারিচিত। কিন্তু বাংলাদেশে তারিখের পরিবর্তন নয়। তারিখের সঙ্গে তারিখের একাকার হয়ে যাওয়া। বাংলাদেশে ২৫ মার্চ বাদে ১৬ ডিসেম্বর ঘটে না। সে কথাটাই আমরা বিস্মৃত হই। বিস্মৃত হচ্ছি। আজকাল ১৬ ডিসেম্বর, ২৫ মার্চের কথা লিখলে সাহিত্য সম্পাদকরা বলেন, ১৬ ডিসেম্বরের সঙ্গে ২৫ মার্চকে আপনি মেশাবেন কি করে? কিন্তু আমার পক্ষে ১৬ ডিসেম্বরকে ২৫ মার্চ থেকে তফাত করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ-অক্ষমতার কোনো সংশোধন নেই। বাংলাদেশের ইতিহাসে এভাবে বছরের এ-মাথা ও-মাথা এক হয়ে গিয়েছিল ১৯৭১ সালে: এ-রকম দুর্ঘটনা কৃচিৎ-কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু যদি ঘটেই, তবে তাকে আর অস্বীকার করা চলে না। ২৫ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ নয়। এটা একটাই তারিখ: ২৫ মার্চ-১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। সেই তারিখটির কথা লিখতে গিয়ে এখানে একটি রোজনামচাকে আমার তুলে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। এ-আমার নিজের রোজনামচা নয়। একজন বিদেশি সাংবাদিকের রোজনামচা: ১৩ বছর আগের রোজনামচা। এটি যে একেবারে অভিনব, এমনও নয়। তবু ১৯৭১-এর বহু স্মৃতিই আজ অবিশ্বাস্য আর অভিনব বলে বোধ হয়। আমরা কেবল বিজয়ের পতাকাটাকেই দেখতে চাই। তার রক্তকে নয়, আঘাতকে নয়। তার অশ্রুকে নয়। কিন্তু তেমন ইচ্ছা ভিত্তিহীন। বিজয়ের পেছনের রক্ত আর অশ্রুকে আমাদের স্মরণ করতে হবে। ইউ. পি. আই– বা ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল-এর সাংবাদিক রবার্ট কায়লারের ১৯৭১-এর ২৫ ও ২৬ মার্চ তারিখের ঢাকায় লেখা এবং ২৯ মার্চ হংকং-এ প্রকাশিত এই ডায়েরিটি আমাদের বর্তমানের আত্ম-বিস্মৃতিকে আঘাত করে হয়তো সেই রক্ত আর অশ্রুকে আবার আমাদের বিবেকের সামনে জাগরূক করে তুলবে। এই মনে করে ডায়েরিটি কোনো একটি সূত্র থেকে আজ ১৯৮৪-এর ডিসেম্বরে আবার আমি হুবহু তুলে দিলাম।

* * *

ঢাকা: ২৫ মার্চ ১৯৭১, বৃহস্পতিবার: রাত ১১টা: হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল: শেখ মুজিবুর রহমান বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে তিনি হুঁশিয়ার করেছেন, জনসাধারণের ওপর সামরিক বাহিনীর আক্রমণ চলতে থাকলে তার 'পরিণতি হবে ভয়াবহ'। আমি বিবৃতির একটি রিপোর্ট তৈরি করে নিচের তলায় হোটেল লবিতে এলাম। রিপোর্টের একটি কেবল পাঠাতে টেলিগ্রাম অফিসে যাবো ভাবছি। একটা ট্যাক্সি নিতে হবে।

নিচে লবিতে দেখলাম, বেশ একটি ভিড় জমেছে। বাইরে দেখলাম, যুদ্ধের পোশাকে অস্ত্র হাতে, মাথায় হেলমেট পরা সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। হোটেলের কর্মচারীরা একটি ব্ল্যাকবোর্ড টানিয়ে তার ওপর চক দিয়ে নোটিশ লিখছে: 'দয়া করে কেউ বাইরে যাবেন না।'

ব্ল্যাকবোর্ডে কে যেন শেখ মুজিবের বিবৃতির একটি কপি টাঙ্গিয়ে দিয়ে গেছে। শেখ মুজিব শনিবার হরতাল ডেকেছেন। অন্যান্য বিদেশি সাংবাদিকের কাছ থেকে খবর পেলাম, সৈন্যরা কেউ হোটেল ছেড়ে বাইরে যেতে চাইলেই তাকে জোর করে ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সৈন্যদের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত ক্যাপ্টেন হুঁশিয়ারি দিয়েছে: কেউ বাইরে গেলে তাকে গুলি করা হবে।

রাত ১১-১৫ মিনিট: সকলেই চিন্তা করছে, কি ঘটছে। একটা জল্পনা হচ্ছে, হোটেলে সৈন্যদের পাহারা বসেছে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিরাপত্তার জন্য। ভুট্টো হোটেলের একেবারে উঁচু তলাতে আছেন। এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশে ভুট্টো এখন ঘৃণার পাত্র। অপর একটা গুজব হচ্ছে, আর একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে, কারণ জেনারেলদের, শক্ত হাতে দমনের নীতি, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এখনো পুরো গ্রহণ করেননি। সময় যতো বাড়ছে, সামরিক ক্যুর ধারণাটা যেন ততো বদ্ধমূল হচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে দু'বার হোটেলের পাশ দিয়ে সামরিক বাহিনীর বহরকে যেতে দেখা গেছে।

প্রেসিডেন্টের একজন গুরুত্বপূর্ণ সহকারীকে আমি ফোন করার চেষ্টা করলাম, বোঝার জন্য, প্রেসিডেন্টের ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার গুজবটা সত্য কি না। কেউ একজন ওদিকে ফোনটা ধরলো, কিন্তু কোনো জবাব না দিয়ে রেখে দিলো। ঢাকার একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে জিগ্যেস করলাম ফোন করে, কি ঘটেছে, তাদের কি ধারণা। তারা বললো, তারা কিছু জানে না এবং তাদের অফিস ছেড়ে তারা বেরোতেও পারছেন না।

রাত ১২টা: কয়েকজন ব্রিটিশ কূটনীতিক এলেন। তাঁরা বললেন, একটা অনুষ্ঠান থেকে তাঁরা তাঁদের বাসায় ফিরছিলেন। পথে সৈন্যরা তাঁদের থামিয়ে বাসায় যেতে না দিয়ে হোটেলে নিয়ে এসেছে। তাঁরা শহরের নানা জায়গায় সামরিক বাহিনীর তোলা ব্যারিকেড দেখতে পেয়েছেন। আমাকে একজন বাঙ্গালি ফোন করেছিলেন। তিনি শহরতলির কোথাও থাকেন। তিনি বললেন, শত শত মানুষ লাঠিসোঁটা, লোহার রড–এসব নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ইউ পি আই-এর সংবাদদাতা আসরার আহমদকে তাঁর হোটেলে ফোন করে পাওয়া গেল। তিনি বললেন, 'তিনিও তাঁর হোটেলে আটকা পড়ে আছেন। তিনিও কোনো সংবাদ পাঠাতে টেলিগ্রাম অফিসে যেতে পারছেন না। দেখলাম, হোটেল ইন্টারকনের বাইরে সৈন্যরা 'বাংলাদেশী' পতাকাটাকে নামিয়ে এনে পুড়িয়ে ফেললো।

রাত ১২-৫০: কয়েকবার চেষ্টা করার পর শেখ মুজিবের বাড়ির সঙ্গে টেলিফোনের লাইন পাওয়া গেল। শেখ মুজিবের বাড়িই এখন ঢাকার রাজনীতির হেড কোয়ার্টার। ফোন যে ধরলো, সে তার পরিচয় জানালো না। তবে বললো, শেখ মুজিব বাড়িতে আছেন এবং আওয়ামী লীগ তাঁর বাড়ির রাস্তায় ঢোকার মুখে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। ফোনের গলা আরো বললো, তারা শুনেছে রাস্তার বাধার কাছে সৈন্যরা নাকি দু'জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে গুলি করে হত্যা করেছে। পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের কূটনীতিকদের কাছে ফোন করেও বুঝলাম, তাঁরাও বুঝতে পারছেন না, কি ঘটছে।

রাত ১টা: যে-বাঙ্গালি বন্ধু আগে একবার ফোন করেছিলেন, তিনি আবার ফোন করলেন। বললেন, তিনি তাঁর এলাকার চারদিকে মেশিনগানের গুলির আওয়াজ শুনছেন। তিনি নিজের ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে আছেন। কিছু পরেই দেখলাম, টেলিফোনগুলোও নীরব হয়ে গেল। এবার আমরাও হোটেল থেকে গুলির আওয়াজ পেলাম। মাঝে মাঝে জোরালো বিস্ফোরণেরও শব্দ এলো। কিছু পরে দেখলাম, সেনাবাহিনীর জিপে রিকয়েললেস রাইফেল বসানো হয়েছে।

রাত ৩টা: হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের বিপরীতে, পশ্চিম পাশে দৈনিক পত্রিকা 'দি পিপল'-এর অফিস। আমি দেখলাম, কিছু সৈন্য মশাল জ্বালিয়ে দি পিপল'-এর দিকে যাচ্ছে। কিছু পরেই চিৎকার আর গুলির শব্দ শোনা গেল। পত্রিকার অফিসে আগুন জ্বলে উঠলো। 'দি পিপল' ইংরেজিতে বের হয়। সরকারের জোর সমালোচনা করতো। বিরোধী পত্রিকা। কিছু পরে অন্ধকারে হোটেলের কাছে আরো গুলির শব্দ আর চিৎকার শুনতে পেলাম। কিন্তু কিছু দেখা যাচ্ছিল না। বুঝতে পারছিলাম না, কি হচ্ছে। সবদিক থেকেই গুলির আওয়াজ আসছে।

২৬ মার্চ: ৭১: সকাল: এখন গুলির শব্দ কমে গেছে। রাস্তাগুলো জনশূন্য। ইউনিভার্সিটির দিক থেকে বিরাট আকারে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল। সামরিক বাহিনী যদি ভারি অস্ত্র নিয়ে ইউনিভার্সিটি সত্যিই আক্রমণ করে থাকে, তাহলে বিরাট রকমের হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবে। ছাত্ররা সব হলে হলে থাকে। এক একটা হলে নাকি অন্তত ৪০০ করে ছাত্র থাকে।

সকাল ৭টা: আমরা কয়েকজন এক সঙ্গে মিলে হোটেলের এগারো তলায় গেলাম। ভুট্টো এগারো তলাতেই রয়েছেন। তাঁর ঘরের সামনে তাঁর দু'জন সশস্ত্র দেহরক্ষীকে আমরা দেখতে পেলাম। ভুট্টোর দলের এক লোক এসে বললো, তারাও বুঝতে পারছে না, কি ঘটেছে। সে বললো, ভুট্টো ঘুমিয়ে আছেন। সাড়ে সাতটায় তাঁকে জাগাতে বলা হয়েছে।

সকাল ৮টা: রেডিওর খবর শুনলাম। করাচি থেকে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেছেন এবং আজ রাত আটটায় তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। 'ক্যু' হওয়ার গুজব তাহলে সত্য নয়। টেলিফোনগুলো এখনো অচল হয়ে আছে।

সকাল ৮-৩০: শুনলাম ভুট্টো চলে যাচ্ছেন। হোটেলের বাইরে একটা গাড়ি এবং আড়াল দেয়া সামরিক বাহিনীর বাস এসে দাঁড়িয়েছে। সৈন্যরা গাড়ি থেকে নেমে হোটেলের বারান্দায় এসে জড়ো হয়েছে। ভুট্টো একটা ধূসর সুট আর নীল টাই পরে বেরিয়ে এসেছেন। ভুট্টো কিছু বলবেন না। তিনি বারবার বলছেন: আমার কিছু বলার নেই: 'আই হ্যাভ নো কমেন্ট।' এই বলে তিনি গাড়ি চাপলেন। তাঁর দেহরক্ষীরা তাঁর দু'পাশে আসন নিয়ে তাদের রাইফেলের নল জানালা দিয়ে বাইরে তাক করতে লাগলো। যেভাবে তারা রাইফেলের ট্রিগারে হাত রেখে নল ঘোরাচ্ছে, তাতে যে কারুর মন ভয়ে কেঁপে উঠবে।

ভুট্টোর একজন সহকারী বলেছিলেন, আগের দিন বিকেল পাঁচটায় ভুট্টোর দলের লোকেরা যখন প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ফিরেছিলেন, তখনি তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনৈতিক ফয়সালা আর হচ্ছে না। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে না, কারণটা কি? এটা কি এ-জন্য যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আর শেখ মুজিবের মধ্যে যে সমঝোতা

হয়েছে, ভুট্টো তা মানছেন না? না, ইয়াহিয়ার ওপর সামরিক চাপ বাড়ছে? ভুট্টোর দলের লোকদের ভাবটা এমন যে, তাদের নেতা রাজি হননি বলেই আলোচনা ভেঙ্গে গেছে।

ভুট্টো চলে যাওয়ার পর আমরা একটু হোটেলের পাশে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু সৈন্যরা আমাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। এক লেফটেন্যান্ট কর্নেল বললো: আমরা হোটেল ছেড়ে যেতে পারবো না। সৈন্যদের চার্জে যে ক্যাপ্টেন আছে, সে হোটেলের এক কর্মচারীকে উর্দুতে বললো: আমরা বিদেশি কি বিদেশি না, এটা তার দেখার ব্যাপার নয়। আমরা হোটেলের ভেতরে না গেলে সে আমাদের গুলি করবে। আমরা হোটেলের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। হোটেলের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার পাকিস্তানি। ক্যাপ্টেন তাকে ধমক দিলো: ১৫ মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানি পতাকা বাইরের খুঁটির মাথায় না উঠালে তাকে গুলি করা হবে।

হুমকি দিয়ে ক্যাপ্টেন চলে গেল। দেখলাম, হোটেলের কর্মচারীরা একটা পাকিস্তানি পতাকা নিয়ে এলো এবং পতাকার খুঁটিতে বাইরে তা লাগানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু ওদিকে বাইরে যাওয়াও তাদের নিষেধ। বোঝা গেল, বুদ্ধিতে সব সেনাবাহিনীই সমান।

সকাল ৯টা: রেডিওর একটি ঘোষণা শুনলাম। ২৪ ঘণ্টার সান্ধ্য-আইন জারি করা হয়েছে। রাস্তায় কাউকে দেখা গেলে গুলি করা হবে। ঘোষণায় বলা হলো, সকাল দশটায় একটি বিশেষ ঘোষণা দেয়া হবে। হোটেল কর্তৃপক্ষ কেমন করে যেন একজন বাবুরচি যোগাড় করেছে। সে আমাদের জন্য নাশতা আর কফির ব্যবস্থা করলো।

সকাল ১০টা: হোটেলের ছাদে পাকিস্তানি পতাকা তোলা হয়েছে। হোটেলের ম্যানেজার একজন জার্মান। সে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো: 'সব ধরনের পতাকাই আমাদের রেডি থাকে।' রেডিওতে বিশেষ ঘোষণা কিছু এলো না। কেবল সামরিক আইনের নির্দেশগুলো প্রচার করা হলো। কারফিউর কথাও আর উল্লেখ করা হলো না।

দুপুর: হোটেলের ওপরতলার ঘরের জানালা দিয়ে জনশূন্য রাস্তায় জিপ আর ট্যাঙ্কের চলাচল চোখে পড়ে। মনে হচ্ছে, যেমন ইচ্ছা তেমন গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। এদের যাওয়ার কিছু শহরের ভেতরে আওয়ামী লীগের অফিসের দিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠতে দেখা গেল: চোখের ওপর এগুলো দেখছি আর বাইরের জগৎকে একটা কথাও জানাতে পারছিনে। কী যে অসহায় লাগছে! রেডিওর শর্টওয়েভ ধরে বুঝলাম, বাইরের দুনিয়া আদৌ কিছু জানে না। সেনাবাহিনীর আক্রমণের একটা শব্দও বাইরে যেতে পারেনি।

১২-৩০: যে লেফটেন্যান্ট কর্নেলটি আগে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল সে এবার এসে বললো: সময় কাটানোর জন্য আমরা সুইমিংপুলে যেতে পারি। সে হুকুম দিয়ে গেল, যারা বিদেশি তারাই কেবল সুইমিংপুলে যেতে পারবে। পাকিস্তানিদের ঘরের মধ্যে থাকতে হবে। ইউনিভার্সিটির দিকে কি হচ্ছে বা শহরে কি হয়েছে, এর কোনো প্রশ্নেরই সে জবাব দিলো না। তার উত্তর হচ্ছে: 'আপনারা আরাম করুন, চিন্তা করবেন না, সুইমিংপুলে সাঁতার কাটুন।' বিকেলে তেমন কিছু ঘটলো না। মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজে পেয়েছি। শহরের দক্ষিণ দিক থেকে নতুন করে আগুন দেয়ার আভাস এলো। পাক-খাওয়া ধোঁয়া উড়তে দেখলাম। সূর্য ডুবে অন্ধকার হচ্ছে। এ সময়ে আগুন সহজেই চোখে পড়ে।

রাত ৮-১৫: ইয়াহিয়ার রেডিও বক্তৃতা শুনলাম। তিনি শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনকে দেশদ্রোহিতা আখ্যা দিয়েছেন। আওয়ামী লীগকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। বক্তৃতা শুনে নিচে এলাম। রিসেপশনের ঘর দেখলাম একেবারে খালি। বক্তৃতা শুরু হতেই হোটেলের সাংবাদিকদের বলা হয়েছে, তাদের জিনিসপত্র নিয়ে সামরিক বাহিনীর গাড়িতে উঠতে। তাদের তেজগাঁও এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। কেমন করে যেন আমি নজর এড়িয়ে গেছি। হোটেলে অবস্থানরত সেনারা একটা টহল গাড়িকে ডেকে আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যেতে বললো। টহল বাহিনীতে দেখলাম, একটা জিপ আছে। সেটা চালাচ্ছে একটা মোচওয়ালা তরুণ লেফটেন্যান্ট। পেছনে আছে একটা সৈন্য ভর্তি সাঁজোয়া গাড়ি। এরা আমাদের সুটকেসটাকে সাঁজোয়া গাড়িতে উঠালো। লেফটেন্যান্ট তার রেডিও অপারেটরকে পেছনের সিটে যেতে বললো এবং আমি তার পাশে উঠে বসলাম।

লেফটেন্যান্টকে বললাম: এমন অবস্থা কতোদিন চলবে বলে তার মনে হয়? জবাবে সে বললো: 'সে হুকুম মানে, আর কিছু জানে না।' কিন্তু তারপরেই হঠাৎ বলে উঠলো: 'সব ঠিক হয়ে যাবে–এভরিথিং উইল ওয়ার্ক আউট অলরাইট হিয়ার। 'এ-ব্যাটাদের আমরা ঠিক করবো: 'উই উইল ফিকস দিজ পিপল।'

রাত ১টা: এয়ারপোর্টে কাস্টমস আবার তল্লাশি করলো। আমি বললাম, 'একবারতো ঢাকায় তল্লাশি হয়েছে।' কাস্টমস অফিসার বললো: 'তার কাছে বিশেষ অর্ডার আছে।' সে আমার নোটবই বাজেয়াপ্ত করলো। ঢাকা থেকে যে সব কেবল পাঠিয়েছি, তার কার্বন কপি হস্তগত করলো। খবরের কাটিং আর কাগজের টুকরো, সুটকেসে যা পাওয়া গেল, তার কিছুই সে বাদ দিলো না। এমন কি আমার স্ত্রী যে চিঠি লিখেছেন, সেগুলোও। ১৪টি ছবি না-তোলা ফিল্মের রোল ছিল। সেগুলোও সে তুলে নিয়ে একটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে লাগলো। এগুলোর ভাগ্যে কি ঘটবে, জিগ্যেস করতে সে বললো: 'ডাক পাঠিয়ে দেয়া হবে।' আমি বলি: 'কখন?' সে শুধু কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলে: 'পরে।' জিনিসগুলোর জন্য কোনো রসিদ দিতে সে অস্বীকার করলো।

রাত পৌনে ২টা: এতোক্ষণে বোম্বের জন্য প্লেন ছাড়লো। আমি আমার প্যান্টের পেছনের গায়ে হাত বুলোলাম। না, সব যায়নি। ঢাকায় বসে যে রিপোর্টটা তৈরি করেছিলাম, সেটা পেছনের পকেটে এখনো আছে। সব কিছু হারানোর দুঃখ যেন পুষিয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গী আর এক সাংবাদিকের দুর্ভাগ্য। তাঁর বডি সার্চের সময়ে তাঁর লুকোনো রিপোর্টটি ধরা পড়েছে।

রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ

সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে

দর্শন মানেই জ্ঞান। তবু জ্ঞানের একাধিক বিশেষ শাখার ন্যায় আজকাল দর্শনকেও একটি বিশেষ শাখা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর লাভ ক্ষতির দু'টি দিক আছে। বিশেষ হিসাবে এর বিশিষ্ট চর্চার দিক আছে। এর পরাবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি দিকের বিশেষ চর্চার সম্ভাবনার দিক। অপরদিকে বিশেষ হিসাবে এর সাধারণ চারিত্রের লোপ। আজ যুক্তিবিদ্যা আছে পরাবিদ্যা আছে। নীতিবিদ্যা আছে। মনোবিদ্যা আছে। যেমন আছে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি। কিন্তু 'দর্শন' বলে আজ আর কিছু নেই। আজ দর্শন যেন অঙ্ক বা ভূগোল বা অর্থনীতি বা ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাকার বিশেষ জ্ঞানের ন্যায় একটি বিশেষ জ্ঞান। যেন দর্শন জীবনের একটি দিকমাত্র: যেমন অর্থনীতি জীবনের একটি দিক, রাজনীতিক জীবন জীবনের একটি দিক। কিন্তু এককালে দর্শনের সাধারণ চরিত্রই প্রধান বলে বিবেচিত হত। সাধারণ চরিত্রই ছিল তার মূল চরিত্র। দর্শনকে বলা হত জ্ঞান-বিজ্ঞানের জননী: বা মাদার অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস। কিন্তু আজ যেন জননী থেকে জাত সন্তানগণ: গণিত, যুক্তি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব সব বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। এদেরও সন্তান-সন্ততি জন্ম নিয়েছে। অর্থাৎ এককালের জননী বর্তমানের মাতামহীতে পরিণত হয়েছে এবং বৃদ্ধা মাতামহী জীবিত আছে কিনা তা যেমন সন্দেহের বিষয়, তেমনি যদিবা সে জীবিত থেকে থাকে তবু সে মৃতের মতোই কেবল ইতিহাসের বিষয়, বিশ্লেষণের বিষয়, তার এককালের সর্বধারিণী চরিত্রের জন্য স্মরণীয় এবং বর্তমানে করুণার বিষয়। দর্শন আজ আর পরাযুক্তি, মন, দেহ, সমাজ, রাষ্ট্র–সব কিছুর সম্যক এবং সামগ্রিক দৃষ্টি নয়। দর্শন আজ আর পরাযুক্তি, মন, দেহ, সমাজ, রাষ্ট্র–সব কিছুর সম্যক এবং সামগ্রিক দৃষ্টি নয়। দর্শন আর জীবনের অনিবার্য সহায়ক নয়। যেন দর্শন বাদেই ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের জীবন সম্ভব যেন ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র দর্শন বাদেই চলতে পারে। অবশ্য এটাও একটা দর্শন। কিন্তু এ দর্শনেরই যে আজ প্রাধান্য, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমার ধারণা দর্শনের এই দর্শন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর জন্য লোকসানজনক না হলেও এ দৃষ্টিভঙ্গী সঠিকভাবে আমাদের সকলের জন্য, আপামর সকল মানুষের জন্য লোকসানজনক। তাদের জন্য ক্ষতিকর। কারণ দর্শন বাদে মানুষ হয় না। দর্শন, মানুষ মাত্রেরই সচেতন এবং অগ্রসরমান জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য। সমাজের প্রাগ্রসর চিন্তাবিদ অর্থাৎ দার্শনিকদের দায়িত্ব হবে মানুষ, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সঠিক বিকাশ এবং অগ্রগতির জন্য প্রকৃষ্ট এবং সামগ্রিক দর্শনের কথা চিন্তা করা; সেই দর্শনকে পরিচিত করা, প্রতিষ্ঠা করা।

দর্শনের ক্ষেত্রে এই লোকসানজনক দৃষ্টিভঙ্গী যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হয়েছে, এমন মনে করলে ভুল হবে। এরও কার্যকারণ আছে। এরও দায়দায়িত্ব আছে। এ কার্যকারণ অনুসন্ধানের বিষয়।

মোট কথা ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের জীবনে-অর্থাৎ সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে দর্শনের মূল ভূমিকা কি হবে সেটি নির্দিষ্ট করার আজ প্রয়োজন আছে।

আর এই প্রয়োজনবোধেরই হয়ত স্বাক্ষর আছে বর্তমান দর্শন সম্মেলনের সংগঠকদের দর্শনের পরিধিকে নীতি এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বিস্তারিত করে দেবার প্রয়াসে।

কিন্তু নীতি এবং রাষ্ট্রের দর্শনের সংজ্ঞা, তার ভূত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের করণ কারণ নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে তাঁদের মুখপাত্র নির্বাচন যথোপযুক্ত হয়নি। এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা সম্পর্কে আপনাদের সকলের চেয়ে আমি অধিক সচেতন আর সেই অতিচেতনা আমাকে অধিকতর সংকুচিত করে দিচ্ছে। তাঁদের এমন নির্বাচনের কারণটি কি হতে পারে–এ প্রশ্ন, এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়ানো পর্যন্ত আমি মীমাংসা করতে পারিনি। হতে পারে, দর্শন সম্মেলনের একটি শাখায় সভাপতির পদটি স্থায়ী নয়, অস্থায়ী। এমন কি দুদিনকারও নয়। একদিনকার এবং এর সম্মান, সুযোগ এবং জাগতিক সুবিধা যথার্থ গুণীজনের জন্য মোটেই আকর্ষণীয় নয়। সংগঠকদের সংকটকে আমি বুঝতে পারি। তাঁরা বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। গুণীকে পাওয়া যায়নি বলে গুরুতর বিষয়টিকে তাঁরা বর্জন করতে চাননি। তাই নির্গুণের উপর দায়িত্ব বর্তেছে। নির্গুণের আর কোন গুণ না থাক 'হুকুম পালনের' একটা গুণ বোধ হয় থাকে।

* * *

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কি করে হয় কিংবা হয়েছে–এ দুটোই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কঠিন প্রশ্ন। মানুষ মানুষের জন্ম দেখেনি। সে অনুমান করে কেমন করে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হল। সে সম্পর্কে নানা তত্ত্ব। নানা অনুমান। মানুষ রাষ্ট্রবদ্ধ রূপে বাস করে। মানুষই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে তার আদি রাষ্ট্রীয় সংগঠনটি প্রত্যক্ষ করেনি। তাই রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রশ্নেও নানা তত্ত্ব। নানা অনুমান। কেউ বলেন: ঈশ্বর, আল্লা, গড–এঁরা মানুষের জন্য রাষ্ট্রকে তৈরী করে দিয়েছেন। কেউ বলেন: মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রকে তৈরী করেছে। কেউ বলেন: রাষ্ট্র মানুষেরই ন্যায় ক্রমবিবর্তনের ফল। কিন্তু এই আদি সৃষ্টির তত্ত্ব এবং অনুমানের কথা বাদ দিলে আধুনিক কালেও রাষ্ট্র কাকে বলে, রাষ্ট্র কিসের ভিত্তিতে তৈরী হয়, রাষ্ট্রের মূল উপাদান কি: ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র, না ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র–ইত্যকার প্রশ্ন আজো অমীমাংসিত, বিতর্কিত। এ বিতর্কের মীমাংসায় বড় অবদান তাত্ত্বিকের নয়, জীবনের; অনুমানের নয়, অভিজ্ঞতার। আর সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা। আদিকালের কথা বাদ দিয়ে আধুনিক কালের কথা ভাবলেও রাষ্ট্রের অভ্যুদয় নিলয় সাধারণ ঘটনা নয়। দিনাদিন রাষ্ট্রে উত্থান কিংবা পতন ঘটেনা। নানা কার্যকারণে দীর্ঘ সময়ের পটভূমিতে তা সংঘটিত হয়। সেদিক থেকে বাংলাদেশের আপামর মানুষের অপর কোন গর্বের বিষয় যদি নাও থাকে তবু তার এই গর্ববোধ আছে যে, সে একটি রাষ্ট্রের পতন এবং আর একটি রাষ্ট্রের পত্তন ঘটিয়েছে: একটি রাষ্ট্রের পতন এবং আর একটি রাষ্ট্রের উত্থানকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে তারা তা করেছে। চব্বিশ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের ভিত্তিতে তারা তা করেছে। কিন্তু কালের ইতিহাসে চব্বিশ বছর বিন্দুবৎও নয়। তাই পৃথিবী ব্যাপী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদদের মনকে বাংলাদেশের ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই আলোড়িত করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্র দর্শনের মৌল প্রশ্নে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার অবদান তাই তাৎপর্যপূর্ণ। এ অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য বিচার বিশ্লেষণের দাবী রাখে। ঘরে বাইরে এ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

একদিক থেকে দেখতে গেলে একটি রাষ্ট্রের বিভাগ কিংবা একটি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় ভূগোলে হয়ত কোন অসাধারণ বা বিপ্লবাত্মক ঘটনা নয়। কিন্তু পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর চিন্তার বিবর্তনে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা।

এই ঘটনা বিপ্লবাত্মক, এর রক্তাক্ত সংগ্রামের জন্যই নয়। এজন্যও নয় যে এই ঘটনা সৃষ্টির পেছনে রয়েছে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের জীবন দান। আধুনিক ইতিহাসের এক তুলনাহীন হত্যাযজ্ঞের পটভূমিতে জন্মলাভ করেছে বাংলাদেশ। শুধু এ কারণেই নয়। কিংবা এ কারণেও নয় যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এখানকার জনসাধারণের শ্রেণি বিন্যাসে আমূল কোন পরিবর্তন ঘটে গেছে কিংবা এর অর্থনীতিতে মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবু এ ঘটনা বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য বিপ্লবের তাৎপর্য বহন করে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী এবং আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে এই এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর চেতনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবশ্যই একটি বিপ্লবাত্মক রূপান্তরের সূচক। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যেমন কৃষক তেমনি মুসলমান। রাজনীতিক ভাবে তার এই ধর্মীয়, সম্প্রদায়গত পরিচয় ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্রাজ্যবাদের পরাধীনতার পর্যায়ে প্রধান নিয়ামকের কাজ করেছে। একথা ভারতীয় উপমহাদেশের অপর বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রেও সত্য। তার ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ আছে। সে কারণের বিশ্লেষণে এই উপলক্ষ্যে আমাদের না গেলেও চলবে। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণের চেতনার বিকাশে যে কথা গুরুত্বপূর্ণ সে হচ্ছে এই যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পরাধীনতা থেকে ঘোষিত মুক্তির পরবর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও ধর্মীয় রাষ্ট্র দর্শনই তার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেছে। তার ভাষা, সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা, রাজনীতিক অধিকার ভোগ–সর্বক্ষেত্রেরই শেষ নিয়ন্তা ছিল রাষ্ট্রীয় শাসকদের তরফ থেকে ধর্মের দোহাই। বাঙ্গালী বাংলা বলতে পারবেনা, কেননা সে মুসলমান। বাঙ্গালী অর্থনীতিক স্বাধীকার ভোগ করতে পারবেনা, কেননা সে মুসলমান। বাঙ্গালী রাজনীতিক অধিকার পাবেনা, কেননা সে মুসলমান। আধুনিক কালে শুধু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয়, রাষ্ট্র পরিচালনের ক্ষেত্রেও ধর্মকে এরূপ সচেতনভাবে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কেবল সাধারণভাবে নয়, মুসলিম রাষ্ট্র বলে পরিচিত মণ্ডলেও দেখা যায়না। বাংলাদেশের উদ্ভবের ক্রান্তি মুহূর্তে বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতীয় কার্যকারণের সম্মেলন অবশ্যই ঘটেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বিকাশের ক্ষেত্রে যে সত্য অনস্বীকার্য সে হচ্ছে: এই অঞ্চলের জনসাধারণ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শাসকদের আরোপিত ধর্মীয় নিগরকে ধারাবাহিকভাবে সেই ১৯৪৭ সাল থেকে তার জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের মাধ্যমে ছিন্ন করার প্রাণান্ত লড়াই করেছে। এই সংগ্রামের পরিণামেই বাংলাদেশের সৃষ্টি। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যে ইসলামকে ব্যবহার করেছিল তা মূলতঃ বাংলাদেশকে সামিল করার জন্য। পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও যে শাসকশ্রেণী ধর্মকে অধিকতর চতুর এবং নির্মমভাবে ব্যবহার করেছে সেও বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মধ্যে জবরদস্তীর মাধ্যমে রাখার জন্য। ধর্মের ভূমিকা মানুষের জীবনে এক কালে যাই থাকুকনা কেন, বাংলাদেশের ঘটনা আবার প্রমাণ করেছে যে, আধুনিককালে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র রক্ষা সম্ভব নয়। যারা যথার্থভাবে ধার্মিক তারা জানে ধর্মের প্রধান ভূমিকা ব্যক্তির মনে শান্তি দানের। এ ব্যক্তির

বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু যারা যথার্থরূপে ধার্মিক নয়, যারা শোষক এবং মানুষের স্বাভাবিক শান্তি এবং বিকাশে অবিশ্বাসী তারা ধর্মকে তাদের শোষণ বজায় রাখার শেষ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। শোষিত সাধারণ মানুষের মনে তারা ধর্মের মোহ দৃঢ়মূল করে রাখতে চায়। জনসাধারণকে তারা ধর্মের নামে সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে, অন্ধকার, অজ্ঞতা এবং বিভ্রান্তির বিবরে আটকে রাখার চেষ্টা করে। বাংলাদেশ বাস্তবভাবে ধর্মের সেই অপব্যবহারের ষড়যন্ত্রজালকে ছিন্ন করেছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন উপাদানের কি মূল্য–রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রীয় দর্শনের সে প্রশ্নের একটি দ্ব্যর্থহীন জবাব বাংলাদেশ দিয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং দর্শনের ক্ষেত্রে এ নিশ্চয়ই তার এক বিশিষ্ট অবদান। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র–বাংলাদেশের আজ সার্বজনীন ধ্বনি। সেই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-এর ন্যায় এ ধ্বনি আজ ব্যাপক এবং সার্বিক। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র–এ ধ্বনিকে বলতে পারি আমরা: 'শ্লোগান অব দি ডে'। এ শ্লোগান দিয়ে রাস্তার দিক নির্দেশক সাইনবোর্ড তৈরী হচ্ছে। এ শ্লোগানের ব্যাখ্যা নিয়ে আমাদের সোচ্চার ছাত্র এবং যুব সমাজ এবং রাজনীতিক দল সমূহ পরস্পরের রক্তপাত ঘটাচ্ছে: প্রত্যেকে নিজেকে এই ধ্বনির একমাত্র রক্ষক বলে দাবী করছে এবং অপরকে তার বিরোধী এবং ভক্ষক বলে অভিযুক্ত করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধ্বনি মূলনীতি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন আমরা কেবল রোজার মাসেই কাজের সময় অর্দ্ধেক করার দাবী করিনে এবং দুই ঈদে সাতদিন করে চৌদ্দ দিন কাজের বিরাম দিইনে। এখন আমরা পূজো আর বড়দিনের অনুষ্ঠানকেও মান্য করি। বেতার-টেলিভিশন এখন কেবল কোরান তেলাওয়াত দিয়ে শুরু করিনে। গীতা এবং বাইবেল পাঠকেও আমরা তার অঙ্গীভূত করেছি। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে তাই দাঁড়িয়েছে, ধর্মে ধর্মে নিরপেক্ষতা। এবং মোটকথা: ধর্মময়তা। ধর্মনিরপেক্ষতার এও এক ব্যাখ্যা। এর অর্থ এই যে, আমরা এখনো দ্বিধাহীনভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি যে ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তির বিশ্বাসের ব্যাপার। এবং যেহেতু সে বিশ্বাসের ব্যাপার তাই ধর্ম কেবল একটি, দুটি, তিনটি নয়–তিনশ'টি হতে পারে। তার চেয়েও অধিক হতে পারে। রাষ্ট্র হচ্ছে সমষ্টিগত ব্যাপার। ব্যক্তির পারলৌকিক বিশ্বাস এবং সমষ্টির জাগতিক কর্মকাণ্ড একাকার করে দিলে পরিণামে মঙ্গল না ব্যক্তির, না সমষ্টির। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই উপলব্ধি হয়তো আমাদের বাকি আছে। কিন্তু যেটা জোর দেবার ব্যাপার সে হচ্ছে এই যে, জনতার চিন্তার অর্গল মুক্ত হয়েছে। নতুন অভিজ্ঞতায় নতুনতর সত্য সে উপলব্ধি করবে। কিন্তু পুরোন গুহায় তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যে কারুর পক্ষেই দুঃসাধ্য হবে। যে কথা 'ধর্মনিরপেক্ষতার' ক্ষেত্রেও সত্য, সেকথা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেও সত্য। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গণ্ডীকে অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদের ধ্বনি তুলেছে। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা এমন জাতীয়তাবাদকে আমাদের জীবনে এবং চেতনার প্রতিষ্ঠিত করছি যাতে আমরা সকলে নিজের স্বার্থ না দেখে জাতির স্বার্থই অগ্রে বিবেচনা করি। কিংবা গণতন্ত্র বলতে আমরা নিজের অধিকার ব্যতীত অপরের অধিকারকে স্বীকার করি। এবং সমাজতন্ত্র বলতে সকল অর্থনীতিক–অসঙ্গতি-মুক্ত ব্যবস্থা আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি কিংবা সে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ-আচরণ আমরা পালন করছি। বিবেচনা করলে এ কথা সত্য যে, এই

নীতিসমূহ এখনো ধ্বনি মাত্র, এখনও আওয়াজ। এরা এখনো ভাব। এখনো যথার্থ বস্তু বা বাস্তব নয়। কিন্তু ভাব যেমন বাস্তব অবস্থা থেকেই তৈরী হয়, তেমনি বাস্তব অবস্থাকে সে তৈরীও করে। বস্তুবাদে যেমন ভাব তৈরী হতে পারেনা, তেমনি ভাববাদেও বস্তু এবং বাস্তব অবস্থা পরিবর্তিত হতে পারেনা। বিশেষ করে মানুষের রাষ্ট্রীয় বস্তু, মানুষের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সত্তা। তাই একদিক থেকে দেখতে গেলে বস্তুর পরিবর্তনের প্রাথমিক প্রয়োজন ভাবের। কারণ মানুষই বস্তুকে এবং সমাজকে পরিবর্তিত করে। এবং মানুষ ভাব দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই ভাবের যেখানে উদ্ভব ঘটেছে, বস্তুর পরিবর্তন সেখানে অনিবার্য।

ভাবের ক্ষেত্রে অবশ্য পর্যায়ক্রমে আছে। উত্তম অধম আছে। উত্তম ভাব অধমের চেয়ে, সংকীর্ণতরের চেয়ে, ক্রমবিকাশমান মানুষের সমাজের জন্য শ্রেয়ঃ আমি হরিণ বংশীয় কিংবা সিংহ বংশীয়। এর চেয়ে উত্তম চেতনা হচ্ছে, আমি মুসলমান বা হিন্দু বা বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান। কিন্তু তার চেয়েও উত্তম হচ্ছে আমি বাঙ্গালী বা ইংরেজ বা ফরাসীঃ কিংবা আমি এশিয়, আফ্রিকীয় বা ইউরোপীয়। এবং তার চেয়ে উত্তম হচ্ছে আমি শ্রমিক বা কৃষক বা শ্রমজীবীঃ আমি সাম্যবাদী। রাষ্ট্র হিসাবে হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু রাষ্ট্র-নির্বিশেষে আমি একদিন সাম্যবাদী এবং মানুষের পর্যায়ে উন্নীত হব। এই পরিচয়গুলোর কোনটিকে উত্তম বা অধম বলা কাউকে বিকাশের পর্যায় নির্বিশেষে নাকচ করা বা গ্রহণ করা নয়। এদের উত্তমতা মানুষের সমাজের বিকাশের ধারাবাহিক পর্যায়ের সূচক। মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষে উন্নীত হওয়ার জন্যই বিকশিত হচ্ছে। তার পথের বাধা, সব অসঙ্গতি, অন্তরায়কে অতিক্রম করে করে সে অগ্রসর হচ্ছে। গোষ্ঠী থেকে সম্প্রদায়ে এবং ধর্মে, ধর্ম থেকে জাতিতে এবং রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র থেকে মহারাষ্ট্রে এবং শ্রমের ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়া, সাম্যবাদী সমাজ তৈরী করা, মানুষের ক্রমবিকাশের, 'পূর্ণ মানুষের' লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার স্মারক। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ধ্বনির সার্বজনীনতা প্রাপ্তি অবশ্যই তার চিন্তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণের সূচক। এর পেছনে ফিরে যাওয়া যে কারুর পক্ষেই দুঃসাধ্য। ইতিহাসকে পেছনে নেওয়া যায়না। চেতনালব্ধ মানুষকেও অ-চেতনার গুহায় নিক্ষেপ করা চলে না।

* * *

এই উত্তরণের ধারাটি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? কে তাকে সৃষ্টি করেছে? সাধারণ মানুষ তথা জনতা না বীর পুরুষ তথা নেতা? এ প্রশ্ন বর্তমানে বাংলাদেশের বুদ্ধির জগতে একটি বিশেষ আলোচিত প্রশ্ন। প্রশ্নটি হচ্ছে জনতা এবং জননেতার পারস্পরিক ভূমিকার প্রশ্ন। ইতিহাসকে কে সৃষ্টি করে? কে অগ্রসর করে নিয়ে চলে সমাজ, জাতি এবং রাষ্ট্রকে? জনতা না নেতা?

কে জনতা? কে নেতা? ব্যক্তি হচ্ছে নেতা। সমষ্টি হচ্ছে জনতা। দুটি সত্তাই সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্য। জনতার আবশ্যক নেতার, পরিচালকের, সংগঠকের। নেতার আবশ্যক জনতার–যাকে সে নেতৃত্ব দিবে, যে তার শক্তির উৎস। জনতা এবং নেতা উভয়ই যেমন সত্য– তেমনি সত্য এদের উভয়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এদিক থেকে দেখলে জনতা এবং নেতার ভূমিকার প্রশ্নটি কোন সমস্যা বলে বিবেচিত হতে পারে না। কিন্তু

উভয়ের মধ্যে বোধ এবং সম্পর্কের যে ভারসাম্য সমাজ ও রাষ্ট্রের চালক শক্তি হিসাবে কাজ করে সেই সঠিক বোধ এবং ভারসাম্য সমাজ জীবনে দুর্লভ ব্যাপার।

এই উভয় সত্তার সম্পর্কে ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার একটি বড় কারণ, ব্যক্তিনেতা জনতাকে নেতৃত্বদানের দক্ষতাকে ক্রমান্বয়ে বিবেচনা করতে থাকে জনতাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলা করার শক্তি হিসাবে। এই বোধ থেকে ক্রমান্বয়ে জন্ম নেয় জনতার উপর ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ একচেটিয়া এবং স্থায়ী করে রাখার প্রবণতা। এবং নেতৃত্বকে স্থায়ী করে রাখার জন্য শুরু হয় নেতার 'ইমেজ' তৈরী থেকে আরম্ভ করে নানা কৃত্রিম মোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। এবং তখন থেকে শুরু হয় ঘটনা এবং ইতিহাসের বিকৃতি। নেতা যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন তাঁর স্তাবক, অনুগত এবং বাধ্যদের তেমন ইতিহাস রচনার হুকুম দেন। এই বিচ্যুতি প্রধানতঃ ঘটে সফল জননেতার রাষ্ট্রীয় শাসনাধিকার লাভ করার পর। এই বিকার অতীতকালে একনায়কত্ব বা স্বৈরতন্ত্রের রূপ ধারণ করত। আধুনিক কালেও এ বিকার যে কোন রাষ্ট্রেই কম বেশী প্রত্যক্ষ করা যায়।

জনতার মধ্যে ব্যক্তি যেমন চরিত্রগতভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়, যে ব্যক্তি সেই জনতাকে পরিচালিত করে তার চরিত্রও রূপান্তর লাভ করে। একটা জন-সমষ্টি আমার কথায় উঠছে, বসছেঃ জীবন দিচ্ছে, ডাইনে যাচ্ছে, বাঁয়ে যাচ্ছে। এ যখন আমি দেখি তখন আমার নিজের শক্তি সম্পর্কে অতি আত্মবিশ্বাসের একটা ভাব আমার মধ্যে জন্ম নিতে থাকে। তখন থেকে আমি বিস্মৃত হতে থাকিঃ আমি জনতার নেতা, আমি জনতার সৃষ্টি। তখন থেকে আমি মনে করি, আমি ইতিহাসকে গড়তে পারি, ভাঙ্গতে পারি, রুখতে পারি। তাকে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাতে পারি। নেতার চরিত্রে আত্মবিশ্বাসের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসের আধিক্য আত্মম্ভরিতায় পরিণত হয়ে তাকে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের জন্য ক্ষতিকর করে তোলে। এর আধিক্য নেতাকে রাজা ক্যানুটে, ষোড়শ লুইতে এবং হিটলারে কিংবা পাকিস্তানের জিন্নাহতে কিংবা আইউব খানে পরিণত করে। কেবল সমাজের শোষক শ্রেণির শাসকদের মধ্যেই যে এই বিকার দেখা যায়, তা নয়। এমন কি সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতার মধ্যেও যে ধীরে ধীরে এই আত্মবিশ্বাসের আধিক্য এবং অভ্রান্তির বিকাল ক্ষতিকর আকার ধারণ করতে পারে স্টালিন চরিত্রের পরিণাম তাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। কাজেই জনতা এবং নেতার সম্পর্ক এবং ভারসাম্যের প্রশ্ন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বিপ্লব বা আন্দোলনের সফলতার পরে রাষ্ট্র যন্ত্র যখন দল বা নেতার হস্তগত হয় তখন নেতা যে কেবল একটি আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসনের, প্রচারের, দমনের সর্বপ্রকার বিস্ময়কর কৌশলের অধিকারী হন এবং এই ক্ষমতা থেকে যে তাঁর মনে এক অমিত শক্তি বোধের সৃষ্টি হয় তাই নয়। এর অপর একটি দিক আছে, যে দিকটি নেতার নিজের জন্যও ক্ষতিকর। নেতা একদিকে নিজেকে যত শক্তিধর এবং স্বাধীন বলে মনে করতে থাকেন অপর দিকে তিনি তত পরাধীন, বন্দী এবং জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেন। বিষয়টি পরস্পর বিরোধী বলে বোধ হলেও বাস্তবে সত্য। শক্তি স্তাবকের জন্ম দেয়। যে-শক্তিধর, যে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কিংবা যে বিস্ময়কর বাগ্মীতা, সাংগঠনী প্রজ্ঞা এবং সাহসের অধিকারী তেমন চরিত্র, তেমন নেতার উপর-বিশেষ করে রাষ্ট্রযন্ত্র তার করায়ত্ত হওয়ার পর থেকে, প্রশংসা এবং তোষামোদের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে। তখন স্বর্গে মর্ত্যে যা

কিছু ঘটে তা নেতার কারণে ঘটে। রাষ্ট্রে যা কিছু মহৎ, যা কিছু বৃহৎ-সব কিছুর মূল নেতা: এই স্তুতি শত সহস্র লক্ষ মুখে ঘোষিত হতে থাকে। প্রশংসার উত্তেজক যে কোন মাদক দ্রব্যের চেয়ে তেজী, অদম্য। প্রতিবাদহীন এবং দিনের পর দিন বিরামহীনভাবে বর্ষিত স্তুতি এবং প্রশংসার মাদকে মত্ত না হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে একান্তই বিরল। বস্তুতঃ নেতার চারিদিকে ক্রমে স্তাবক এবং বিভ্রান্তিকারীদের এক দুর্ভেদ্য সুউচ্চ প্রাচীর সৃষ্টি হয়ে যায়। এই প্রাচীরের মধ্যে নেতা বন্দী হয়ে পড়েন। বাস্তব সত্য থেকে তিনি ক্রমাধিক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দূরের দৃষ্টিতে তাঁকে এই প্রাচীরের মধ্যে অসহায় বলে বিবেচনা করাই সঙ্গত। তাঁর বন্দীত্বের একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, নেতা নিজেকে বন্দী মনে না করে নিজেকে রাজা বলে বিবেচনা করেন। এই রাজার মনস্তুষ্টির জন্য স্তাবক এবং অনুগত এবং বাধ্যের দল সদা প্রস্তুত। নেতার নামে তারা সকল পথ ঘাট, বাজার বন্দর গ্রামগঞ্জ নদী সাগর পাহাড়কে অভিহিত করতে থাকে। নেতা যদি বলেন: আজ আকাশটা সুন্দর, অমনি স্তাবক এবং অনুগতের দেয়ালে তার সজোর প্রতিধ্বনি জাগে; আহা! কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি সুন্দর!!! নেতা যদি জিজ্ঞেস করেন, আমার শাসন কেমন চলছে? অমনি সহস্র মুখে জবাব আসে, এমন হয় না! এমন হয় না, নেতা আদেশ দেন, সবাইকে কাজ করতে হবে সারাদিন এবং সারা রাত। সবাইকে ত্যাগ করতে হবে। তখন সমস্বরে জবাব আসে, তা আর বলতে! তা আর বলতে! যদি তিনি খোঁজ করেন, সবাই ঠিক মত কাজ করছ তো? অমনি দুর্ভেদ্য সে দেয়াল জবাব দেয়: অবশ্য! অবশ্য! এবং নিজেদের জান বাঁচিয়ে অপরের জানের বিনিময়ে তারা নথিপত্র তৈরী করে নেতার সামনে হাজির করে: এই দেখুন যারা অবিশ্বাসী, যারা বিরোধী, যারা রাষ্ট্রের শত্রু, যারা সাবভারসিভ তাদের শূলে চড়ান হয়েছে, কারাগারে বন্দী করা হয়েছে, কাজ থেকে ছাটাই করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার অধিক বর্ণনাদান নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের পর্যবেক্ষক মাত্রের নিকটই এ প্রক্রিয়া পরিচিত। খলিফা হারুনর রশীদের কালটা অনেক আগের কাল। তাতে এত জটিলতা ছিল না। তবু তাঁর নামে প্রচারিত উপাখ্যান থেকে মনে হয় হারুনর রশীদ বাদশাহ এই বন্দীত্বের বিষয়ে কিছুট যেন সচেতন ছিলেন। তাই তিনি রাত্রির অন্ধকারে ছদ্মবেশে সেই বন্দীত্বের প্রাচীর টপকে তার নগর রাজধানীর জনতার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়ে আর কিছু না হোক নিজের স্বাধীনতা কিছু বোধ করতে চাইতেন। কিন্তু আজকের রাজার নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। আজ যে রাজা যত বড়, তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তত অধিক। তাই কারাগার থেকে পলায়ন আজ তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এ বন্দীত্ব তার আমৃত্যু বন্দীত্ব। যথার্থই সে অসহায়। এমন বীরের এমন বন্দীত্ব শুধু যে বিস্ময়কর এবং সত্য তাই নয়। এ বন্দীত্ব সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষ করে একটি সমাজতান্ত্রিক কিংবা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য, যে-রাষ্ট্রের বিকাশের জন্য প্রয়োজন শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ এবং বাস্তব ভিত্তিক সম্পর্কের। মিথ্যা এবং বিরোধের সম্পর্কের নয়।

এই বিকার পরিহারের অভ্রান্ত কোন উপায় এখনো আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এর একমাত্র পথ হচ্ছে জনতার চেতনার বৃদ্ধি। আর এই চেতনাবৃদ্ধির উপায় হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং সমাজ জীবনের সর্বত্র গণতান্ত্রিক অধিকারের যথার্থ প্রসার এবং প্রয়োগ। শিক্ষাকে সার্বজনীন করে দেওয়া। জনতার মনে ক্রমাধিক পরিমাণে এবং সার্বিকভাবে কারিগরী এবং মানবিক জ্ঞানের মাধ্যমে এমন চেতনার সৃষ্টি করা যেন জনতা অর্থাৎ জনসমষ্টির প্রতিটি ব্যক্তি একদিকে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন এবং অপর দিকে আত্মশক্তির

বিশ্বাস সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে; যেন জনতা মনে করতে পারে, নেতা কিংবা নেতৃত্ব এবং সরকার বা সংগঠন যেমন তার প্রয়োজন তেমনি নেতা, নেতৃত্ব এবং সরকারের স্রষ্টা সে নিজে। এবং কোন নেতাই জনতার চেয়ে বড় নয়; কোন নেতাই অপরিহার্য কিংবা অপূরণীয় নয়। নেতার বদলে নেতাকে সে সৃষ্টি করতে পারে। নেতার সে জনক। ব্যক্তি নেতা কিংবা কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সরকার ক্ষণস্থায়ী। তার ভ্রান্তি আছে। তার বার্দ্ধক্য আছে। তার মৃত্যু আছে। কিন্তু জনতা তথা জনসমষ্টির মৃত্যু নেই।

মোট কথা মানুষ তথা জনতাই ইতিহাস তৈরী করা। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ন্যায় আমরা ইচ্ছামত রাষ্ট্র তৈরী করতে না পারলেও মানুষই রাষ্ট্র তৈরি করে। কিন্তু রাষ্ট্র একটি জটিল সংস্থা। নেতা এবং নীতি–উভয়েরই একটা চেতনা থাকা দরকার যে রাষ্ট্রে বিকাশেরও নিয়ম-কানুন আছে। সে নিয়ম ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অতিক্রম করে যায়, সে ব্যক্তি যতো বৃহৎ-ই হোক না কেন। তা না হলে বৃহৎ ব্যক্তি বা বীর যদি ইতিহাসের একমাত্র নিয়ন্তা হত তাহলে বীরদের ইচ্ছা এবং অনিচ্ছাকে অতিক্রম করে মানুষ, তার সমাজ ও রাষ্ট্র অগ্রসর হয়ে বর্তমান মুহূর্তটিতে এসে উপস্থিত হতে পারত না। তাহলে জিন্নাহ সাহেবের হুকুমই আমাদের জীবনের শেষ নিয়ামক হত। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের মোহমুদগরই আমাদের সকল চিন্তা এবং চেতনাকে রুদ্ধ করে দিত এবং ইয়াহিয়া খানের মদালস রক্তচক্ষু আর মারণাস্ত্র আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিত।

ইতিহাসকে আমরা সাধারণ মানুষেরা কেবল সৃষ্টিই করি না। আমাদের এ চেতনাও থাকা আবশ্যক যে সৃষ্ট-ইতিহাস আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জও বটে। ইতিহাসের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানুষের জন্য ক্রমাধিক পরিমাণে সঙ্গতিপূর্ণ স্বাভাবিক এবং মানবিক জীবন: মানবিক সমাজ রাষ্ট্র, অর্থনীতিক ব্যবস্থা এবং সভ্যতাকে সৃষ্টি করার। অতীত থেকে যে নেতা, যে শ্রেণি, যে দল যত অধিক শিক্ষা গ্রহণ করে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে সেই শ্রেণি এবং সেই দল তত ইতিহাসের বিকাশের সহায়ক শক্তি বলে পরিগণিত হবে। আর যে শ্রেণি, যে দল, যে নেতা, এ শিক্ষা গ্রহণে যত ব্যর্থ হবে, সে তত সেই বিকাশের প্রতিবন্ধক হিসাবে পরিগণিত হবে। কিন্তু কারুর প্রতিরোধ এবং প্রতিবন্ধকতাই মানুষের বিকাশকে রুদ্ধ করে রাখতে পারবে না।

* * *

বাঙ্গালী ইতিহাস তৈরী করেছে। কিন্তু ইতিহাস বাংলাদেশে উপনীত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। তার দাবী অতীতের চেয়ে বৃহত্তর এবং জটিলতর। এ দাবী পূরণের দায়িত্ব কেবল একজন নেতার নয়: সকল বাঙ্গালীর: বাংলার শ্রমজীবী জনতার। অতীতের জন্য গর্ব এবং গৌরববোধ যদি আমাদের থাকে, বর্তমানের এ দায়িত্ববোধও যেন আমাদের সকলের মধ্যে জাগ্রত হয়: বর্তমানের সংকটকালে সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে এটুকুই মাত্র আমার কামনা।

॥ ১৯৭৪ ॥

নানা কথা এবং নানা কথার পরের কথা

সরদার ফজলুল করিম, প্যাপিরাস, ১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান

২৫শে মার্চ ৭১, রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আক্রমণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিহত হয় অগণিত ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং সাধারণ মানুষ। এই শহীদদের অন্যতম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এবং জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। এই রাতেই নিহত হয়েছিলেন দর্শনের অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব।

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন শহীদ মিনারের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের যে বাসভবনের নীচের তলাতে তিনি সপরিবারে থাকতেন, তার বাইরে সিঁড়ির কাছে। এইখানে গুলি করে সেনাবাহিনী হত্যা করেছিল পরিসংখ্যানের ড. মনিরুজ্জামান এবং তাঁর আত্মীয়জনদের মধ্যে আরো তিনজনকে।

সে এক মর্মান্তিক কাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শী আত্মীয়স্বজনদের কাছে সে কাহিনী শুনতে গেলে আজো যে কারুর হৃদয় অবর্ণনীয় বেদনায় মুষড়ে পড়ে।

আমার একদিকে সংকোচ, অপরদিকে বহুদিনের আগ্রহ ছিল অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার জীবনের শেষ মুহূর্তটির কথা তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী গুহঠাকুরতার কাছ থেকে শুনি। জ্যোতির্ময় বাবুর জীবনের সেই মর্মান্তিক এবং অনুপ্রেরণা কাহিনী শহীদ স্মরণীতে কিছু যে কোথাও কোথাও না এসেছে, তা নয়। তবু জ্যোতির্ময় বাবুর কথা যত শুনছি, তত মনে হচ্ছে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার জীবনকাহিনী বাংলাদেশের বিস্তারিতভাবে কোথাও তার কোন সহযোগি বা আত্মজনের হাতে লিখিত এবং প্রকাশিত হয়নি। অথচ এ কাহিনী যত বিস্তারিতভাবে সম্ভব লিপিবদ্ধ করা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অপরিহার্য। বস্তুত: শুধু জ্যোতির্ময় বাবুর জীবনের শেষ মুহূর্তের জীবনদানের কাহিনী নয়; এই নিবেদিত প্রাণ, সামাজিক রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং আদর্শবাদী শিক্ষক ও ব্যক্তিত্বের উপর একখানি স্মারকগ্রন্থ রচনা করা অত্যাবশ্যক। আর এমন কাজে যত বিলম্ব ঘটবে, তত জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার জীবন ও চিন্তা-ভাবনা বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। সংকোচের দিক আমার এই যে, এমন এক করুণ ও হৃদয়বিদারক কাহিনী যে, এর কথা আত্মজনের কাছে জিজ্ঞেস করতে মনে বাঁধা। তবু সে সংকোচ অতিক্রম করে ২৪শে মার্চ ৮৫ তারিখে সন্ধ্যায় আমি গিয়েছিলাম মিসেস বাসন্তী গুহঠাকুরতার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাসভবনে।

এ বাড়িটি অবশ্য নতুন তৈরি হয়েছে। আগে জগন্নাথ হলের প্রভোস্টরা বা পরবর্তীকালে সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্টরা যে পুরোন দোতলা বাড়িটিতে থাকতেন, সেটি ভেঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য এখন বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি করা হয়েছে। এই বাড়িতেই এক সময়ে, সেই দেশ বিভাগের আগে, থাকতেন প্রখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য। তিনিও তখন জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ছিলেন।

মিসেস বাসন্তী গুহঠাকুরতা নিজেও একজন ব্যক্তিত্বময়ী শিক্ষাবিদ। ঢাকার গেণ্ডারিয়া মনিজা রহমান বালিকা হাইস্কুলের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং তার প্রধান

শিক্ষয়িত্রী। যে বাড়িটিতে নিজের একমাত্র সন্তান কন্যা মেঘনাকে নিয়ে থাকছেন, তার বিপরীতেই সেই নিদারুণ ঘটনার স্মৃতিবহ ভবন। এখানে এই ২৫শে মার্চের কথা বলতে গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি বলেন: ঐ তো ঐ জায়গাটিতে, আমাদের বারান্দার এ পাশটাতে আমার স্বামী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে পাকিস্তানের মিলিটারী গুলি করেছিল। একটা গুলি লেগেছিল গলায়। আর একটা গুলি পিঠে। এই গুলি খেয়ে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনি মারা যাননি। তারপরেও তিনি আহত হয়ে, বেঁচে ছিলেন, ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯শে মার্চ পর্যন্ত। মারা গেলেন ৩০শে মার্চ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

এই কাহিনী শোনার জন্যই গিয়েছিলাম বাসন্তী দেবীর বাসায়। কালবৈশাখীর আকস্মিক ঝড় তখন মাত্র থেমেছে। এই ঝড় জলের মধ্যেও যে আমি তার বাসায় গিয়েছি, এজন্য তিনি বেশ খুশি হয়েছেন এবং বিনা দ্বিধায় প্রায় দু'ঘন্টা ধরে জ্যোতির্ময় বাবুর জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। কন্যা মেঘনা ২৫শে মার্চের সময়তেও বেশ সচেতন ছিল। সে তখন কিশোরী। তবু জ্যোতির্ময় বাবু আর বাসন্তী দেবীর উদার জ্ঞানময় পরিবেশে লালিত স্নেহাস্পদ। সপ্রতিভ, বুদ্ধিমতী এবং সচেতন। তখন সে পড়ত স্কুল, ক্লাশ টেনে-এ হলিক্রস স্কুলে। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিভাগের একজন লেকচারার হন।

মা এবং মেয়ে, দু'জনেই বেশ আগ্রহের সঙ্গে জ্যোতির্ময় বাবু সম্পর্কে নানা স্মৃতির কথা উল্লেখ করলেন।

আমি ওদের বাসায় ঢুকেই যে কথাটি বলেছিলাম তার উপর জোর দিয়ে মেয়ে মেঘনাকে আবার বললাম: তোমাকে এই কাজটি করতে হবে। তোমাকে বাবার উপর একটি স্মারক পত্র তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি তোমার বাবার রচনা যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি কর। 'আমার বাবার কথা' বলে তুমি নিজে একটি স্মৃতিকথা লিখ। তাতে তুমি বলো বাবার সঙ্গে তোমার আলাপ-আলোচনা-তর্ক-বিতর্কের যতো কথা আর ঘটনা তোমার স্মরণে যা আসে তার সব।

নিজের ব্যাপার বলে একটু সঙ্কোচবোধ করল। তাকে কাটিয়ে দেবার জন্য আমি জোর দিয়ে বললাম: এতে ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। তোমার বাবা তো আজ আমাদের এই দেশে ও কালের অন্যতম অমর শহীদ। তার কথা বর্তমানকে সাধ্যমত জানানো তো আমাদের দায়িত্ব। আর এ কাজ তুমি ছাড়া অপর আর কে পারবে।

আমার প্রস্তাবটি বাসন্তী দেবীরও ভাল লাগল। তিনি যথার্থই উৎসাহিত হয়ে বললেন: খুব ভাল কথা। লেখনা তুই যা তোর মনে আসে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন: 'তর্কের কথা আর বলবেন না। বাপেতে মেয়েতে আন্দোলনের সেই ফেব্রুয়ারি-মার্চ প্রত্যেক দিন কমপিটিশন হত। বাবা জিজ্ঞেস করতো, বলতো মেঘনা, আগামীকাল এই ঘটনার কি শিরোনাম হবে, কোন কাগজে? বাবা বলত এক শিরোনাম মেয়ে দিত আর এক শিরোনাম। ওর বাবা ছিলেন সতর্ক-সংযত মানুষ। ২৫শে মার্চ যত এগিয়ে আসছিল রাজনীতিক মীমাংসার সম্ভাবনা যত অনিশ্চিত হয়ে আসছিল, তত তিনি উদ্বেগ বোধ করছিলেন। মেয়েকে জিজ্ঞেস করতেন: কিরে কি মনে করিস? শেখ মুজিব কি বিজয়ী হবেন? মেয়ে বলত: দেখ বাবা শেখ মুজিব জয়ী হবেনই। বাবা মাথা নেড়ে বলতেন: ব্যাপারটা অত সোজা নয় রে।

স্বার্থবাদী পাকিস্তানী মহল কি এত সহজে ছেড়ে দিবে? আমার রাজনৈতিক বোধে তো তা বলে না। বড় কঠিন সময় বোধ হয় আসছে...।'

২৫শে মার্চের কথা যখন এসে পড়ল তখন স্বাভাবিকভাবে আমি বাসন্তী দেবীকে প্রশ্ন করলাম: জ্যোতির্ময়দা জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। তার জন্য বিপদের আশংকা তো আপনাদের কারো অজানা ছিল না। সেদিন একটু কি নিরাপদ স্থানে যাওয়া যেত না?

জানি এমন প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না। সে আর এক যুগ, আর এক পরিস্থিতি। আজ নিরাপত্তার কথা তুলে 'যদি একটু নিরাপদে যেতেন' 'কেন গেলেন না- এসব কথা বলা সহজ। কিন্তু তাতে সেদিনের সেই পরিবেশ আর পরিস্থিতি তো প্রকাশিত হয় না। বাঙ্গালিমাত্র সেদিন বিপন্ন। কে কোথায় গিয়ে নিরাপদ হবে?

কিন্তু আসলে ৭ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যায়টি কোন বিপদবোধের সময়ই ছিল না। সে ছিল প্রতিদিন আর প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামের জীবন। চারদিকে রক্ত ঝরছে। জ্যোতির্ময় বাবু সে রক্ত দেখেছেন। বাসন্তী দেবী বললেন: 'আসলে তখন এমনভাবে চিন্তা করার তো কথা আসেনি। বিজয় তো আমাদের সামনে। যে ছেলেরা ২১শে ফেব্রুয়ারির পরে আমার স্বামীর সতর্ক উপদেশেই হল ছেড়ে দিয়েছিল, তারা তো ২৩ তারিখে সকাল থেকেই আবার হলে এসে জড়ো হতে লাগল। একথা ঠিক যে, কোন ফয়সালা হচ্ছে না। ২৫ তারিখের আগেও হলে নানা গণ্ডগোল হয়েছে। হলের ছেলেদের ওপর ইউওটিসি'র পক্ষ থেকে হলের মাঠে তাদের প্যারেড করা, না করা নিয়ে হামলা হয়েছে। আত্মীয়স্বজন ২৫ তারিখে খবরও পাঠিয়েছিলেন আমাদের গেণ্ডারিয়ার ওদিকে কোথাও যেতে।'

বাসন্তী দেবী সেই ২৫শে মার্চের রাতের দিকে চোখ রেখে বলতে লাগলেন: কিন্তু আমার স্বামী বললেন: আমি হলের দায়িত্ব ছেড়ে যাই কি করে? ভাইস চ্যান্সেলার বিচারপতি চৌধুরীও ঢাকাতে নেই। তিনি নিজে অনুরোধ করে আমাকে ন'মাস আগে প্রভোস্টর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়েছেন। আজ ছেলেরা সব আবার হলে ফিরে আসছে। আমি তাদের হল ছেড়ে যেতে বলতে পারি না। তাদের ছেড়ে আমি যাবো কি করে? না বাসন্তী তা হয় না। যা হবার তা হবে।'

বাসন্তী দেবী বললেন: তারপরই তিনি নিজের স্বভাবগত পরিহাসের ভঙ্গীতে তাঁর প্রিয় গানের সেই কলিটি গেয়ে উঠলেন: **আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।**

এই গানের কলিটি শুনে আমি চমকে উঠলাম। জ্যোতির্ময় বাবুর প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি নাকি একটি পদ। তিনি নাকি প্রায়ই এই গানটি গাইতেন। ফেব্রুয়ারি মাসে যখন হলের ছেলেরা বেশ সমারোহের সঙ্গে সরস্বতী পূজা করেছিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল তখন জ্যোতির্ময় বাবু গায়কদের একজনকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর প্রিয় এই গানটি অনুষ্ঠানে গাইতে।

এই গানের উল্লেখে আমি যেন আমার মনের বহুদিনের একটি প্রশ্নের জবাব পেলাম। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছাত্রদের প্রিয় এবং দক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিলেত থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে এসেছিলেন। কোলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে তাঁর নিজের আত্মীয় স্বজন ছিলেন, যারা দেশ বিভাগের পরে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ক্রমঅবনতির কারণে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মানুষ নিজের জীবনের নিরাপত্তাকে

সবচাইতে মূল্যবান মনে করে। তাই স্বাভাবিক। আর ভারত উপমহাদেশের আধুনিক ইতিহাসের এই এক পরিহাস, মানুষ মানুষকে ভাইয়ের বদলে শত্রুর অধিক বলে গণ্য করতে পারে। এই পর্যায়ে বিভিন্ন মুহূর্তে দেখা গেছে ব্যক্তি তার জীবনের নিরাপত্তা প্রতিবেশীর চাইতে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক বোধ করে: হিন্দু হিন্দু নিকট, মুসলমান মুসলমানের নিকট। অথচ এ বোধ যে কত অযৌক্তিক আর ভিত্তিহীন তা এই আধুনিক কালে বারে বারেই তো প্রমাণিত হয়েছে। এই 'পূর্ব-পাকিস্তানে' যে 'পূর্ব-পাকিস্তন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ধর্মগত সাম্প্রদায়িক বোধ থেকে সেই পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলমানই তো মুসলমানকে হত্যা করেছে নৃশংসতমভাবে।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম এর আগের কথা। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাগের সময় এবং পরে এপারে ওপারে দাঙ্গা হয়েছে। কার কারণে কোনটা সে প্রশ্ন অনর্থক। কিন্তু দাঙ্গা বাধলেই এপারের হিন্দু সম্প্রদায় নিজের জীবনকে বিপন্ন বোধ করেছে। ওপারের মুসলমান নিজের জীবনকে বিপন্ন বোধ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ছাড়া শিক্ষিত অবস্থাপন্ন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষও নিজের জন্মভূমি, বাসস্থান, জীবিকা, অবস্থান পরিত্যাগ করে এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়েছে।

তাই অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষিত, দক্ষ অধ্যাপক হয়ে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতিতে যদি পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে যেতেন সেটা অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু তিনি যাননি। কেন তিনি যাননি?

জ্যোতির্ময় বাবু পূর্ববঙ্গ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন কিনা, তা আমার জানা নেই। কিন্তু তিনি অসচেতন ছিলেন না, অরাজনৈতিক ছিলেন না। তাঁকে র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট বলে আখ্যায়িত করত। তিনি তা অস্বীকার করতেন না। আমাদের দেশের বামপন্থী চিন্তার ইতিহাসে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট একটি চিন্তাধারার নাম। প্রখ্যাত মানবেন্দ্র নাথ তথা এম. এন. রায় কমিউনিস্ট সংগঠন পরিত্যাগ করে এই নামের একটি সংগঠন দাঁড় করিয়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলার অনেক বুদ্ধিজীবী এম. এন. রায়ের এই 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' সংগঠন ও চিন্তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। এ সংগঠন কোন জঙ্গী আন্দোলনের সংগঠন ছিল না। কিন্তু নাম থেকেই বুঝা যায়, সংগঠনটি ছিল শ্রেণি-উর্ধ্ব একটি মানবতাবাদী সংগঠন। শ্রেণি নির্বিশেষে কোন মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখা। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট ছিলেন। কিন্তু তারও বেশি, তিনি তাঁর নিজের জন্মগত স্বদেশ ও পরিবেশের মহৎ পরিবর্তনের সংগ্রামের একজন সচেতন অংশীদার ছিলেন। তা না হলে আসন্ন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও সেই প্রবাদের সক্রেটিসের ন্যায় হাসিমুখে তিনি গেয়ে উঠতে পারতেন না; 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান'। হাঁ, জেনে শুনেই তো। তা না হলে, জীবনের এই বিষ, এই বিপর্যয়, এই করুণ মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা আমাদের অপর দশ জনার মতো করতে তার বাঁধা ছিল কোথায়?

বাসন্তী দেবী বলছিলেন ২৫ তারিখ রাত আড়াইটায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জীপগুলো জগন্নাথ হলের উপর আক্রমণের পরে তাঁদের আবাসিক এলাকার বাইরে গেটের তালা ভেঙ্গে ঢুকে প্রত্যেক ঘরে বুটের লাথি মারতে মারতে, অবশেষে তাঁর ঘরের পেছন দিক দিয়ে তাঁর বাসায় এসে 'প্রফেসর হ্যাঁয়?' বলে হাঁক দিয়েছিল। তাঁর চোখ দু'টি ছিল আজকের পঁচাশি থেকে তের বছর আগের সেই ২৫শে মার্চের রাত

আড়াইটার দৃশ্যে। আমার শুনে শুনে কেবল বিস্ময় জাগছিল এই ভাবে, কেমন করেই না সত্যিকার সাহসী মানুষ বিপদের মুহূর্তে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে, কেমন করে যে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বাসন্তী দেবী আর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার আদ্যন্ত জীবনের কাহিনী আমি জানিনে। তাঁদের প্রিয় ছাত্র অজয় রঞ্জন বিশ্বাস তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন: এরা দু'জন কেবল দম্পতি নন, সারা জীবনের বন্ধু ছিলেন। আজ সেই ২৫ তারিখের রাত্রির কাহিনী বাসন্তী দেবীর মুখে শুনতে শুনতে অজয় রঞ্জন বিশ্বাসের কথাটিকে যথার্থ বলে মনে হল। এবং তাদের সেই জীবনভর বন্ধুত্ব তার চরম প্রকাশ পেয়েছিল ২৫শে মার্চের সেই ভয়াল মুহূর্তটিতে।

এই বিপদের আশঙ্কায় জ্যোতির্ময় বাবু রাতের প্রথম প্রহরেও স্ত্রীকে বলেছিলেন, তুমি মেয়েকে নিয়ে অন্য কোথাও যাও। আমার তো যাবার উপায় নেই।

জ্যোতির্ময় বাবুর পরামর্শের জবাবে বাসন্তী দেবী বলেছিলেন: না, তোমাকে ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না।

পাকিস্তান সামরিক অফিসারের হাঁকের জবাবে বাসন্তী দেবীই বেরিয়ে এসে বললেন: হ্যাঁয়।

সামরিক অফিসার বলল: উনকো লে যায়েগা।

বাসন্তী দেবীও কিছু কথা উর্দুতে বলতে পারেন। তিনি বললেন, কিউ লে যায়েগা, কাঁহা লে যায়েগা?

এমন কথার প্রতি উত্তর কি হয়েছিল, কেমন করে হয়েছিল, সেটি আজ স্মরণে নেই। কিন্তু বাসন্তী দেবী যখন ভেতরে গিয়ে স্বামীকে বললেন: ওরা তোমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছে, তখন নিঃশব্দে জ্যোতির্ময় বাবু ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

জল্লাদের দল জোর করে হাত ধরে তারপর ওঁকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে তাঁর নাম, ধর্মের কথা সব জিজ্ঞেস করল। আমার স্বামী তাঁর যা নাম তাঁর ধর্ম-সব বললেন। তারপরই গুলির শব্দ। একটা গুলি গলার মধ্য দিয়ে গেল। আর একটা পিঠে। লুটিয়ে পড়লেন তিনি সিঁড়ির সামনে। আমাদের বাসার পাশে। লুটিয়ে পড়েও সংজ্ঞা হারাননি। স্বাভাবিক কণ্ঠে যেন বলে উঠলেন বাসন্তী জল দাও।

এমন অবস্থার কথা পুনরায় স্মরণ করে বর্ণনা করা বাসন্তী দেবীর পক্ষে যে কি মর্মান্তিক আর কষ্টকর তা ভেবে আমি একেবারে নির্বাক আর নিঃস্পন্দ হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। তিনি সেদিনও যেমন আজও তেমনি আবেগে বা বেদনায় সম্বিতহীন নন। কাহিনীকে বিস্তারিত করে বললেন: কিন্তু আমার স্বামী তো একা নন। ঐ সিঁড়ির গোড়াতেই লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করেছে পশুর দল পরিসংখ্যানের মনিরুজ্জামান সাহেব এবং তাঁর আত্মীয় আরো তিনজনকে। তাঁদের তিনতলার ঘর থেকে টেনে নামিয়েছে।

"আমরা যখন ভেবেছি, আমার স্বামীকে ওরা মেরে ফেলেছে তখন উপর তলার রাজ্জাক সাহেব এবং আরো কে যেন ডেকে বলল: আপনার স্বামী মারা যাননি। উনি পানি চাচ্ছেন। তখনি সম্বিত ফিরে পেয়ে ছুটে গিয়ে ওকে ধরাধরি করে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলাম।

বাসন্তী দেবী বললেন: "তারপরে ২৬ তারিখ যেন অবরুদ্ধ হয়ে বাসার মধ্যেই কাটল। কাছেই হাসপাতাল। কিন্তু কেমন করেনিব ওকে হাসপাতালে? ২৭ তারিখ সকালে

কারফিউ উঠলে ওকে ওর শোওয়ার বিছানার উপর রেখে কয়েকজনে ধরাধরি করেনিয়ে গেলেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে যে কোন চিকিৎসা হল তা নয়। আর সে অবস্থাও তখন ছিল না।"

"তারপর ২৮ গিয়ে ২৯ এলো এবং ৩০ তারিখ সকালে তিনি মারা গেলেন। আমরা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। ডাক্তাররা কেবল বলতেন উনি যে কেমন করে বেঁচে আছেন এই কয়দিন তাই আমাদের কাছে বিস্ময়।"

মৃত্যুর জন্য ধীরভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন জ্যোতির্ময় বাবুও। বিষাক্ত গুলিবিদ্ধ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মুখে কাতর কোন ধ্বনি কেউ শোনেনি। এই কটি দিনে সুহৃদদের কেউ যখন দেখতে এসেছেন এবং আলোচনাকালে বাসন্তী দেবীর কাছেই জানতে চেয়েছেন অপর কোন বন্ধুর কথা, সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত কারুর কথা, তখন তিনি যদি তাদের পরিচয় ও ঠিকানা বলতে গেছেন, জ্যোতির্ময় বাবু তখন সতর্কতার বোধ থেকে স্ত্রীকে বলেছেন: যা জানো, সব বল কেন? অবস্থা ভাল নয়। সব বলতে নাই। ...২৫ তারিখ রাতে যখন চারদিকে আগুনের হল্কা ছুটছে, মেশিনগানের গুলি ছুটে আসছে তখন স্ত্রীকে বলেছেন, খাটের নিচে যাও। মেয়েকে বুকে করে খাটের নিচে আশ্রয় নিয়ে তরল পরিহাস করেই যেন বলেছেন: এ হচ্ছে যুদ্ধ। ট্রেঞ্চে তোমাকে এ ভাবেই থাকতে হবে। খাওয়া দাওয়ার কোন চিন্তা করবে না। কোন বাছবিচার থাকবে না। যেখানে মলত্যাগ, সেখানেই আহার গ্রহণ, বুঝেছ...।

এই জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ৩০শে মার্চ সকালে 'যুদ্ধের ট্রেঞ্চে' আহত অবস্থায় থেকে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করলেন। তার প্রিয় ছাত্র তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণটির শিরোনাম দিয়েছেন: 'সেই জ্যোতির্ময় মানুষটি'। এ নামটি শেষমুহূর্তেও যথার্থ বলে প্রমাণিত হল। বাসন্তী দেবীর বর্ণনাতে ছিল: 'মৃত্যুর আগের দিনও বোধ হয় আমার স্বামী তাঁর সেই প্রিয় গানের প্রিয় কলিটি নিয়ে গুণ গুণ করেছিলেন। বলছিলেন: আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান...।'

এই লেখাটি 'জ্যোর্তিময় গুহ স্মারক গ্রন্থে' সরদার ফজলুল করিম লিখেছিলেন।

সঙ্গ-প্রসঙ্গের লেখা: সরদার ফজলুল করিম

সংগ্রহ ও সংকলন: শেখ রফিক, রোদেলা প্রকাশনী, ১১/১ ইসলাম টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

একবার আমি ক্ষুব্ধভাবে আমার একটি ব্যক্তিগত রচনার নাম দিয়েছিলাম: 'বাংলাদেশের ইতিহাস নাই।' বর্তমান গ্রন্থভুক্ত (পৃ. ৯৭) এই রচনায় ক্ষোভের কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস যদি না থাকে, তবে তার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস যে থাকবে না, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? ব্যাপারটা প্রায় তেমনি দাঁড়িয়েছিল। শুনেছিলাম, ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পরেই সরকারের তরফ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা এবং তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তার উপাদান সংগ্রহের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সেই ১৯৫২ সাল থেকে আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ কবি হাসান হাফিজুর রহমানকে এক পর্যায়ে তার পরিচালক করে পরিকল্পনাটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কবি হাসান হাফিজুর এই প্রকল্পের দায়িত্ব লাভ করেছেন শুনে আমরা সাধারণ এবং আগ্রহী মানুষেরা বিশেষ উৎসাহ ও ভরসা বোধ করেছিলাম। কেবল আশা করেছিলাম, কবে এবং কবিতা শিগগির সুসম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত এবং সহজলভ্যভাবে এই ইতিহাস বাংলার পাঠকসাধারণের হাতে এসে পৌঁছবে। সে আশা প্রায় মরীচিকা হয়ে কেবল হাতছানি দিয়ে দিয়ে দূর থেকে দূরে অপসৃত হচ্ছিল। কী এক দুর্জ্ঞেয় বিলম্বের রহস্য সমগ্র প্রকল্পটিকে যেন ঘিরে ধরেছিল।

এই বিলম্বের মধ্যেই ঘটলো সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং সচেতন কর্মীর ক্ষেত্রে আমাদের এক অপূরণীয় ক্ষতি। হাসান হাফিজুর রহমান আকস্মিকভাবে মহাপ্রয়াণে চলে গেলেন: ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল তারিখে। তাঁর অন্তরের একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁর জীবৎকালে এই প্রকল্পের প্রকাশিত রূপ দেখে যাবেন। তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে হয়তো সান্ত্বনা দেয়ার জন্যই এক সময়ে তাঁর পাশে অসম্পূর্ণ খণ্ডগুলো রেখে তা প্রকাশের একটি অনুষ্ঠান করা হয়েছিল বলে খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু তখনো পাঠকসাধারণের পক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই ইতিহাস তথা তার সংগৃহীত দলিলপত্র চোখে দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি।

পরবর্তীকালে আর একবার দেখা গেল, সত্যই স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের একটি প্রকাশনা অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচার করা হলো। প্রধান প্রশাসক তাতে প্রধান হয়ে উপস্থিত হলেন। পরিকল্পনার পরিচালকবৃন্দও সে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তার সচিত্র প্রতিবেদন দূর-দর্শনে আর দৈনিক প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু তা হতোস্মি! কী ভাগ্য! তারপরেও কোথাও খোঁজ করে সেই প্রকাশিত স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাচ্ছিলাম না। নিজের মনে এ-সম্পর্কে একটা আবেগ ছিল। ১৯৭১ সালের পরে পনের বছর তো বাংলাদেশ অতিক্রম করছে। তবু যে-বাংলাদেশের মানুষ অযুত-লক্ষে আত্মবলি দিয়েছে, তার কোনো গ্রন্থিত পরিচয় বাংলাদেশের মানুষ লাভ করতে পারলো না! আমাদের প্রকাশনা শিল্পের এবং লোকবল ও যন্ত্রপাতির এতো অনাভাব সত্ত্বেও। ব্যাপারটার রহস্য ক্রমান্বয়ে গাঢ় হয়ে উঠছিল। আমি একেবারে বাইরের লোক। গো-বেচারি। ভেতরের কাহিনী জানিনে। কার বীরত্বের পরিচয় এই গ্রন্থে

কীভাবে বিধৃত হয়েছে, কিংবা হয়নি, তার টানাপোড়েনের কাহিনী আমার জানা নেই। আমার কেবল মনে হচ্ছিল: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস নিশ্চয়ই এক মারাত্মক নিষিদ্ধ গ্রন্থ। তাকে প্রকাশ্যে দেখতে পাওয়া, সংগ্রহ করা সাধারণের জন্য যথার্থই দুঃসাধ্য এবং দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

কিন্তু সে ক্ষোভ এখন খানিকটা মিটেছে, এ-কথা আমাদের বলতে হয়।

মাস কয়েক আগে সরকারের তথ্য দপ্তর থেকেই বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল: ২ হাজার টাকা দিয়ে ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল-পত্র' গ্রন্থের সেট পাঠকগণ তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপিত দপ্তর থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

১৫ খণ্ড হিসেবে দেখলে টাকার পরিমাণ বেশি হয়। তবু তো দু'হাজার টাকা। দ্বিধা এবং বাধা যে ছিল না, তা নয়। তবু তাকে কাটিয়ে আমি যথার্থই সংগ্রহ করেছি তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত ১৫ খণ্ডের সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের উপাদানমূলক সেটটি।

সে সেট এখন কোনো পাঠক আর পাবেন কি না, তাতে বিশেষ সন্দেহ। আশঙ্কা আমারও ছিল, পাছে বিলম্ব হলে আর না পাই। প্রকল্পের বর্তমান পরিচালক বন্ধুমানুষ। তাঁর কাছ থেকে নগদ দাম দিয়ে সংগ্রহ করতে গিয়ে জিগ্যেস করেছিলাম: কতো কপি মুদ্রিত হয়েছে? তিনি জবাব দিতে দ্বিধা করেননি। তিনি বলেছিলেন: চার হাজার কপি ছাপা হয়েছে।

জবাবটি শুনে আমার মনের প্রতিক্রিয়ার কোনো প্রকাশ ঘটাতে আমি সাহস করিনি। ব্যাপারটা নিয়ে এখনো ভাবছি। এও এক জবাবহীন রহস্য। দশ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার শহীদ হয়েছে ত্রিশ লক্ষের ওপর নানা স্তরের মানুষ: শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ বাহিনী। ধর্ষিতা হয়েছেন হাজার হাজার মা-বোন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন অগণিত মুক্তিযোদ্ধা।

১৯৭১। বিংশ শতকের শেষ পদের সময়সীমা। এই কালে, এমন সাম্প্রতিক কালে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এক অসীম সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্যের ঘটনা। এই স্বাধীনতা যুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীর ছোট-বড় প্রায় সকল দেশ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, দৈহিক এবং মানসিকভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। সে-কারণে স্বাধীনতার এই যুদ্ধ পাকিস্তানের একটি গৃহযুদ্ধে মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। এ-পরিণত হয়েছিল আন্তর্জাতিক যুদ্ধে। এর পক্ষ, প্রতিপক্ষ বিস্তারিত হয়েছিল দেশ থেকে দেশে। এ-যুদ্ধের কাহিনী দলিল আকারে লাভ করার আগ্রহ তাই কেবল জাতীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। সে আগ্রহ যথার্থই আন্তর্জাতিক আগ্রহ এবং সে কাহিনীর যা কিছু সংগৃহীত হয়েছে, তার সংকলন মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়েছে মাত্র চার হাজার কপি! এ-এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের নানা অবিশ্বাস্য ঘটনার মতো এটিও আর এক অবিশ্বাস্য কিন্তু বাস্তবিকভাবে সত্য ঘটনা। আমার স্থির বিশ্বাস, এ-ঘটনাটিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের মধ্যে অপরিহার্যরূপে সংকলনযোগ্য একটি ঘটনা হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের গবেষক এবং ইতিহাসকারগণ বিবেচনা করবেন।

এবং সে কারণেই এমন দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থকে সংগ্রহ করতে পেরে নিজেকে সমগ্র পৃথিবীর চার হাজারের একজন বলে গর্ববোধ করছি। কিন্তু এমন সুরের কথা আর থাক।

মুদ্রণসংখ্যা যতো অবিশ্বাস্য এবং অপরাধজনকভাবে কমই হোক, তবু তো মুদ্রিত হয়েছে। সদিচ্ছা থাকলে মুদ্রিত কপির পুনর্মুদ্রণের প্রযুক্তি আর কৌশলের যুগে একে পুনরায় মুদ্রণ করা কোনো সমস্যা নয়। আমরা কেবল আশা করবো, যথার্থ সদিচ্ছাসহকারে সেই কারিগরি কৌশল প্রয়োগ করে অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এই দলিল সংগ্রহকে এক লক্ষ না হোক, অন্তত পঞ্চাশ হাজার কপিতে প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ সরকারের আগ্রহে পুনরায় প্রকাশ করা হবে। এবং তেমন সংখ্যায় প্রকাশিত হলে তুলনামূলকভাবে সমগ্র পনের বা ষোল খণ্ডেরই মূল্য আরো হ্রাস করা সম্ভব হবে এবং একে বাধ্যতামূলকভাবে ক্রয় করে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া যাবে। কারণ এই দলিল সংগ্রহকে আমি পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যেক পরিবারে রক্ষণযোগ্য বলে বিবেচনা করি। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ ও রক্ষা করার এই চেতনাটি তৈরি হলে ৫০ হাজার কপিও অপ্রতুল বলে গণ্য হবে, এ-কথা স্থিরভাবেই বলা চলে।

এমন চেতনা সৃষ্টির জন্যই প্রকল্পের বন্ধুবর পরিচালককে বলেছিলাম: আপনি ধন্যবাদের পাত্র যে, আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করে মুদ্রিত খণ্ডগুলোকে ক্রয়যোগ্য করে আমাদের মতো পাঠকদের জন্য সংগ্রহের উপায় করে দিয়েছেন। আমার আবেদন, আপনারা 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস: তার দলিল-পত্র', এই শিরোনামে একটি জাতীয় সেমিনার আহ্বান করুন। সেই সেমিনারে আপনার এই প্রকল্পের আদ্যন্ত, সুবিধা-অসুবিধা, আপনাদের বাধা-বিপত্তিসব কাহিনী উপস্থিত করুন। বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ এই পনের খণ্ডের প্রতিটি খণ্ড এবং সমগ্র সংকলন সম্পর্কে তাঁদের মতামত, বক্তব্য উপস্থিত করবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস মাত্র ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত হতে পারে না। সে কথা এই প্রকল্পের এককালীন পরিচালক প্রয়াত কবি হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর ভূমিকাতে বলে গেছেন। প্রস্তাবিত সেমিনারে আমরা সাগ্রহে এই পরিকল্পনার পরবর্তী কার্যক্রমের প্রস্তাব দিতে পারবো। তথ্য দপ্তরের সম্পাদিত কর্মকে ধন্যবাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ করণীয়কে সহজতর করার প্রয়াসে দেশের অগণিত সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক কর্মী নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়ে আসবেন।

এমন কথা বলেছিলাম আমি ছিয়াশির একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে। ভেবেছিলাম, একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানমালায় এই আলোচনাটি অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু একুশ কেবল আনুষ্ঠানিকতা, এমনকি রক্তাক্ত আনুষ্ঠানিকতায় শেষ হয়ে গেল। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে আমার আকাঙ্ক্ষিত আলোচনাটি কোথাও অনুষ্ঠিত হলো না। একুশ অতিক্রান্ত হয়ে আবার সেই ১৯৭১-এর মার্চ এসে উপস্থিত হয়েছে। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ। তার অমোঘ উচ্চারিত দাবি: 'ইতিহাস কথা কও।' 'ইতিহাসকে কথা বলতে দাও' কিন্তু সে দাবি পূরণে অনীহা এবং অনিচ্ছা যেন ক্রমান্বয়ে দুরতিক্রম্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে একজন সাধারণ আবেগপ্রবণ মানুষ হিসেবে নিজেকে ভয়ানক অসহায় বোধহয়।

জাতীয়ভাবে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল-পত্র' সংকলনের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমার যদি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা থাকতো, তবে সংকলনটির ১৫ খণ্ডেরই আমি পর্যালোচনা প্রকাশ করতাম। কিন্তু তার জন্য যেমন পরিশ্রম প্রয়োজন, তেমনি প্রকাশের মাধ্যম আবশ্যক। আমার নিজের পরিশ্রমের ক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

হাসান হাফিজুর রহমানের নিজের রচিত ভূমিকাটিতে এই পরিকল্পনাটির আনুপূর্বিক বিবরণ পাওয়া যায়। বিবরণটি সংকলনের পাঠক মাত্র মনোযোগ সহকারে পাঠ করবেন। এখানে তার বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিতে চাইনে। হাসান ভূমিকার গোড়াতে খণ্ডগুলোতে শিরোনামের উল্লেখ করেছেন। সংকলনের ১ম ও ২য় খণ্ড তৈরি হয়েছে ১৯০৫ থেকে ১৯৫৮ এবং ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১: এর পটভূমি নিয়ে। ৩য় খণ্ড থেকে ৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত প্রধান শিরোনাম হচ্ছে: মুজিবনগর। তার মধ্যে প্রশাসন, প্রবাসী বাঙ্গালিদের তৎপরতা, বেতার মাধ্যম, গণমাধ্যম প্রভৃতি বিষয়ের দলিলপত্র ও বিবরণ সংগৃহীত এবং সঙ্কলিত হয়েছে। ৭ম খণ্ডে আছে পাকিস্তানি দলিল-পত্র। ৮ম খণ্ড তৈরি হয়েছে গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনার সাক্ষাৎকার দলিলপত্র ও বিবরণ। ১২শ ও ১৩শ খণ্ডে বিদেশের প্রতিক্রিয়া। ১৪শ খণ্ডে বিশ্ব-জনমত। ১৫শ খণ্ডের শিরোনাম হচ্ছে সাক্ষাৎকার। ১৬শ খণ্ডে থাকবে কালপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট। এই শেষ খণ্ড এখনো প্রকাশিত হয়নি।

সংগৃহীত উপাদানের পরিমাণের কথা বলতে গিয়ে হাসান এক জায়গায় বলেছেন: "সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ সংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোনো না কোনোভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাঁথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ-সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙ্গালিদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।" (ভূমিকা, পৃ. ছয়)

তাঁর এই বক্তব্য এই প্রকল্পের বিরাটত্বেরই ধারণা প্রকাশ করে। অথচ সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে প্রয়াত কবি ও কর্মী হাসান বলেছেন: "সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতোখানি বাস্তবায়ন সম্ভব, তা ভাববার বিষয়।" (ভূমিকা, পৃ. ছয়)

এই প্রকল্পের কাজ যে জাতীয়ভাবে কতো জরুরি এবং এ-কাজ যে বাংলাদেশের অস্তিত্বের মতোই স্থায়ী এবং বহমান, সে-কথা যেমন হাসানের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় তাঁর এই কথাতেও, যেখানে তিনি বলেছেন: "বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতরে ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এ-ছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলোর গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলোর ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলোর বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ-সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ-সম্পর্কে যতো বেশি বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে, আমাদের অগ্রযাত্রা ততো বেশি নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ-সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।"... (ভূমিকা: পৃ. নয়)

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র': ১৬ খণ্ডের মধ্যে প্রকাশিত ১৫ খণ্ডের একটি সেট আমি সংগ্রহ করেছি। কিন্তু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার এখনো ঘটেনি। সে পরিচয় সময় সাপেক্ষ। তাই তার আলোচনা আমি উত্থাপন করতে চাইনে। তবে প্রাথমিক পরিচয়তেও এই ১৫ খণ্ডের মধ্যে আজ ২৬ মার্চের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ৮ম খণ্ডটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান মনে হচ্ছে।

অষ্টম খণ্ডের মূল শিরোনাম হচ্ছে: গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা। এই খণ্ডের প্রাসঙ্গিক কথার শেষে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের গণহত্যার পূর্ণ চিত্র একটি দলিল খণ্ডে সন্নিবেশ করা সম্ভব নয়। এখানে সারা দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা, সর্বশ্রেণীর মানুষের ওপর পাকবাহিনীর হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিনিধিত্বমূলক বিবরণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।" ...নির্ঘণ্ট ও পরিশিষ্টের তিনটি অধ্যায় বাদে ৯০টি অধ্যায়ে প্রায় সাড়ে সাতশ' পৃষ্ঠাতে ১৯৭১-এর বাংলাদেশের ওপর পাক হানাদার বাহিনীর সংঘটিত, পৃথিবীর ইতিহাসের নৃশংসতম এক হত্যাকাণ্ডের দলিল-ভিত্তিক বিবরণদানের চেষ্টা করা হয়েছে। ৯০টি অধ্যায়ের মধ্যে ২য় অধ্যায়টিকে: 'গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ: বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাৎকার' শিরোনামে প্রকাশ করা হয়েছে। এ-বিবরণ অবশ্যই যেমন সীমাবদ্ধ, তেমনি মাত্র আভাসমূলক। বাংলাদেশের চারটি বিভাগ থেকে আভাসমূলক এই সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সাক্ষাৎকারগুলো পাঠ করতে শুরু করলে পাঠক মাত্রই, সে আজকে ১৯৭১-এর পনের বছর পরের পাঠকই হোন কিংবা শত বছরের পরের পাঠক: তিনি মর্মে মর্মে বেদনায়, করুণায়, আর্তিতে আলোড়িত হয়ে উঠবেন। নির্যাতনের অকল্পনীয়তায় বিমূঢ় হয়ে যাবেন। খণ্ডটির প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শিরোনামই তাৎপর্যপূর্ণ এবং শিহরণমূলক। এর যে-কোনো অধ্যায়ই এককভাবে আজ, যখন আমাদের স্মৃতিকে নানা দ্বন্দ্বে, সংশয়ে, মিথ্যাচারে আচ্ছন্ন করে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে, তখন হাজারে হাজারে মুদ্রিত হয়ে ব্যাপকভাবে জনসাধারণ ও সচেতন কর্মীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার দাবি রাখে।

আমি যখন দ্বিতীয় অধ্যায়টির বিভিন্ন স্মৃতিচারণের ওপর কেবল চোখ বুলোচ্ছিলাম, তখন জগন্নাথ হলের দৃশ্য বর্ণনাকারী দর্শকের কাহিনী যেমন আমার সমস্ত দেহ এবং মনকে বেদনায়, ক্ষোভে এবং প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভবে আলোড়িত করে তুলছিল, তেমনি রাজারবাগের পুলিশ কেন্দ্রে বন্দী মেয়েদের ওপর পাক হানাদারদের নিত্য মুহূর্তের পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী স্মরণ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে সুইপার রাবেয়া খাতুন যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা পাঠে যে-আমি সেদিন ১৯৭১-এর মার্চ মাসে এই রাজারবাগের অদূরেই এক আতঙ্কিত জীবন-যাপন করছিলাম, সেই আমি আজ পনের বছর পরেও অন্তরের মর্মান্তিক জ্বালায় পুড়ে যেন খাক হচ্ছিলাম। এ-বিবরণ পাঠে যেন আবার আমার ১৯৭১-এ প্রত্যাবর্তন ঘটছিল এবং এমন ১৯৭১-এ প্রত্যাবর্তন, যে-১৯৭১-এর মধ্যে একদিন বাস করেও তাকে পুরো বুঝতে পারিনি, পুরো জানতে পারিনি, যে-১৯৭১-এর মর্মান্তিকতার গভীরতা।

১৭-৩-৮৬

রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ
সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

রুমীর আম্মা

আমার ইচ্ছে হচ্ছে, রুমীর আম্মা, জাহানারা ইমামের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের কথাটি লিখে রাখি। রুমীর পরিচয় পেয়েছি জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি'র প্রকাশিত দিন-লিপিতে। গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত সে দিন-লিপির চতুর্থ সংস্করণটি ইতোমধ্যেই হয়ত নিঃশেষ হতে চলেছে। '৮৬ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'একাত্তরের দিনগুলি'। সচিত্র সন্ধানীর পাতায় এর আগে বেরিয়েছিল। তারপরে বই আকারে।

একাত্তরে দিনগুলি আমার নিজেরও অজানা নয়। সেদিনের বন্দী, অবরুদ্ধ ঢাকার মানুষ আমি। নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও সেদিন নানা বিপদ এবং বিপর্যয় ঘটেছিল। সেই বিপর্যয়ের ভেতর দিয়েই একাত্তরের সঙ্গে পরিচয়। কিন্তু একাত্তরের মোকাবেলা সেদিন কয়েকটি ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ববাংলার মানুষের সমগ্র ইতিহাসে তার আপামর অধিবাসীর জীবনে এমন রাজনৈতিক-সামাজিক আলোড়ন আর কখনো ঘটেছে বলে কল্পনা করা চলে না। ৩০ লক্ষ শহীদঃ ৩০ লক্ষ মানুষের ধন-মান-প্রাণের নিধন। কথাটা বাক্য হিসেবে শুনলে আবেগের বাহুল্য বলে বোধ হয়। কিন্তু জাহানারা ইমামের জীবনে একাত্তরে যা ঘটেছে, এবং জাহানারা ইমাম, তাঁর স্বামী ইঞ্জিনিয়ার শরীফ ইমাম, তাঁদের হীরের টুকরোর মতন জ্যোতির্ময় পুত্র রুমীঃ একাত্তরের সংগ্রামের সঙ্গে তাদের দৃশ্য-অদৃশ্য, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানাভাবে সম্পৃক্ততার কথা শুনলে বাক্যের আবেগকে বাহুল নয়, বাস্তবকে প্রকাশের ক্ষেত্রে বাক্যকে একেবারেই অক্ষম বলে বোধ হয়।

জাহানারা ইমাম, তাঁর স্বামী এবং পুত্র, এঁরা একাত্তরে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন না। তবু সেই ঊনসত্তর কিংবা তার আগে থেকেই বাংলার জনমানসের ক্রমবিকাশমান আর্তি এবং আলোড়নের তাঁরা ছিলেন সচেতন দর্শক এবং জীবনের তালে তাল মিলিয়ে চলার পথযাত্রী। তরুণ রুমী ভর্তি হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে। পরিকল্পনা ছিল উচ্চতর শিক্ষার জন্য সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবে। কিন্তু সে তার মাকে বলেছিলঃ 'আম্মা, আমি মুক্তিযুদ্ধে যাব।' বাবাকেও সে-কথা সে জানিয়েছিল। তাদের পারিবারিক পরিবেশটি ছিল পরস্পরের মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনা আর বন্ধুত্বের পরিবেশ। এমনটি খুব কম দেখা যায়। রুমী তার মাকে না জানিয়ে কোন কাজ করে না। '৭১-এর ২৫শে মার্চের পরেই বাংলাদেশের তরুণরা গেরিলা কৌশলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছি। তারা সম্ভবমত মারণাস্ত্র সংগ্রহ করছিল। শত্রুর যাতায়াতকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছিল। এমন কাজে ব্যাপৃত কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য, মাল-মশলা, কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করছিল গোপনে, সঙ্গোপনে। রুমী, রুমীর আম্মা, রুমীর আব্বা, তারা সকলেই ছিল এমন গোপন কাজের অংশীদার। অবস্থা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। শত্রুর আক্রমণ তীব্র হচ্ছিল। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের পর ঢাকাতে পাকিস্তানী বাহিনীর সুনির্দিষ্ট আঘাত আসছিল অবরুদ্ধ ঢাকায় গুপ্তভাবে কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সমর্থকদের ওপর। রাত-বিরেতে বাড়িতে বাড়িতে হানাদাররা হানা দিচ্ছিল। ধরে

নিয়ে যাচ্ছিল ক্যান্টনমেন্ট আর নির্যাতন কেন্দ্রে এমপি হোস্টেলে। রুমী এসেছিল তার বন্ধুদের সাথে একটা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে। মায়ের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ রোধ করতে না পেরে বাড়িতে এসে একরাত থাকতে না থাকতে পাকিস্তানী বাহিনী গভীর রাতে এসে হামলা করল জাহানারা ইমামের নিউ মার্কেটের কাছের এলিফ্যান্ট রোডের 'কণিকা' বাড়িটিতে। ঘরের ভেতর থেকে ধরে নিয়ে গেল রুমী এবং তার আব্বাকে। নির্মম নির্যাতন চালানো হল তাদের ওপর এমপি হোস্টেলে। গ্রেপ্তারের পর পিতার কাছ থেকে পুত্র রুমীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল। কয়েকদিন পর অকথ্য নির্যাতনের চিহ্ন বুকে-পিঠে ধারণ করে রুমীর আব্বা শরীফ সাহেব যদিবা মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন, রুমী আর এল না। নির্যাতনের এই আঘাতে এবং পুত্রের নিহত হওয়ার ঘটনায় শরীফ সাহেবের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। ডিসেম্বর মাসে, স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন বিজয়ের সন্নিকটে, তখন আকস্মিকভাবে শরীফ সাহেব সংজ্ঞা হারালেন। হাসপাতালে নেয়া হল তাঁকে। কিন্তু সেখান থেকে ১৪ই ডিসেম্বর সকালে ফিরে এল তাঁর মৃতদেহ।
জাহানারা ইমাম ১৪ই ডিসেম্বরের দিন-লিপিতে লিখলেন: "শরীফকে বাসায় আনা হয়েছে সকাল দশটার দিকে। মনজুর, মিকি-এরা দু'জন ওদের পরিচিত ও আত্মীয় পুলিশ অফিসার ধরে গাড়িতে আর্মড পুলিশ নিয়ে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে একটা পিকআপ জোগাড় করে হাসপাতাল থেকে ওকে নিয়ে এসেছেন।...
যেন জাহানারা ইমামের স্বামী শরীফ সাহেব অসুস্থ হলেও দুর্বল অবস্থায় ফিরে এসেছেন। তিনি মারা গেছেন: এমন মর্মান্তিক ঘটনার আভাস বর্ণনার এ-বাক্য কয়টিতে পাঠক অন্বেষণ করেও পারবে না। কেবল এখানেই নয়। তারপরের সকল ঘটনার বিবরণ এমন একটি অকল্পনীয় ধৈর্যের মধ্যে লিখিত হয়েছে যে, নিজের জীবনের সবচাইতে মর্মান্তিক ঘটনার এমন আপাত নিরাবেগ বর্ণনা তাঁকে তুলনাহীন করে তুলেছে। এই বিবরণ পাঠ করে এবং দৃশ্যটি নিজের মনের চোখে উদ্ভাসিত করতে গিয়ে আমার নিজের চোখও বারংবার জলে ভরে ওঠে। দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়।
বস্তুত জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' একদিকে যেমন একাত্তরের ঢাকার, তথা সংগ্রামী বাংলাদেশের এক দলিলবিশেষ, তেমনি একটি পরিবারের মর্মস্পর্শী কাহিনী হিসেবে অপার বেদনা, সাহস এবং সংগ্রামের এক বিস্ময়কর আলেখ্য বিশেষ। আমার ইচ্ছে ছিল, জাহানারা ইমামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, কেমন করে তিনি এই দিন লিপিগুলি তৈরি করেছিলেন, কেমন করে তাকে তিনি রক্ষা করেছিলেন।
কিন্তু জাহানারা ইমাম, আমি শুনেছিলাম, ভয়ানকভাবে অসুস্থ। '৭১-এর পরবর্তীকালে তাঁর মুখে ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে। তার ফলে তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকভাবে আহার করা, খাদ্য গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যাঁর সুন্দর, মার্জিত উচ্চারণের আলাপ-আলোচনা একদিন ঢাকার সাংস্কৃতিক মহলকে আকৃষ্ট এবং আনন্দিত করত, তাঁর কণ্ঠ আজ প্রায় স্তব্ধ। এও জাহানারা ইমামের জীবনের আর একটি ট্র্যাজেডি। আমার তাই সংকোচ ছিল, এমন অবস্থায় তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর বিগত দিনের মর্মান্তিক জীবনের কথা জিজ্ঞেস করা উচিত হবে কিনা। তাঁকে দিয়ে কথা বলানোতে তাঁর কষ্ট বৃদ্ধি পাবে কিনা।
আমার মনের ইচ্ছের কথা বলেছিলাম মিসেস বাসন্তী গুহঠাকুরতাকে। বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা জাহানারা ইমামের যেমন সুহৃদ, তেমনি তাঁরই মত' ৭১-এর ট্র্যাজেডির আর

এক নায়িকা। বাসন্তী গুহঠাকুরতা কোন বই লেখেন নি। নিজের কথা নিজে কোথাও বলেননি। কিন্তু বাসন্তী গুহঠাকুরতার স্বামী অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্লাটে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। হানাদার বাহিনী তাঁর ফ্ল্যাট আক্রমণ করে, বুটের লাথিতে দরজা ভেঙ্গে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার নাম জিজ্ঞেস করে তাঁকে ধরে সিঁড়ির গোঁড়াতে নিয়ে সামনা-সামনি গুলি করে চলে গিয়েছিল। ২৬শে নয়, বোধহয় ২৭শে মার্চ তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়নি। সচেতনভাবে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে কয়েকদিন পর তিনি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। সেও আর এক মর্মন্তুদ কাহিনী।

জাহানারা ইমাম আমার বান্ধবীস্থানীয়। '৬৮-এর গণআন্দোলনের সময় আমরা এক সাথে রাস্তায় মিছিল করেছি। আমি বাংলা একাডেমিতে চাকুরি করাকালীন তাঁকে বাংলা একাডেমির সকল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং শ্রোতা-দর্শক হিসেবে নিয়মিত উপস্থিত হতে দেখেছি। তবু আজ একা তাঁর সামনে গিয়ে, তিনি কেমন আছেন, জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছিল না। বাসন্তী গুহঠাকুরতা আমার চাইতে বয়সে বড়। আর পাঁচজন বয়ঃকনিষ্ঠের মত আমিও তাঁকে 'দিদি' বলে সম্বোধন করি। তিনি তাতে খুশি হন। তাঁকে জাহানারা ইমামের কাছে যাওয়ার কথা বলাতে তিনিই ফোনে যোগাযোগ করে তারিখ ঠিক করলেন। এবং সে অনুযায়ী আমরা দু'জন ১০ই এপ্রিল ('৮৮) তারিখে জাহানারা ইমামের 'কণিকা' ভবনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।

গিয়ে দেখলাম, তাঁর শরীর কিছুটা সুস্থ হয়েছে। আমাদের দেখে খুবই খুশি হলেন। পুরানো দিনের এমন পরিচিত মানুষের সংখ্যাই আজ কম। আনন্দের রং-এ তাঁর গৌঢ় মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তবু দুঃখ লাগল আমার এই দেখে যে, সে মুখ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে তাঁর এখনো কিছুটা কষ্ট হয়। অপারেশন হয়েছে। জিহ্বায় সম্মুখভাগটি কিছুটা প্রলম্বিত হয়ে গেছে। বললেন, কথা বলতে পারেন। তবে কোন শক্ত খাবারই জিহ্বায় দিতে পারেন না। জিহ্বা তা গ্রহণ করে গলায় দিতে পারে না। বাইরে বেরিয়ে আসে।

তবু আমার সঙ্গে আলাপে কোন কষ্টকে কষ্ট বলে স্বীকার করেন না। কোন নিষেধ শুনলেন না। নিজের হাতে আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। মিসেস বাসন্তী গুহঠাকুরতারও আপ্যায়নের বৈশিষ্ট্যটি পরিচিত মহলে প্রবাদের খ্যাতি অর্জন করেছ। আমার যে দু'দিন জাহানারা ইমামের কাছে গিয়েছি, সে দু'দিনই বাসন্তী দেবী তাঁর বাসা থেকে নিজের হাতে তৈরি পুডিং আর ক্ষীর জাহানারা ইমামের জন্য বাটিতে করেনিয়ে এসেছেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে সখিভাব। পরস্পরের মধ্যে 'তুমি'র সম্বোধন।

জাহানারা ইমাম আমার কাছে এসে বসলেন। আমাদের আলাপটি রেকর্ড করে রাখার জন্য আমি একটি শব্দ-গ্রহকও নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটি সামনে রেখে আমি জাহানারা ইমামকে আমার নিজের মনের আন্তরিক অনুভূতিকে প্রকাশ করে বললাম: "আপনার দেশব্যাপী আজ পরিচয়, আপনি রুমীর আম্মা। আপনার 'একাত্তরের দিনগুলি'র মধ্যে দিয়ে আমরা আপনারা রুমীকে চিনেছি। রুমীর আব্বা শরীফ সাহেবকে পেয়েছি। এবং এক ভিন্নতর জাহানারা ইমামকে পেয়েছি, যিনি কেবল একজন

সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মী নন। যিনি ত্যাগের সাহসী, বিপদে স্থির এবং আত্মপ্রকাশে যিনি অবিশ্বাস্যরূপে সংযমী। আপনি আমাকে বলুন: কেমন করে এমন দিন-লিপি আপনি সেই মহাবিপদের নয় মাস ধরে তৈরি এবং তাকে রক্ষা করেছিলেন।"

আমার এমন আবেগে জাহানারা ইমামের চোখেও আজ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। তিনি আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছলেন। বললেন, 'এটা আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। নিজের খাতায় টুকিটাকি লিখে রাখা। দিনাদিনের ঘটনা। কিন্তু একাত্তরের ঢাকায় বসে এসব লেখার বিপদ আমি জানতাম। তবু অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। কেবল নিজের বুদ্ধিতে আজেবাজে খাতার পাতায় এ-কোণ ও-কোণ করে, আঁকা-বাঁকা লাইনে, কখনো কালো কালিতে, কখনো রঙিন কালি দিয়ে প্রায় ছবির মত করে দিনের ঘটনাকে ইঙ্গিতে লিখে রাখার চেষ্টা করেছি। রুমীর নাম উল্লেখ করতে হলে উল্টে লিখেছি 'মীরু'। মুক্তিযোদ্ধাদের যদি পাঁচশ টাকা পাঠিয়েছি তো লিখেছি পাঁচখানা কাপড় লন্ড্রীতে দেয়া হয়েছে। বুদ্ধিতে যেমন কুলিয়েছে, তেমন করে লিখে রেখেছি। ভেবেছি, যদি হামলা হয়, যদি এ-কাগজ হানাদারদের হাতে পড়ে, তবে ওরা একে পাগলের আঁকি-বুকি ছাড়া আর কিছুই ভাববে না।

জাহানারা ইমামের বাসায় হামলা হয়েছিল। সেই আক্রমণেই গ্রেপ্তার হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা রুমী। গ্রেপ্তার হলেন শরীফ সাহেব। তবে জাহানারা ইমামের দিনলিপির খাতা সেদিন রক্ষা পেয়েছিল।

'বিচিত্রা'র সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী, 'সচিত্র সন্ধানী'র সম্পাদক গাজী শাহাবুদ্দীন: এঁদের কাছে অন্যসব পাঠকের মত, আমি অসীম কৃতজ্ঞতার বোধ করছি। যখন জাহানারা ইমামকে জিজ্ঞেস করি, 'কেমন করে আপনি 'একাত্তরের দিনগুলি' তৈরি করলেন'? তখন গভীর মমতা নিয়ে তিনি বললেন: এর জন্য দায়ী তো 'বিচিত্রা'র সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী, 'সচিত্র সন্ধানী'র গাজী শাহবুদ্দীন, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এঁরা। '৭১-এর আমার শরীর ও মনের তো চরম বিপর্যস্ত অবস্থা চলছিল। আমি কেবল রুমীর পথ চেয়ে থাকি। রুমী ফিরে আসবে। কিন্তু রুমী আর আসে না। আমি ছিলাম সেই একচক্ষু হরিণীর মত। এক চক্ষু হরিণী সমুদ্রের দিকে ওর কানা চোখটা রেখে ডাঙ্গার দিকে রেখেছিল ভাল চোখটা। ও ভেবেছিল, বিপদ আসবে ডাঙ্গার দিক থেকে, সমুদ্রের দিক থেকে নয়। ওর কি হয়েছিল, তা আমি জানিনে। কিন্তু আমার বিপদ তো দু'দিক থেকেই এল। রুমী দুরন্ত। রুমী ভবিষ্যতের দিকে দ্রুতবেগে ছুটে যেতে চায়। ওকে আমি হারাতে পারি– সে আশংকা আমার ছিল। তাই উদ্বিগ্ন চোখ রেখেছিলাম কেবল ওর দিকে। রুমীর আব্বা শরীফের দিকে ছিল আমার কানা চোখ আর বিশ্বাস। এদিক থেকে বিপদ আসবে, কল্পনা করিনি। অথচ রুমী আর ওর আব্বাকে হানাদাররা ধরে নিয়ে যাবার পর নির্মম অত্যাচার করে রুমীর আব্বাকে ফেরত দিলেও শরীফের শরীর ভেঙ্গে পড়ল। বিশ্বাস হতে না চাইলেও শরীফ আর আমি তো জানতাম, রুমীর কি হয়েছে। কিন্তু আমার চাইতেও শরীফের বেদনা অনেক বেশি দুঃসহ। এমপি হোস্টেলে ওর বুক থেকে তো ছিনিয়ে নিয়েছে রুমীকে জল্লাদের দল। তারপর রুমীকে কীভাবে হত্যা করেছে তা কল্পনা করা ছাড়া আমাদের আর তা জানার তো কোন উপায় ছিল না। সেই দুঃসহ কল্পনাতেই শরীফের ওপর আঘাত এল। একদিন মূর্ছিত হয়ে পরলেন। তারপর ১৪ই ডিসেম্বর হাসপাতাল থেকে ফিরে

এলেন এক নিষ্প্রাণ দেহ হয়ে। কানা চোখ হরিণী আমি। আমার বিপদ এল দু'দিক থেকেই।

'এমন অবস্থায় '৭১ থেকে '৮২ পর্যন্ত '৭১-এর দিন-লিপিগুলোর ওপর যখনি চোখ বুলিয়েছি, তখনি কেবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছি। বোধহয় '৮৪ কি '৮৫তে শাহাদাত এসে বলল: "আম্মা, আপনাকে '৭১-এর কাহিনী লিখতে হবে। আপনার ডায়রির ভিত্তিতে।"

রুমী-হারানো জননী অনেক সন্তানকে ফিরে পেয়েছেন। বললেন: 'শাহাদাত ওরাতো আমার রুমীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে ছিল। তার সঙ্গে অ্যাকশন করেছ। রুমী ফেরেনি। কিন্তু ওরা ফিরে এসে আমায় অক্লেশে 'আম্মা' বলে ডাক দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। ওদের দাবিতেই আমাকে একাত্তরের দিন-লিপি দিয়ে তৈরি করতে হয়েছে 'একাত্তরের দিনগুলি'।"...

আমি বললাম: 'একাত্তরের দিনগুলি' দেশ-কালের বেড়া ডিঙ্গিয়ে কতদূর যে বিস্তারিত হয়েছে, তা কি আপনি জানেন না জাহানারা ইমাম? পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় কবি এবং ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'পূর্ব-পশ্চিম'-এ আপনার নাম, রুমীর নাম উল্লেখ করে 'একাত্তরের দিনগুলি'র ওপর নির্ভর করে তৈরি করেছেন তার পরিচ্ছেদ।' জাহানারা ইমামের মুখ কথাটিতে আনন্দিত হয়ে উঠল। বললেন, 'ঐ সুনীলও এসে বললেন একবার, 'মুক্তিযুদ্ধের ছেলেরা সকলে আপনাকে আম্মা বলে। আমিও আপনাকে 'আম্মা' বলব। আমি কতবার পড়েছি আপনার 'একাত্তরের দিনগুলি'। যতবার পড়েছি, ততবার আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, আবেগ আর বেদনার অশ্রুতে। আমিও আপনাকে 'আম্মা বলে ডাকব।'

মানুষের বাস্তব জীবন কল্পনারও কত অধিক! '৭১-এর ফেব্রুয়ারিতেও আমরা '৭১-এর মার্চকে কল্পনা করতে পারিনি। এবং '৭১-এর ১লা কিংবা ৭ই মার্চ যে জাহানারা ইমাম, তাঁর স্বামী শরীফ সাহেব, টগবগে ফুটফুটে ছেলে রুমী গাড়িতে ঘুরে ঘুরে, রিকসায় চড়ে চড়ে শেখ সাহেবের মিটিং দেখেছেন, বাড়িতে ঘটনার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আর বিতর্কে পরস্পর খুনসুটি করেছেন, তাঁরা কল্পনা করতে পারেননি তাদের জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলিকে। আর সব মিলিয়ে জাহানারা ইমামের নিজের যে-রূপান্তর, তাও তাঁর কল্পনাকে অতিক্রম করে গেছে।

আমি আলাপ শেষে ওঠার আগে কথাটা তুলেছিলাম। 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক টেস্টামেন্ট বিশেষ দলিল। কেবল তাই নয়। এ সততায়, সত্যে, আবেদনে, পরিমিতিতে, সংযমের অত্যাশ্চার্য প্রকাশে একখানি ধর্মগ্রন্থের রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশের হাজার হাজার পাঠকের ঘরে এ গ্রন্থ আজ রক্ষিত। রক্ষিত হওয়ার মত গ্রন্থ। বাংলাদেশে কত তো পুরস্কার আর সম্মান প্রদানের প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলা একাডেমি আছে। খোদ সরকার আর রাষ্ট্রীয় পদকের কথা বাদই দিলাম। কিন্তু বাংলা একাডেমির তরফ থেকে 'একাত্তরের দিনগুলি' এবং তার লেখিকাকে কি উপযুক্ত কোন স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে? প্রশ্নটা আমার মনে অনেক দিন থেকেই জাগছিল। আমি দ্বন্দ্বে ছিলাম। হয়ত দিয়েছে। আমি জানিনে। কিংবা হয়ত দেয়নি। জাহানারা ইমামকে এ-কথা জিজ্ঞেস করতে আমার সংকোচ হচ্ছিল। তবু প্রশ্ন করতে বললেন: 'আমার বড় পুরস্কার তো অগণিত তরুণ-প্রাণ পাঠকের কৃতজ্ঞতা। তারা পড়েছে এ-বইখানা। তারা কখনো নানাভাবে, নানা উপঢৌকনে, নানা প্রশংসায়

তাদের মনের আবেগের প্রকাশ দিয়ে আমাকে আপ্লুত করে দিচ্ছে। তাদের ভালবাসার শেষ নেই। বাংলা একাডেমির কথা আপনি জিজ্ঞেস করাতে আমি বিব্রতবোধ করছি। তার মহাপরিচালক বয়সে আর প্রীতিতে আমার স্নেহাস্পদ। এ-বই তিনি পাঠ করেছেন। তাঁর ভাল লেগেছে। তাতেই আমি খুশি হয়েছি। এ-তাঁর ব্যক্তিগত প্রকাশ।'

আমি বুঝলাম, আমার কথাটা জিজ্ঞেস করা সঙ্গত হয়নি। আর তাছাড়া 'একাত্তরের দিনগুলিকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলা একাডেমি কিংবা বাংলাদেশের বর্তমান সরকার স্বীকৃতি জানাবে, তাকে অধিকতর সংখ্যক পাঠক সাধারণের কাছে লভ্য করে তুলবে, এমন যদি বাস্তব পরিস্থিতি হত, তাহলে একাত্তরের পরবর্তীকালে যে-রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক সংকট এমনিভাবে ঘনীভূত হচ্ছে, সে পরিস্থিতি হয়ত সৃষ্টি হত না। এখনো যদি জাহানারা ইমামকে সরকার তাদের প্রচুর খাদমিশ্রিত স্বর্ণের, তথা সমমানের একটি পদক প্রদান করে, তবে তাও করা হবে 'একাত্তরের দিনগুলিকে ম্লান করারই জন্য। তাকে উজ্জ্বল করার জন্য নয়। তাই জাহানারা ইমাম যে আজো বাংলা একাডেমি কিংবা বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক কোন স্বীকৃতি বা সম্মান লাভ করেননি, তাতে এখন আর আমি দুঃখবোধ করিনে। এবং এ-প্রশ্নে জাহানারা ইমামের জবাবটিতে আমি অনুপ্রাণিত বোধ করেছি। জাহানারা ইমাম, আমার উঠে আসার আগে, বললেন: "আমি মাটির প্রদীপ। আমার কর্তব্যটুকু সলতের শেষ তেল বিন্দুটি পর্যন্ত করে যাবার চেষ্টা করব। তাতেই আমার সার্থকতা।

ওঠার আগে আমি আবার রুমীর সামরিক পোশাক পরা তৈল-চিত্রটির দিকে তাকালাম। ২০-২২ বছরের তরুণ। কোমরের বেল্টে হাত গুঁজে, মাথায় সামরিক টুপি পড়ে দূরের দিকে আত্মবিশ্বাসের চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। গেরিলা যোদ্ধা রুমী স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত আলোয় এমন পোশাক পরতে পারেনি। এমন পোশাকে রুমী, তার আম্মার নিশ্চিয়ই কল্পনা। কিন্তু আপনি ঘরে ঢুকলে এই রুমীর দিকে না তাকিয়ে পারবেন না। রুমীর পোট্রেটটির নিচে উৎকীর্ণ রয়েছে কবি জীবনানন্দ দাশের এই উক্তিটি: আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়...

রুমীর আম্মা যথার্থই বিশ্বাস করেন তাঁর রুমী আবার, 'আসিবে ফিরে এই বাংলায়।'

১৮-৪-৮৮

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত লেখকের 'রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থ থেকে।

সঙ্গ-প্রসঙ্গের লেখা: সরদার ফজলুল করিম

সংগ্রহ ও সংকলন: শেখ রফিক, রোদেলা প্রকাশনী, ১১/১ ইসলাম টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সেই ডিসেম্বর এবং এই ডিসেম্বরের ভাবনা

সংবাদের সাহিত্য সম্পাদক ১৬ই ডিসেম্বরের জন্য একটি লেখার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধ পূরণের চেষ্টাতে উপরের শিরোনামটি দিয়ে কিছু লেখার চেষ্টা শুরু করেছিলাম। শিরোনামটি আমি গ্রহণ করেছি এর আকর্ষণীয়তার কারণে নয়। বস্তুত: ১৬ই ডিসেম্বরের রচনার এ ব্যতীত অপর কি শিরোনাম হতে পারে? কিন্তু এই শিরোনামকে ব্যক্ত করে নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করার আমার ক্ষমতা নেই।

১৬ই ডিসেম্বর অবশ্যই ১৬ই ডিসেম্বর। ১৬ই ডিসেম্বর যদি ১৬ই ডিসেম্বরকে স্মরণ করাতে না পারে তবে এই নাম অর্থহীন। আমি তাই ১৬ই ডিসেম্বরের আগমনে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ১৬ই ডিসেম্বরকে খোঁজ করছিলাম। এমন কিছু কি পাওয়া যায় যা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই ১৬ই ডিসেম্বর সেই ১৬ই ডিসেম্বরকে?

এই প্রয়োজনের সময়েই সৌভাগ্যবশত: হাতে এসে পৌছল বঙ্গভবনের একখানি সুমুদ্রিত সফেদ ভারী কার্ডের দাওয়াত পত্র: 'বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনায়' যোগদানের আমন্ত্রণ। এটা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয়। নিশ্চয়ই বিপুল সংখ্যক নাগরিককে এই 'বিজয় সংবর্ধনায়' আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাই স্বাভাবিক। ভেবেছিলাম এই দাওয়াতপত্র নিশ্চয়ই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে সেই ১৬ই ডিসেম্বরকে, বলে দিবে সেই ১৬ই ডিসেম্বর, দশম বিজয় দিবস এবং আমাকে কিছু হদিস দিবে কিসের বিজয়, কার ওপরে বিজয়? কিন্তু তার কোন হদিস বিজয় দিবসের এমন মনোহর কার্ডটিতে পাওয়া গেল না। বঙ্গভবনই অবশ্য বাংলাদেশের সব নয়। তবু বঙ্গভবনের একটি প্রতীকী অর্থ এবং মর্যাদা আছে। বঙ্গভবন হচ্ছে বাংলাদেশের পরিচালন কেন্দ্র। সেখানে যেই যান, তিনি শেখ মুজিবই হোন আর জিয়াউর রহমানই হোন, তাঁর দায়িত্ব দেশকে দিগদর্শন করাবার। তাই দেশবাসী চেয়ে থাকে বঙ্গভবনের দিকে। কোন দিকের নির্দেশ দিচ্ছেন বঙ্গভবনের পরিচালকবৃন্দ এবারের ১৬ই ডিসেম্বর?

অব্যাখ্যাত বস্তুর সুবিধা এই যে তাকে আপনি নিজের মনোমত যে কোন ব্যাখ্যায় মণ্ডিত করতে পারেন। সেদিক থেকে একেবারে ব্যাখ্যাহীন, পরিচয়হীন 'বিজয় দিবস' শব্দটি দিয়ে তৈরী শুভ্র কার্ডটির এই গুণ যে এর মধ্যে অলিখিত ব্যাখ্যাকে আপনি নিজের ব্যাখ্যায় পূর্ণ করে দিতে পারেন। ১৯৮১ সালের উন্মেষের পূর্ব মুহূর্তে তৈরী এমন নির্বাক লিপি ১৯৮০ সালের উন্মেষের পূর্ব মুহূর্তে তৈরী এমন নির্বাক লিপি ১৯৮০ সালে শত দল ও মতে বিভক্ত বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনেরই হয়ত বা উপযুক্ত পরিচয়।

কিন্তু আমার মত দুর্বল কল্পনার ব্যক্তির পক্ষে এমন বিমূর্ত লিপি খুব সাহায্যকারী নয়। আমি নিরেট বাস্তব। একজন ছাপোষা মধ্যবিত্ত শিক্ষক। আজকের ১৬ই ডিসেম্বরকে এমন বিমূর্তভাবে আমি কল্পনা করতে পারিনে।

সেই ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা শহর কি দৃশ্য ধারণ করেছিল তা আমি নিজের চোখে দেখিনি। কেননা সেদিনও আমি ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে নতুন বিশ ডিগ্রীর একটি সেলে আবদ্ধ। আমার পাশের সেলে প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ের লেখক জনাব কামরুদ্দীন আহম্মদ। ১৬ই ডিসেম্বরের ঢাকার রাস্তা

দেখিনি। কিন্তু আমরা দু'জন সেই কারাগারের মধ্যে বসেও বাংলার আকাশে পরিবর্তনের আঁচ পাচ্ছিলাম। প্রতিমুহূর্তে কি ঘটে, কি ঘটতে পারে তার জন্য ব্যাকুলভাবে সেই বন্ধ সেলের দরজার কাছে এসে আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। দিনের বেলা যখন একটু পায়চারি করতে পারতাম তখন সেলের বাইরে আঙ্গিনাতে এসেও আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সে আকাশে তখন পাকিস্তানের জেটের সঙ্গে মুক্তি বাহিনীর পক্ষে সংগ্রামরত প্রতিবেশী ভারতের জঙ্গী জেটের অগ্নিযুদ্ধ। সে যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত গোলার খণ্ড এসে পড়ত জেলের মধ্যেও, সেই গোলার টুকরা সংগ্রহ করেও বন্দীশালার শত শত বন্দী আনন্দে অধীর হয়ে উঠতে মুক্তির আশায়। পাকিস্তানী ফৌজের কাছে বিমান থেকে ছড়িয়ে দেওয়া মুক্তিবাহিনী ও যৌথ বাহিনীর চরমপত্রের নমুনাও এসে পৌঁছেছিল কারাগারে আবদ্ধ বন্দীদের কাছে। প্রতিমুহূর্তে আমরা সবাই আশা করছিলাম, এ কারাগারের বন্ধ দরজা মুক্তিবাহিনীর তরুণেরা এসে মুক্ত করে দেবে। এবং সত্যিই তাই তারা দিয়েছিল। ১৭ই ডিসেম্বর সকাল না হতেই রাইফেল কাঁধে ১৪ আর ১৬ বছরের তরুণরা জোর করে কারাগারের বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছিল আর সেই মুক্ত দরজা দিয়ে বাধ ভাঙ্গা স্রোতের ন্যায় সকল বন্দী বেরিয়ে এসেছিল।

* * *

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮০ পুরো ন'টি বছর। প্রায় এক দশক। কালের বুকে এ হয়ত মুহূর্ত মাত্র। তবু এই ন' বছরে কত অভিজ্ঞতাই না আমাদের হল। ঘনীভূত আর্থিক, সাংসারিক নানা কষ্ট এবং দুর্দশার মধ্যে একমাত্র সম্পদ হচ্ছে এই অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য।

কামরুদ্দীন সাহেব আমার চাইতে বয়সে প্রবীণ। সুতরাং আমার চেয়ে অধিক দেখেছেন জীবনকে। রাষ্ট্রদূত হিসাবে নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। ১৯৪৭-এর পূর্বে মুসলিম লীগ আন্দোলনের অগ্রগামী প্রগতিশীল ধারার অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন জনাব কামরুদ্দীন। ১৯৪৭-এর পরবর্তী পূর্ব-বাংলার জীবনের যে সামাজিক বিকাশ ও রাজনৈতিক বঞ্চনা, তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে তাঁর একাধিক গ্রন্থে। ১৯৭১ সালে তিনি আর কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন না। নিজের পারিবারিক বিষয়াদিতেই ব্যাপৃত ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও ছিল না বহুদিন। সাক্ষাৎ ঘটল সেই '৭১-এর সেপ্টেম্বর মাসের ৭ কিংবা ৮ তারিখে।

তখন অবরুদ্ধ পূর্ববাংলা: বাংলাদেশ। দিনে রাতে রাস্তায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আতঙ্ক বিস্তারী চলাচল। রাতে স্টেনগান, ব্রেনগান ও গ্রেনেড বিস্ফোরণের আকস্মিক চমক, ওয়াকীটকি হাতে পাকিস্তানী চরদের বাড়ীতে বাড়ীতে হামলা ও নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাওয়া।

তখন যে কোন একটি সৎ অসহায় গৃহী, কর্মচারী বা গ্রামবাসীর মনের কথাই সব মানুষের মনের কথা, মনের অবস্থা। '৭১-এর ২৫শে মার্চের পরে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের কোন মানুষের মনে আর মৃত্যুর আতঙ্ক বলে কিছু ছিল এমন আমি মনে করতে পারিনে। কারণ দৈহিকভাবে মানুষের মৃত্যুর পরে আর মৃত্যুর আতঙ্ক থাকে না। কিংবা জীবিত হিসাবেও যদি বলি তাহলেও বলতে পারি, যার পিঠ যেয়ে দেয়ালে ঠেকে, মৃত্যু বাদে যার আর কোন উপায় থাকেনা, সে মুখ দিয়ে 'হ' বলুক, কিংবা 'না' বলুক তখন তেমন মানুষের মনে আর যে ভয়ই থাকুক, মৃত্যুর ভয় আর থাকে না।

এমনি মনোভাব নিয়েই আমাদের সেই অবরুদ্ধ জীবনের দিনযাপন। ব্যক্তিগতভাবে

আমারও। তাই ৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় বাংলা একাডেমিতে নিজের কাজের টেবিলের দু'পাশে যখন কয়েকটি পাকিস্তানী চর এসে আমার নাম ধরে ডেকে 'ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট' বলে অপেক্ষমাণ সশস্ত্র জীপে নিয়ে উঠাল, তখন আর অপ্রত্যাশিতের কোন চমকে আমি চমকিত হইনি কিংবা মৃত্যুর ভয়তেও নয়। যা কিছু চমক সে এই ভেবে যে, এরা কখন হত্যা করবে এবং এই বিলম্বের কারণটাই বা কি?

কিন্তু যেটি আমাকে চমকে দিয়েছিল সে আমার সেই জীপেই প্রবীণ কামরুদ্দীন সাহেবের আরোহণ। আমাকে তুলে নিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর জীপটি সমস্ত শহরে টহল দিয়ে মতিঝিল ব্যবসায় কেন্দ্রের একটি অফিস থেকে যে ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করে আমার জীপে ওঠাল– দেখলাম তিনি কামরুদ্দীন আহমদ। এটা আমাদের পরস্পরের জন্য যেমন আকস্মিকতা এবং চমকের ব্যাপার ছিল তেমনি নিশ্চয় ছিল আনন্দের। বধ্যভূমিতে একজন বন্ধুকে কাছে পাওয়া, নীরবে নিঃশব্দে বাক্যহীন ভাষায় একে অপরকে বলা, ভয় কি, আমি তো পাশে রয়েছি, এ এক অপার পাওয়া।

কিন্তু এ কাহিনীর সবিস্তার বর্ণনা আজ নয়। হয়ত তার প্রয়োজনও নেই। এর চেয়েও মর্মান্তিক কাহিনী সেদিন হাজার লক্ষ বাঙ্গালীর জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু আজ কামরুদ্দীন সাহেবের কথা মনে পড়ছে। বন্দীশালার সেই বিশ নম্বর ডিগ্রীর সেলে বসে তাঁর একটি প্রশ্নের কথা স্মরণ করে। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন: আপনার কি মনে হয়? বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে?

এ প্রশ্নেও পরস্পরকে ভরসা দেওয়ার আবেদন ছিল। আমি সেদিন বলেছিলাম: অবশ্যই পারবে।

আমার সে জবাব শুধু অস্তিত্ব রক্ষার সাধারণ অর্থের দিক থেকে ছিল না। ১৯৭১-এর বাংলাদেশ আমার মত একজন সাধারণ মানুষকেও নানা বিস্ময়কর জ্ঞানে জ্ঞানী করে তুলেছিল। এমন জ্ঞান কারু পক্ষে বইপুস্তক থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্যই মানুষের জীবনের সংগ্রামের ইতিহাসের শিক্ষা এই। তবু ইতিহাস থেকে সংগ্রামের শিক্ষা মুখস্থ করে মানুষ বাস্তব সংগ্রামের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। একটা সংগ্রাম কেমন করে আস্তে আস্তে শক্তি সংগ্রহ করে, কেমন করে ঘটনার পর ঘটনায় সে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, গ্রাম থেকে গ্রামে, গঞ্জ থেকে গঞ্জে পরিব্যাপ্ত এবং পরিশেষে একটা জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি মানুষকে হয় এ পক্ষের, নয় ও পক্ষের অঙ্গীভূত করে জড়িয়ে ফেলে তার এমন সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা আমার ব্যক্তিগত জীবনে আর কোনদিন ঘটেনি, যেমন ঘটেছিল ১৯৭১-এ। বাংলাদেশ পারবে, এ জবাব ছিল আমার এই বোধ থেকে যে, বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১-এর এই মহা আলোড়নে যে ভাবে আ-শিকড় নড়ে উঠেছে তাতে সে একটি সুখী, সঙ্গতিপূর্ণ জীবনকে অবশ্যই বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হবে। আজো কামরুদ্দীন সাহেব বেঁচে আছেন। পূর্বের মতোই আমাদের সাক্ষাৎ বিরল। কিন্তু আজ মনে একটা আশঙ্কা জাগে, যদি তিনি আমার সেদিনকার সেই জবাবটি পালটে দিয়ে বলেন: কি, বলেছিলেন তো পারবে। কিন্তু-?

হ্যাঁ, এ নয় বছরের জীবনে অবশ্যই নানা কিন্তু উদয় হয়েছে আমাদের জীবনে। আমি রাজনীতি করিনে এবং আমরা কেউ অমর হব না। তবু আজো বিশ্বাস করবো, সমস্ত কিন্তুরই জবাব আছে। সংগ্রামরত মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতা, উত্থান-পতন আগুপিছুর মধ্য দিয়ে সে জবাব দিতে দিতে অগ্রসর হয়। সেজন্যই বলব, 'বিজয় দিবস' শব্দটিকে যে কেউ যতোই পরিচয়হীনভাবে মুদ্রিত করুক না কেন, আমূল আন্দোলিত বাংলাদেশের

সংকটদীর্ণ মানুষকে ১৯৭১-এর পূর্বে ফিরিয়ে নেওয়া কোন মহাবীরের পক্ষেই সম্ভব হবে না।

ঢাকার রাস্তায় সেই ১৬ই ডিসেম্বর, মানে ডিসেম্বরের বা মার্চের সাক্ষাৎ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বৃথা। এমন কি যে বাংলা একাডেমিতে আমি সেদিন কাজ করতাম, আমার টেবিলের পাশে যে লোহার আলমারিটি পাকিস্তান বাহিনীর কামানের গোলায় ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল এবং একাডেমির পরিচালক অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর ঘরে কামানের যে গোলাটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং যার ভারী অবশিষ্টাংশকে আমরা ২৭শে মার্চ বিধ্বস্ত ভবনের মধ্য থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যা কোন যাদুঘরে রক্ষিত হয়নি, তাও আজ চারদিককার সংঘবদ্ধভাবে সবকিছু ভুলে যাবার এবং ভুলিয়ে দেবার চেষ্টায় বিলুপ্ত।

তবু ১৬ই ডিসেম্বরের স্মৃতিবাদে ১৬ই ডিসেম্বর পালন একেবারেই অর্থহীন। একেবারেই অবাস্তব। ইংরেজীতে বললে একেবারে অ্যাবসার্ড।

বাস্তব জীবনের এই অবাস্তবতা বা অ্যাবসার্ডিটি থেকে মুক্তির জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুরোন পত্রিকার রক্ষক সহকারীকে কয়েকদিন আগে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, আপনি '৭১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের কোন একটি পত্রিকা, বিশেষ করে বাংলা পত্রিকা, কি আমাকে দেখাতে পারেন? দৈনিক 'ইত্তেফাক' বা 'সংবাদ'-এর কথা আমি উল্লেখ করিনি। কারণ দৈনিক 'ইত্তেফাক'কে পাকিস্তান বাহিনী জ্বালিয়ে দিয়েছিলো ২৬ মার্চ, দিনের বেলাতেই। বন্ধুবর রোকনুজ্জামান খান পরে বলেছিলেন। দৈনিক ইত্তেফাকের পোড়া বিধ্বস্ত মেশিনঘর থেকে পাওয়া গেছে কর্মরত শ্রমিকদের মাথার খুলি। 'সংবাদ'কেও সেই একই সময়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর সেই জ্বলন্ত 'সংবাদ'-এর আশ্রয়ে দগ্ধ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী অন্যতম কিশোর সাহিত্যিক শহীদ সাবের।

কাজেই ১৯৭১ সালের অবরুদ্ধ বিপর্যস্ত বাংলাদেশের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের 'দৈনিক ইত্তেফাক' বা 'সংবাদ'-এর খোঁজ নিরর্থক। আমার ভরসা ছিল 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর উপর। এতো বিধ্বস্ত হয়নি। হোক না সরকারী মুখপত্র সেদিনকার। তবুতো সেখানে কর্মরত ছিলেন বাঙ্গালী। দেখা যাক না সেই পত্রিকারই নভেম্বর-ডিসেম্বর–দুটি মাসের কয়েকটি সংখ্যা। গ্রন্থাগারের সহকারী বন্ধুকে ধন্যবাদ। তিনি বিনা বিলম্বে বার করেছিলেন সেদিনকার 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর নভেম্বর মাসের কয়েকটি সংখ্যাকে। সেদিনকার 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর কয়েকটি সংখ্যা নাড়তে নাড়তে যেমন আমি শিহরিত হয়ে উঠেছিলাম নানা ঘটনার বিবরণে আর ছবিতে তেমনি নিজে ফিরে পেয়েছিলাম বাস্তবভাবে ১৯৭১-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরের জীবনকে।

একটু আবেগের সঙ্গে 'সংবাদ'–এর সাহিত্য সম্পাদককেও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, আপনারা যখন ২৬শে মার্চ কিংবা ১৬ই ডিসেম্বর প্রতিবছর পালনই করেন এবং যখন তার উপর লেখার অভাব বোধ করেন তখন পারেন না কি ২৬শে মার্চ সেই ২৬শে মার্চের পত্রিকাকেই একেবারে হুবহু মুদ্রিত করে দিতে, ১৬ই কিংবা ১৮ই ডিসেম্বর সেই ১৬ই কিংবা ১৮ই ডিসেম্বরকে হুবহু মুদ্রিত করে দিতে? কি অসুবিধা আপনাদের? কারণ আমরা পাঠকরা ১৬ই ডিসেম্বর তো ১৬ই ডিসেম্বরকেই পাঠ করতে চাই।

* * *

'দৈনিক পাকিস্তান'-এর নভেম্বর মাস। তখনো নিয়াজীর সদম্ভ হুঙ্কার। ছড়ি হাতে তার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ময়মনসিংহ কি সিলেট, কি রাজশাহী রংপুরের সেনা ছাউনিতে গমন,

তারই ছবি। শুধু তার ছবি নয়। ছবি গভর্নর ডাক্তার মালেকের। এবং পাকিস্তান রক্ষায় জানকবুল এককালের গণতান্ত্রিক দলের নেতা মাহমুদ আলী থেকে হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক দলের নেতা, জনাব সোলায়মান সাহেবদের বাণী, বিবৃতি, নসিহত। এরও পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক। আমাদের যাদুঘরের সুউচ্চ দালান তৈরী হচ্ছে। কিন্তু তাতে এই জীবনের অনপনেয় কোন স্বাক্ষর নেই। শুনেছি নিজেদের সংগ্রামের ঐতিহ্যে গঠিত জাতি তার জীবনের ইতিহাসের প্রতি পর্যায়কে দেয়াল চিত্রে শিল্প এবং কারিগরির নানা মাধ্যমে ঘর-বাড়ী, বাজার বন্দর হুবহু রক্ষায় এমন যত্নবান হয় যে, প্রতিযুগের শিশু কিশোর এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে তার নিজের পূর্বপুরুষদের সকল মহৎ সংগ্রাম ঐতিহ্যের পরিচয় লাভ করে জীবনের পথে অধিকতর অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। আর আমাদের এখানে জাতীয় অতীত মহৎ ঐতিহ্যকে রক্ষা নয়, কেবল মুছে ফেলার, কেবল ভুলে যাবারই সুকৌশল প্রচেষ্টা চলছে।

'দৈনিক পাকিস্তান'-এর নভেম্বর মাসের সংখ্যাগুলি ওলটাতে ওলটাতে নীচের খবরটিতে আমার দৃষ্টি আটকে গেল:

দৈনিক পাকিস্তান: ১০ই নভেম্বর, ১৯৭১

চারজন প্রফেসর দণ্ডিত।

ঢাকার বিশেষ সামরিক আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন প্রফেসরকে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেককে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে বলে গতকাল মঙ্গলবার এক প্রেস রিলিজে উল্লেখ করা হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই চারজন অধ্যাপকের বিচার তাদের অনুপস্থিতিতেই করা হয়েছে। ৫নং সামরিক বিধির অধীনে আনীত অভিযোগসমূহের জবাব দানের জন্য তাদেরকে গত ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকার ৬ নম্বর সেক্টরে এম, এস, এল-এর আদালতে হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দণ্ডিত প্রফেসরগণ হচ্ছেন:

১. প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. প্রফেসর সারোয়ার মুরশেদ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এ খবরটির কথা আজকের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক ক'জন জানে কিম্বা মনে রেখেছে? কত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ হচ্ছে। এ খবরটিকেই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত তার কোন একটি মূল শিক্ষা ভবনের প্রবেশপথের দেয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ করে রাখা। তবেই না বর্তমানের তরুণ ছাত্র-ছাত্রী সেই ১৯৭১-এর সংগ্রামে তাদের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা সেদিন জীবনপণ করে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের জীবনের পরিচয় লাভ করতে পারবে, যে পরিচয় তাদেরকেও সমাজকে অগ্রসর করে নেওয়ার সংগ্রামে নিবেদিত-প্রাণ হতে উৎসাহিত করবে। অবশ্য আজকের দিনে এ প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। কারণ শহীদ শিক্ষকদের যে নামের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শিক্ষা ভবনের সম্মুখের চত্বরে স্বাধীনতা-উত্তরকালে অন্তত: কাগজের বুকে লিখিত হয়েছিল তাদের নামের যে তালিকাও আজ বিলুপ্ত।

দৈনিক পাকিস্তান-এর সংখ্যা ওলটাতে ওলটাতে দৃষ্টি পড়ল নীচের সংবাদটিতেও:

দৈনিক পাকিস্তান: ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭১
শেখ মুজিবের বিচার এখনও শেষ হয়নি।
রাওয়ালপিণ্ডি: এপিপি, ১লা ডিসেম্বর: বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার এখনও শেষ হয়নি। একজন সরকারী মুখপাত্র আজ এখানে সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন।
দৈনিক পাকিস্তান, ১১ই ডিসেম্বর সংখ্যায় কয়েকটি সংবাদের শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ:
* ভারতীয় বাহিনীর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি।
* পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিয়েছে।
* জেনারেল নিয়াজীর উক্তি: আমি এখনো পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমার সেনাবাহিনীকে পরিচালন করছি...।
তারপর ১২ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সংখ্যা কটি আর পেলাম না। এটাই স্বাভাবিক। ১২ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা শহরের জীবন যে কেমন চলছিল তা একমাত্র সেদিনকার ঢাকাবাসীই বর্ণনা করতে পারেন। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকেই ঢাকা শহরে জারি করা হয়েছিল রাত দিন ২৪ ঘণ্টার সান্ধ্য আইন। আর এই সান্ধ্য আইনের আড়ালে পাক বাহিনী আর তার বাঙ্গালী দোসর রাজাকার, আলবদর, আল শামস চালিয়েছিল ইতিহাসের বর্বরতম বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞ।
১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর পতন ও আত্মসমর্পণ ঘটে। ১৬ তারিখে ঢাকাসহ বাংলাদেশ মুক্ত হয় পাকিস্তান বাহিনীর হাত থেকে।
১৮ই ডিসেম্বর তারিখের 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সংখ্যাটি সেদিনকার পত্রিকার কর্মীদের আবেগ, কল্পনা ও দক্ষতার অপূর্ব স্বাক্ষর নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ দিনের অপর কোন পত্রিকার কথা জানিনে। কিন্তু 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সেই সংখ্যাটির একটি হুবহু মুদ্রণ কিংবা বাংলাদেশের যাদুঘরে কোন ভাস্কর যদি তাকে উৎকীর্ণ করে রাখেন পাথরের বুকে তবে তা বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এক অপার অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।
১৮ই ডিসেম্বর '৭১-এর 'দৈনিক পাকিস্তান'–এর নাম ফলকটি ছিল 'পাকিস্তান' শব্দটিকে কেটে দিয়ে **'দৈনিক বাংলাদেশ'** রূপে।
তার প্রথম পৃষ্ঠায়। বিরাট হরফে খোদিত ছিল:
সোনার বাংলা আজ মুক্ত স্বাধীন:
জয় সংগ্রামী জনতার জয়
জয় বাংলার জয়
সেই বড় হরফের শিরোনাম 'জয়, বাংলার জয়' দিয়ে 'দৈনিক বাংলাদেশ'-এর রিপোর্টর যে লেখাটি লিখেছিলেন নামহীন লেখকের সেই লেখাটি আবেগ, আনন্দে এবং অনুপ্রেরণায় ছিল পরিপূর্ণ। সে লেখাটিও স্মরণীয়।

* * *

সেই ডিসেম্বরের এই চিত্র আজ গবেষণা করে, অন্বেষণ করে বার করতে হচ্ছে। কিন্তু কাগজের পৃষ্ঠা পোড়া ইট নয় যে, অন্তত: পঞ্চাশ কি একশ' বছর পরও সে অক্ষত থাকবে। এ চিত্র আজ যত কষ্টকরভাবে প্রাপ্য, আগামী বছর তা আরো দুষ্প্রাপ্য এবং কালক্রমে অপ্রাপ্য হবে। এই আশঙ্কাটাই এই ডিসেম্বরের আশঙ্কা। সেই ডিসেম্বরের পরিচয় তাহলে আমার কিশোর পুত্র তিতুকে কেমন করে দেয়া সম্ভব হবে? প্রশ্নটা কাল্পনিক নয়।

আমার অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত কিশোরপুত্র তিতু তার সমাজ পাঠের ইতিহাস অংশ থেকে '৭১ সালের ঘটনার একেবারে নিষ্প্রাণ বর্ণনার যে অংশটি দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'আব্বা' ৭ই মার্চের ঘোষণাটি তাহলে কে দিয়েছিল? সে অংশটি বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে ইতিহাসকে কিশোরদের কাছে বিকৃত করে তাদের বিভ্রান্ত করার একটি সচেতন সুকৌশল চেষ্টার দৃষ্টান্ত বলেই বিবেচিত হবে। আমার পুত্র যে অংশটিতে প্রশ্ন তুলেছিল সেই হুবহু নীচে তুলে দেয়া হল। গ্রন্থের নাম 'সমাজ বিজ্ঞান', অষ্টম শ্রেণির জন্য, বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাক পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী, ১৯৮০:

সংঘর্ষের কারণ

"জেনারেল ইয়াহিয়ার ঘোষণা মতে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ নবনির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় বসার কথা ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের খাতিরে তিনি তাহা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। কারণ ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া খান পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ দল পশ্চিম পাকিস্তানের সাহায্য ব্যতিরেকেই ভোটাধিক্যে ইহার ছয় দফা দাবী আদায় করিয়া লইতে সমর্থন [শব্দটি বইতে এভাবেই মুদ্রিত] হইবে।
পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ জেনারেল ইয়াহিয়ার এই কাজকে উদ্দেশ্যমূলক ষড়যন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক জনসভায় সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট ও অহিংস আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করিলেন। অতঃপর দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু হইল।"

-পৃ. ১৯০: সমাজপাঠ, অষ্টম শ্রেণী, ১৯৮০।

আমার পুত্রকে আমি জবাব দিতে পারিনি। বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের কাছে আমারও তাই প্রশ্ন: ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক জনসভার কে আহ্বায়ক ছিল? 'ঐতিহাসিক জনসভায় সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট ও অহিংস আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করিলেন' এ বাক্যের কর্তা কে? ঘোষণার তো একজন ঘোষক আবশ্যক, সে ব্যক্তিই হোক, সংগঠনই হোক। পাশের পৃষ্ঠায় শেখ মুজিবর রহমান বলে একজন ব্যক্তির ছবি যদি ১৯৮০ সালে মুদ্রিত করা যায় তাহলে '৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট ও অহিংস আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করিলেন'–এ কথাটিও ব্যাকরণ এবং সত্য–উভয়ের খাতিরে লিখতে হয়। আজকের ঐতিহাসিক অবশ্যই ব্যাখ্যামূলকভাবে লিখতে পারেন, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সে ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সকল দল ও মতের মানুষের কামনারই প্রতিধ্বনি। তাই অতঃপর দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু হইল। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করে এবং বিকৃত করে জাতির শিশু কিশোরকে বিভ্রান্ত করার অধিকার কোন বর্তমান সময়েরই কোন বর্তমান সরকার এবং তার বিভাগ উপবিভাগের থাকে না, এ সত্যটি আমরা উপলব্ধি করতে পারব কবে? ॥ ১৯৮০ ॥

নানা কথা এবং নানা কথার পরের কথা
সরদার ফজলুল করিম, প্যাপিরাস, ১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

বরিশালের মুক্তিযোদ্ধা কবিরের কাহিনী

বরিশালের মুক্তিযোদ্ধা কবিরকে আমি এর আগে জানতাম না। আকস্মিকভাবেই তার সাথে আমার দেখা হয় মাত্র কয়েক মাস আগে। গেল বছরের নভেম্বর মাসে বরিশালে আমি গিয়েছিলাম অন্যতম প্রবীণ সাম্যবাদী নেতা মুকুল সেনের কিছু স্মৃতিকথা সংগ্রহ করতে। তাঁর বাসায় তাঁর সঙ্গে আলোচনাকালে বরিশালের অপর এক মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার জাহিদ কবিরকে নিয়ে এসে আমার সামনে উপস্থিত করে বললেন, এর কাহিনী আপনাকে শুনতে হবে। আমার তখন হাতে সময় ছিল কম। বরিশাল থেকে ফিরে আসার ব্যস্ততা। তবু ঘরের একপাশে গিয়ে তাকে নিয়ে বসতে কবির তার ১৯৭১ সালের কাহিনী বলতে লাগলো। তার বলার ভঙ্গিটি দ্রুত, বিরামহীন। সে-কাহিনীর মধ্যে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পরে যে নৃশংস অত্যাচার সে ভোগ করেছে, সে কাহিনী যখন কবির বর্ণনা করছিল এবং বর্ণনার আবেগে মাঝে মাঝে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল, তখন আমি অবাক বিস্ময়ে তরুণ এই যোদ্ধাটির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। এখনো তাকে দেখলে কলেজের একটি ছাত্র বলে বোধহয়। ১৯৭১-এর সেই নির্মম অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও আজো তার যৌবনদৃপ্ত দেহটির ঋজুতা দর্শক মাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৭১ সালে বি এম কলেজে পড়তো। তখন তার বয়স কুড়ি কিংবা একুশ। আজ ১৯৭১-এর পনের বছর পরে সে বয়স অবশ্যই ত্রিশ উত্তীর্ণ হয়ে পঁয়ত্রিশ কিংবা ছত্রিশ।

কবিরের কাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, আহা, কবিরের নিজের মুখের এমন দৃপ্ত বর্ণনাটি যদি আমি অপর পাঁচজনকে শোনাতে পারতাম! বরিশালে বসে তার সব কাহিনী শুনতে পারিনি। অথচ ১৯৭১-এর যুদ্ধ থেকে তার নিজের কোনো বৈষয়িক প্রাপ্তি ঘটেনি। নিশ্চয়ই অপর দশজনের তা ঘটেছে। তার পরিচিতজনদের। কিন্তু সেই দুঃখের চাইতে তার বড় দুঃখ, নিজের জীবনের কাহিনী সে কাউকে শোনাতে পারলো না। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তার বোধ-বিবেচনা থেকে কথার সুরে একটি হতাশার ভাব ফুটে উঠছে। আমার সঙ্গে অসমাপ্ত কাহিনীর মাঝখানে কবির আমাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করে বলে উঠেছিল: স্যার, আমি জীবনে কিছু চাইনে। আজো যদি প্রয়োজন হয় আমি আবার স্টেনগান, ব্রেনগান হাতে লড়াই করতে পারি। আমি সব রকম অস্ত্র চালনারই কৌশল জানি। "একজন মুক্তিযোদ্ধার মুখে হতাশার সুর আমাকে আঘাত করে সবচাইতে বেশি। আমরা নিজেরা বয়সের ভারে পীড়িত। আমাদের তরুণ সন্তান-সন্ততির হতাশা কাটানোর উপায় কি আমাদের জানা? তবু আমি তাকে বললাম: দেশের মুক্তিযোদ্ধা কি কেবল স্টেনগান, ব্রেনগান হাতেই লড়াই করে? নিজের জীবনের মহৎ আদর্শ রক্ষায় জীবনের সর্বপর্যায়ে ত্যাগ-তিতিক্ষার অস্ত্রই যে তার বড় অস্ত্র। তার প্রয়োজন আজো ফুরোয়নি। এবং তেমন অস্ত্রকে শান দিয়ে সে উজ্জ্বল করতে পারে। তার সে শক্তিতে আমার বিশ্বাস আছে।

তার মনের দুঃখ এবং হতাশা-বোধটিকে কাটানোর জন্য এই সঙ্গে আমি আর কেবল এই বলেছিলাম: আপনার এই নির্মম অত্যাচার ভোগ করেও বেঁচে থাকার মধ্যে যে জীবনীশক্তির পরিচয় আছে, তা অপর দশজনের কাছে বলার প্রয়োজন আছে। আমি

যথাসাধ্য তার চেষ্টা করবো। আপনি যদি লিখে দিতে পারেন, খুব ভালো হয়। না হলেও আজকাল ক্যাসেট-রেকর্ডের তো কোনো অসুবিধা নেই। আপনার কাহিনী ক্যাসেট করে আমাকে পাঠাবেন। আমি তা থেকেই আপনার কাহিনী লিখে নেয়ার চেষ্টা করবো। আপনি পাঠাবেন কিন্তু।

কবিরের আন্তরিকতার এই আর এক পরিচয় যে, সে আমার সেই দাবিকে রক্ষা করেছে। তারই অপর দু'জন সাথি আনোয়ার জাহিদ এবং ছাত্রকর্মী টিপুর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে নিজের জীবনের কাহিনী রেকর্ড করে আমার কাছে সে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার সেই রেকর্ড বাজাতে গিয়ে আমার নিজের দায়িত্ব পালনটি আবার অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

আমার কেবল আশঙ্কা ১৯৭১-এর পনের বছর পরে দেশে যে রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাতে বরিশালের তরুণ সমাজে 'বুলু' বলে পরিচিত কবিরের এই কাহিনীকে কি আমি পাঁচজনের মনের দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারবো? তবু সে চেষ্টার প্রয়োজন আছে। ১৯৭১-এর যুদ্ধের অযুত সংগ্রামী কতোজনের কাহিনী অন্তরঙ্গভাবে আমরা জানি? সে কাহিনী সংগ্রহের তেমন জাতীয় প্রচেষ্টা কোথায়? অথচ ১৯৭১-এর সেই কাহিনীতেই আমাদের জীবন। তার বিস্মরণেই আমাদের মৃত্যু– এ-সত্যে তর্কের কোনো অবকাশ নেই। কোনো বিতর্ক হতে পারে না। এই বোধ থেকে নিচে কবিরের নিজের জবানবন্দীতে ১৯৭১-এর মার্চের পরে বরিশালের গ্রামাঞ্চলে পাক হানাদার বাহিনী মোকাবিলার এক পর্যায়ে গ্রেপ্তার হয়ে যাবার এবং তার পরবর্তীকালে তার ওপর হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের বর্ণনাটি সংক্ষেপে পেশ করার আমি চেষ্টা করছি।

আমার ভালো নাম এ এম জি কবির। 'বুলু' নামেই আমি বরিশালে সবার নিকট পরিচিত। বি এম কলেজে থেকে ১৯৬৯-এ আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করি। পাস করার পরে ১৯৭০-এ আমি বি এ পড়তে শুরু করি। সত্তরের পরে আসে একাত্তর। কলেজে আমি একবার কমনরুমের সেক্রেটারি হই। জি এস-এর জন্য একবার কম্পিট করেছিলাম। কিন্তু ৭ ভোটের জন্য আমি 'ডিফিটেড' হই। ১৯৭১-এর পূর্বে ১৯৬৯ থেকে যে গণআন্দোলন শুরু হয়, তাতে বিভিন্ন পর্যায়ে আমি অংশগ্রহণ করি।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ ঢাকার বুকে এক বিপর্যয় নেমে আসে এবং ঐ তারিখ থেকে বাংলাদেশে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী এক গণহত্যা শুরু করে। ২৫ মার্চ ঢাকার বুকে যখন এই গণহত্যা শুরু হয়, তখন তার খবর পেয়ে বরিশালে নুরুল ইসলাম মঞ্জু, মেজর জলিল, ক্যাপ্টেন হুদা: এদের তরফ থেকে একটা ডাক দেয়া হয়। আমি কলেজের ইউ ও টি সির সার্জেন্ট হিসেবে সেদিন প্রথম সাড়া দিই। এবং আমাদের একটা লিস্ট হয়। আমরা সেই লিস্টে ১৫ জনের নাম দিই। আমি যখন বি এম কলেজের ইউ ও টি সির সার্জেন্ট ছিলাম, তখন আমার চার্জে ইউ ও টি সির কিছু অস্ত্র ছিল। ৩০ টি ডি পি–এল এম জি রাইফেল ছিল। ডি পি মানে এর পিন কাটা। পিন ফিট করলেই এটাকে আবার সক্রিয় করা যায়।

২৫ মার্চ রাতে বি এম কলেজের অধ্যাপক ও স্টাফ সব পালিয়ে যায়। আমি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে তাদের সন্ধান না পেয়ে অস্ত্রের জন্য প্রথমে বি এম কলেজের স্ট্রং রুমের তালা শাবল দিয়ে ভাঙ্গার চেষ্টা করি। কিন্তু তা না পেরে পরে ভেন্টিলেটরের গ্লাস ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে ৩০টি রাইফেল এবং একটি এল এম জি বের করে নিয়ে

আসি। নিয়ে আসার পরে সার্কিট হাউজে প্রথমে নিয়ে যাই। পরে বেলস পার্কের পাশে লেডিস পার্কে গিয়ে এগুলো টেস্ট করি। তখন আমার সাথে ক্যাপ্টেন হুদা ছিলেন। ঐ সময়ে হঠাৎ আমরা ফাইটারের আওয়াজ পাই। প্রথমে বুঝতে পারিনি ফাইটার কি করবে বা করতে পারে। ফাইটারের আওয়াজ পেয়ে আমি ক্লাব থেকে লাফ দিয়ে বাইরে বেরুই। বাইরে থেকে ঘুরে আসতেই দেখি ফাইটার থেকে এল এম জি'র ব্রাশ শুরু হয়েছে। আমি তখন দৌড়ে গিয়ে মাঠের মধ্যে যে ট্রেঞ্চ খোঁড়া ছিল তার মধ্যে ঢুকি। কিন্তু ট্রেঞ্চ ছিল হাঁটু সমান। আমি দেখলাম ওপর থেকে গুলি করলে সে ব্রাশের গুলি এই ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকে পড়বে। আমি তখন ওখান থেকে দৌড়ে মাঠের পশ্চিম পাশের রেন্ট্রি গাছের দুটো শিকড়ের মাঝে আশ্রয় নিলাম। দু'তিন রাউন্ড ব্রাশেও আমি বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কি হচ্ছে। তারপরে ওপর দিকে তাকাতে আমি দেখতে পেলাম ওরা এক সাইড থেকে ব্রাশ করে এগিয়ে আসে। আমি ভাবলাম, এক সাইড দিয়ে যখন ব্রাশ করে, তখন অপর সাইডে গেলে আমি নিরাপদ হবো। দুটো ফাইটার ছিল। দুটো ফাইটার থেকে গাছ লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে। তখন আমি ভয়ে ওখান থেকে দৌড়ে মাঠের পাশে জজ সাহেবের বাসায় গিয়ে উঠি। আমার পেছনে একটি ছেলে ছিল। সে ছেলেটিও দৌড়ে এসে আমার কাছে গাড়ি-বারান্দায় পড়ে গেল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, ছেলেটির বুকের মধ্যে দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি ভেদ করে গেছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস তখন এমনভাবে হচ্ছিল যেন তার শ্বাসের সঙ্গে ভেতর থেকে কিছু বেরিয়ে আসছে। আমার চেতনার তখন এমন অবস্থা যে আমার ভয়-ভীতি বা মায়া-মমতার কোনো বোধ ছিল না। ছেলেটি সম্পর্কে ভাবলাম, ও তো মারা গেছে। ওর জন্য চিন্তা করে আমি কি করবো?

ফাইটার যখন চলে যায় তখন আমি বাসায় আসি। বাসায় এসে দেখি, মা, ভাই, বোন, প্রতিবেশী সকলে আমার জন্য কাঁদছে। তারা ভেবেছে, আমি মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছি। আমাকে দেখে আমার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী অনেকে বাধা দিলো। তারা বললো, তুমি যেও না। আমি তাদের অনুরোধ-উপরোধের জবাবে মা'কে প্রশ্ন করলাম: মা, আপনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন? মা বললেন: হাঁ বাবা, বিশ্বাস করি।

: হায়াৎ-মওৎ-রিজিক-দৌলৎ আল্লাহর হাতে?

: হাঁ, তাঁরই হাতে সব।

: আমি যদি কোনো অন্যায় না করি, তবু যদি আমাকে নিয়ে ওরা গুলি করে, তবে আপনি কি করতে পারেন?

: না বাবা, আমি কিছু করতে পারি না।

আমি বললাম: মা আমি যদি অন্যায় করি, তাহলে আমি আপনার সন্তান নই। আর যদি অন্যায় না করি, তাহলে আপনি দোয়া করুন যেন আমি আপনার কোলে ফিরে আসি। আমি যুদ্ধে যাবোই।

আমার মা জানতেন, আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকবো। মা আমাকে আর বাধা দিলেন না। আমার স্টেনগানটা আমার হাতে দিয়ে বললেন: বাবা তুমি কোরানের ওপর নির্ভর করবে।

আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে কাশীপুর চলে এলাম। কাশীপুরে আমাদের একটা গ্রুপ ছিল। ওখানে আমার কাছাকাছি ছিলেন ক্যাপ্টেন বেগ এবং তোফাজ্জল হক চৌধুরী। আমরা ৩ জন ছিলাম আরও ৫০ জন ছেলে ছিল। ৫০ জনের মধ্যে বাছাই

করে ৩০ জনকে রেখে বাকিদের পাঠিয়ে দিয়ে ওখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এর মধ্যে তালতলিতে দেখলাম পাক আর্মির অ্যাটাক হলো। ৪টি হেলিকপ্টারে করে পাক আর্মির কিছু সৈন্য বরিশালের শিল্প এলাকাতে নামলো। আমরা এই ঘটনা দেখে কাশীপুর ছেড়ে মাধবপাশা জমিদার বাড়িতে এসে এখানে ভূগর্ভের মতো যে একটা জায়গা ছিল, সেখানে দু'দিন থাকি। কিন্তু ওখানে ট্রেসড হয়ে যাওয়াতে আমরা ওখান থেকে চলে যাই বানরীপাড়া এবং বানরীপাড়া থেকে যাই আটঘর কুড়িয়ানা। ওখান থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি।

এই সময়ে শুনলাম, বানরীপাড়ায় কিছু আর্মি এসে চলে গেছে এবং ওখানকার থানা থেকে তাদের ডাব খাইয়ে খাতিরও দেখানো হয়েছে। এ কথা শুনে আমাদের মনে একটা প্রতিশোধের ভাব জাগলো। আমরা ঠিক করলাম যে আমরা থানা অপারেশন করবো। ঐ সময়ে আমরা এক রাতে ৭ জন ঐ থানা অপারেশন করি। থানার মধ্যে কিছু পুলিশ ছিল। আমরা যাওয়ার পরে তাদের ধমক দিই, একজনও যেন মাথা না জাগায়। তাহলে আমরা গুলি করবো। ওখানে আমরা বাধা পাইনি। কেউ কথা বলেনি বা মাথা তোলেনি। ওখান থেকে ১৭টি রাইফেল এবং আর যা অস্ত্র ছিল, তা আমরা নিয়ে আসি। থানার কিছু হ্যান্ডকাফ এবং অ্যামুনিশেন নদীতে ফেলে দিই। কিছু রাইফেলের বোল্ট খুলে, বোল্ট এক জায়গায় এবং রাইফেল আর এক জায়গায় ফেলে দিই, যাতে এই রাইফেলে কেউ ব্যবহার করতে না পারে। ওখান থেকে আটঘর কুড়িয়ানা এক স্কুলে গিয়ে সেখানে আমরা থাকতে আরম্ভ করি।

এখান থেকে কয়েকদিন পরে শুনি যে, ঝালকাঠির আরো সামনে বাউকাঠিতে একটি লঞ্চ করে পাকিস্তান আর্মির কিছু লোক এসেছে। তারা এসে বিভিন্ন জায়গায় গোলাগুলি করে এবং কিছু লোকজনকে হত্যা করে। একটা স্কুল পুড়িয়ে দেয়। এই সব দেখে কিছু নমশূদ্র আমাদের খবর দেয়। এই খবর শুনে আমরা ত্রিশজনের একটি দল, যার মধ্যে বীথিসহ দুটি মেয়েও ছিল, ওখানে গিয়ে চারদিক দিয়ে পাক বাহিনীকে ঘেরাও করে ফেলি। কিন্তু দু'জন ছেলে আমাদের কথা আর্মিকে বলে দেয়। আমরা ছেলে দুটোকে নিকেশ করি। আমাদের খবর পেয়ে পাক আর্মির লোক লঞ্চে উঠে যায়। আমরা পাড় থেকে ঐ লঞ্চ লক্ষ্য করে গুলি করি। কিন্তু আমাদের প্রথম রাউন্ড গুলির পরেই ওরা এম জি ব্রাশ করে। ওদের ব্রাশ ফায়ার একবার শেষ হলে আমরা আবার গুলি চালাই। এমনিভাবে ঘণ্টা দু'এক কি আড়াই ওখানে গুলি বিনিময় চলে। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম লঞ্চের ওপরে দশ-বারোজন মারা গেছে।

তখন ছিল জুন মাস। আমরা দেখলাম, আমাদের কোনো শক্তিশালী গ্রুপ নেই। অন্য গ্রুপের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। আমাদের এমন কোনো হেভি অস্ত্র নেই, যা দিয়ে আমরা পাক বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করতে পারি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম: আপাতত অস্ত্রপাতি এখানে মাটির নিচে পুঁতে রেখে কিছুটা সংগঠিত হয়ে পরে অপারেশনে যাবো। আমি, ক্যাপ্টেন বেগ আর তোফাজ্জল হোসেন: এই তিনজন মিলে আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।...

এই সিদ্ধান্তের পরে আমি দুটি ছেলেকে সঙ্গে করে গৌরনদী, আমাদের বাড়িতে এলাম। গৌরনদী হেঁটে আসার পথে কিছু ছেলে আমাদের পথে আটকায় এবং চ্যালেঞ্জ করে যে, আমাদের কাপড়-চোপড়ের মধ্যে কি আছে তা দেখিয়ে যেতে হবে।

কাপড়ের মধ্যে আমি আমার স্টেনগান এবং গ্রেনেড লুকিয়ে নিয়ে খালি গায়ে পথ এগুচ্ছিলাম। আমি ছেলেদের বললাম: আপনারা শিক্ষিত ছেলে, আমাদের বিরক্ত করবেন না। যার যার কাজ করেন। আমাদের বাধা দিবেন না। এই বলে আমি চট করে আমার স্টেনগান বের করে ম্যাগাজিন ফিট করে তাদের দিকে তাক করতে তারা ভয় পেয়ে মাফ চেয়ে বললো: ঠিক আছে, আপনারা চলে যান।

ওখান থেকে দেশের বাড়ি গৌরনদীতে চলে আসি। গৌরনদীতে আমাদের গ্রামের নাম বার হাজার। ওখানে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ওখানে পৌঁছে কাউকে কিছু না বলে আমি একটা পুকুর পাড়ে আমার স্টেনগান, ১২০ রাউন্ড গুলি আর গ্রেনেড পুঁতে তার ওপর একটা কলাগাছ লাগিয়ে দিই। তারপর মার সঙ্গে দেখা করি। মা তখন ওখানে ছিলেন। আমাকে দেখে মা খুব কান্নাকাটি করলেন। আমাদের পাশের গ্রাম সেরাল। সেরালে আবদুর রব সেরনিয়াবতের বাড়ি ইতোমধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী জ্বালিয়ে দিয়েছে। এমন অবস্থায় আমাকে দেখে গ্রামের লোক বললো: তুমি মুক্তিযোদ্ধা। তুমি এখানে থাকলে আমাদের সব গ্রামটাই ওরা জ্বালিয়ে দেবে। তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমি তাদের কথা চিন্তা করেই ওখান থেকে চলে আসি বাবুগঞ্জে।

সেখান থেকে কয়েকদিন পরে কমিশনার চর হতে বরিশাল ফিরে আসার পথে আমি ধরা পড়ে যাই। সেই কাহিনীই এখন সংক্ষেপে বলি।

বরিশাল রওনা দেয়ার দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির লোকদের বললাম, আমাকে এক সের চাল ভেজে দাও আর গুড় দাও। আমি যখন রওনা করি, তখন আমার গায়ে একটা পাঞ্জাবি, পরনে লুঙ্গি আর মাথায় প্যাঁচানো গামছা। একজন মাঝিকে নিয়ে নৌকায় যাবো, সেই ঠিক করলাম। এক মাঝিকে বললাম। মাঝি প্রথমে অস্বীকার করলো! আমি তাকে জোর করে বললাম: হয় তুমি যাবে না হলে আমাকে একটা নৌকা ঠিক করে দিতে হবে। আমি যখন ওয়াদা করছি, তখন আমি যাবোই। এবং আমাকে নিয়ে তোমাকে যেতে হবে। আমার কথার জোরে মাঝি রাজি হয়ে নৌকা করে আমাকে নিয়ে রওনা হলো। আমার নিজের সঙ্গে ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক তরুণ। নাম আনোয়ার।

বাড়ি থেকে বেরুবার আগে আমি গ্রামের লোকদের বলেছিলাম: আগামী শুক্রবার আমি ফিরে আসবো! কিন্তু যদি না আসি, আপনারা এখান থেকে সরে পড়বেন। কারণ, আমি হয়তো বিপদে পড়ে অত্যাচারের মুখে অনেক কথা বলে দিতে পারি।

ওখান থেকে রওনা করে খাল ধরে বাটাজোর এসে, বাটাজোর পুলিশ ফাঁড়ি ছাড়িয়ে সামনে এগুতে লাগলাম। মাঝি নৌকা বাইতে লাগলো। আমি মাঝির সঙ্গে দাঁড় টানতে লাগলাম। সঙ্গের আনোয়ারকে বললাম: তুমি চড়নদার। পুলিশ পোস্টে কেউ যদি জিগ্যেস করে, আমি তোমাকে চড়নদার বলবো। আমি আর মাঝি: দু'জনই মাঝি।

আমরা যখন বাটাজোর পুল অতিক্রম করছি, তখনি দেখলাম পুলের পাশে দাঁড়ানো রাইফেল হাতে পুলিশ। আসলে আমার ছিল দুর্ভাগ্য। আমার ইচ্ছা ছিল রাত পাঁচটার মধ্যে এই জায়গাটা পার হয়ে যাবো। কিন্তু উজান ও উল্টা বাতাসে নৌকা এগুতে পারেনি।

পুলিশ আমার দিকে রাইফেল তাক করে বললো: নৌকা কোথায় যাবে?

আমি বললাম: স্যার, নৌকা যাবে সরিকল।

ভেতরে কে?
আমি বললাম: ভেতরে একজন চড়নদার আছে।
পুলিশ বললো: নৌকা ভিড়াও, নৌকা সার্চ করবো।
আমি তখন চিন্তা করছিলাম, কি আমি করবো? আমার কোনোদিকে লাফ দেয়ার উপায় নেই। অস্ত্র হাতে ধরতে পারছিনে। স্টেনগানটা কাঁথায় প্যাঁচানো। আনোয়ারকে বলেছি সেটা মাথার নিচে রেখে শুয়ে থাকতে। আমার একদিকে বাজার। একদিকে পুলের নিচ। আর একদিকে পুলিশ ফাঁড়ি। আমার কোনোরকম পথ ছিল না যে হাতে অস্ত্র ধরবো বা কোনোদিকে লাফ দেবো। নৌকা থামানোর পরে, আনোয়ার শোয়া ছিল, পুলিশ তাকে উঠালো। আমাকে মাঝি মনে করে প্রথমে আমাকে ধরলো না। ভেতরে আনোয়ারকে ধরতে আমি আমার কাপড়ে বাঁধা গ্রেনেডটার গায়ে হাত রাখতে যাচ্ছিলাম। এবং তখনি পুলিশ একটা ফায়ার করলো। আমি ভাবছিলাম, গ্রেনেডটা ছুঁড়তে পারলে, চার-পাঁচজন পুলিশ কিছু করতে পারবে না। আমি এদের হাত থেকে চলে যেতে পারবো। কিন্তু তা আর হলো না। ভেতর থেকে আনোয়ারকে উঠানোর পরে, আমাকেও নৌকার ওপর দাঁড় করালো। আমি তখন দোয়া-কালাম পড়তে লাগলাম। পুলিশ প্রথমে নৌকার মধ্যে ঢুকে সার্চ করে প্রথমে কিছু না পেয়ে ফিরে যেতে থাকলো। কিন্তু হঠাৎ একজনের হাতে স্টেনগান জড়ানো কাঁথাটায় টান লাগতে সেটা খুলে গেল। তারা তখন স্টেনগান দেখলো এবং তার সাথে গুলিও দেখতে পেল। পাওয়ার সাথে সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাকে ঘিরে ধরে আমার বুকের ওপর রাইফেল ঠেকিয়ে ধরলো। আমি তখন দোয়া-কালাম আর তওবা পড়ে মৃত্যুর জন্য তৈরি হলাম। তখন জুলাই মাস। জুলাই মাসের ১৬ তারিখ। ১৯৭১-এর জুলাই।
বরিশাল থেকে গৌরনদী কতোগুলো বাস যাচ্ছিল। তার একটা বাসে পুলিশ মাঝিসুদ্ধ আমাদের তিনজনকে উঠিয়ে গৌরনদী রওনা করলো। গৌরনদী এনে প্রথমে গৌরনদী পুলিশ ফাঁড়িতে নিলো। সেখানে কয়েকটা বাড়ি দিল আমার গায়ে। তারপর ওখান থেকে আমাদের নিয়ে গেল গৌরনদী কলেজে। সেখানে তখন দুই থেকে আড়াইশ আর্মি ছিল। আমাকে যখন ওরা মাঠের মধ্য দিয়ে স্টেনগানসহ একটা ঘরে নিয়ে চললো, তখন এ-পাশ ও-পাশের দোতলার বারান্দা থেকে এই সৈন্যগুলো আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলো যেন কতোগুলো বাঘ একটা শিকার পেয়েছে তাদের সামনে।
বারান্দায় উঠিয়ে এক সুবেদার বললো: 'তোম ঘাবড়াও মাত, তোমকো ছোড় দেগা? তোম সাচ সাচ বাতাও।'
আমি চিন্তা করতে লাগলাম, আমি কি বলবো! আমি কেবল আল্লাহর কাছে মনে মনে এই মোনাজাত করতে লাগলাম, আল্লাহ তুমি আমাকে এমন বল দাও যেন আমি কোনো কথা বলে কোনো লোককে বিপদগ্রস্ত না করি। আমি এখন যাই বলি, তাই-ই মারাত্মক হবে। সত্য বললেও সত্য হবে। মিথ্যা বললেও সেটা এদের কাছে সত্য হবে। তার ফলে আমি তো মরবোই। আমার কথায় আরো কতো লোক মারা যাবে, তার ঠিক নেই।
এরপর পুলিশগুলো আমাকে কলেজের উপর তলায় নিয়ে গেল। সেখানে আবারও বললো: 'ঘাবড়াও মাত। সাচ সাচ বাতাও।' আমি প্রতি-উত্তরে কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। এর মধ্যে দেখলাম, এক ক্যাপ্টেন এসে আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে

আমাকে তার কাছে ডাকলো। ডাকার সাথে সাথে সে আমার কানের উপর ৫-৭টা ঘুসি বসালো আর পেটের উপরও কয়েকটা ঘুসি মারলো। পেটে যখন ঘুসি মারতো, তখন আমি হাত দিয়ে তার হাত ঠেকাতে চেষ্টা করতাম। তখনো আমার শরীরে কিছু বল ছিল। আমি এক সময়ে শরীর চর্চা করেছি। তাই এ-ঘুসিতে আমি তখনো কাবু হননি। এর পরে একটা ঘরের মধ্যে আমার নৌকার মাঝি, বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ান আনোয়ার এবং আমাকে নিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে নিয়ে আমাকে ফেলে দিয়ে পা দুটো বেঁধে উঁচু করে পায়ের পাতায় একটা সিপাহি তার মোটা পাহাড়ি বেত দিয়ে পিটাতে লাগলো। এর ফলে আমার দুই পায়ের তলাই ফুলে গেল। তারপর আমার দুটো পা-ই ওরা বেয়নেট দিয়ে কেঁচে দিলো। দুটো পা-ই। তারপরে থেকে মাথা পর্যন্ত পিটাতে লাগলো। এমনি পিটুনি দেয়ার পরে জিগ্যেস করতে লাগলো: 'শালা, বানচোত বাতাও। সাচ সাচ বাতাও, মেজর জলিল কাঁহা হায়, মঞ্জু কাঁহা, রাইফেল কাঁহা, মুক্তিওয়ালা কাঁহা হায়?' প্রথমে আমি বাংলায় উল্টাপাল্টা বলতে লাগলাম: 'স্যার, আমি কিছু বলতে পারি না।' আমার জবাব শুনে আবার মার দিলো এবং বললো: 'শালা বানচোত, উর্দুমে বাতাও।' কিন্তু উর্দু তো আমি জানতাম না। তবু ভাবলাম, 'হায় হোয়' মিশালে উর্দুর মতো শোনায়। আমি তেমনি করে বলতে লাগলাম: 'স্যার, মায় কুছ নেহি জানতা, মায় ইয়ে জানতা হামারা পাস স্টেন থা, গ্রেনেড থা, ম্যাগাজিন থা, মায় আওর কুছ নেহি জানতা।'

: শালা বানচোত, নেহি জানতা? বাতাও...

এমনিভাবে এক এক দফা মারে আবার জিগ্যেস করে: শালা বানচোত বাতাও মেজর জলিল কাঁহা হায়, মঞ্জু উকিল কাঁহা হায়, তোমকো ছোড় দেগা।

এ-রকম করতে করতে সকাল থেকে শুরু করে দুপুর পর্যন্ত যখন অত্যাচার আমাদের উপর চলে, তখন আমার সঙ্গের বেঙ্গল রেজিমেন্টের ছেলেটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি তখনো বেহুঁশ হননি।

এরপর বেঙ্গল রেজিমেন্টের আনোয়ারকে বলতে লাগলো: 'শালা বানচোত, তোম কমান্ডার হায়।' আনোয়ারের শরীর একটু মোটাতাজা ছিল। তাছাড়া তার গায়ে যে গেঞ্জি ছিল সে গেঞ্জিতে আর্মির গেঞ্জির ছাপ ছিল। তাই দেখে তাকে কামান্ডার মনে করে বলতে লাগলো: তোম কমান্ডার হায়। বাতাও, সাচ সাচ বাতাও। তোমকো ছোড় দেগা।

আমি তখন চিন্তা করলাম, তিনটা লোকই আমরা মারা যাবো? দেখি ওদের দু'জনার কাউকে রক্ষা করতে পারি কি না। বরঞ্চ আমিই মরি। ওরা আমার মরণের সাক্ষী থাকুক। কমান্ডার আমি। ওর নামে কোন মিথ্যা বলবো? তখন আমি বললাম: নেহি, ও কমান্ডার নেহি। এ স্টেনগান হামারা হায়। মায় ট্রেনিং দেয়া। হাম কমান্ডার হায়।

: শালা বানচোত, তোম কমান্ডার হায়? আমি বললাম: হাম কমান্ডা হায়।

: তোম কমান্ডার হায় তো বাতাও...

এর পরে মাঝিকে জিগ্যেস করলো: শালা, কিধারসে আয়া?

সাথে সাথে মাঝি কিছু বলার আগে আমি বললাম: আমি তাকে স্টেনগানের ভয় দেখিয়ে এনেছি। ওর কোনো দোষ নেই। যা করার আমাকে করেন।...

এরপরেও আমার ওপর ঐ একই ধারায় অত্যাচার চলতে লাগলো। আর চলতে লাগলো ঐ এক প্রশ্ন: 'শালা বাতাও মেজর জলিল, কাঁহা?' আমিও কেবল ঐ একই

জবাব দিয়ে যেতে লাগলাম: 'স্যার, মায় কুছ নেহি জানতা। মায় এই জানতা, মেরা পাচ স্টেন থা, গ্রেনেড থা, ম্যাগাজিন থা। আওর কুছ নেহি জানতা।'
এই রকম করেও যখন আমার কাছ থেকে কিছু বের করতে পারলো না তখন ওদের দু'জন আমার পায়ের হাঁটুতে পারা দিয়ে আমাকে বসিয়ে আমার পিছে বেয়নেট দিয়ে আঠার কি বিশটা টান দিয়ে কেঁচে দিলো।
এ রকম 'ক্যাঁচা' দেয় আর জিগ্যেস করে: 'শালা বানচোত, বাতাও...'
তখনো শুধু একই উত্তর আমার: "স্যার মায় কুছ নেহি জানতা, মায় ইয়ে জানতা, হামারা পাছ স্টেন থা, গ্রেনেড থা, ম্যাগাজিন থা। আওর কিছু নেহি জানতা।'
: শালা বানচোত আওর কুছ নেহি জানতা?
: নেহি।
এরপরে পিঠ-ক্যাঁচা শেষ করে দুই কানে জোড়া থাপ্পড় মারলো। কানে থাপ্পড় মারতে মারতে আমার বাম কানটা ফাটিয়ে দিলো। বাম কান ফেটে যখন রক্ত ঝরতে লাগলো, তখন বুঝলাম, আমার একটা অঙ্গহানি হয়ে গেল। কানটা চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে।
এরপরেও জিগ্যেস করলো: শালা বানচোত বাতাও...
আমি বললাম: হাম নেহি জানতা।
: নেহি জানতা?
তখন দেখলাম, মাঝি আর আনোয়ার বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। আমাকে এর পরে বসানো অবস্থায় ঘাড়ের উপর কিল মারতে লাগলো। এক একটা কিল মারতো আর আমি চোখে ফুলকি দেখতাম। আমি মনে করতাম, এখন বোধহয় আমার সেন্স চলে যাচ্ছে। আমি মনে মনে বললাম: আল্লাহ, তুমি আমার সেন্স নিয়ে নাও। আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। এমনি চলতে থাকলে আমি বললাম: আমাকে তোমরা গুলি করো। তাতে বললো: তোমকো গুলি নেহি মারেগা। বাতাও, তোমকো ছোড় দেগা...
আমি বললাম: হাম কুছ নেহি জানতা।
কান ফাটানো শেষ করে, ঘাড়ে মারার পরে আমাকে টেনে উঠিয়ে দাঁড় করালো। আমি ভাবলাম, এখন আমাকে একটা গুলি মেরে শেষ করবে। আমি মনে মনে তাই চাচ্ছিলাম, যেন আমাকে গুলি করে শেষ করে দেয়। দেখলাম, রাইফেলের চেম্বারে গুলি ভরলো, সেফটি ক্যাচ অন করেছে। রাইফেল আমার দিকে তাক করে ধরেছে। আমি জানি, সেকেন্ডের মধ্যে যখন গুলি আসবে আমি তখন মারা যাবো। এই ভেবে আমি পলকহীনভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু দেখলাম, সিপাহিটা কি যেন চিন্তা করলো। আমাকে গুলি করলো না। গুলি না করে গুলিটা আনলোড করলো এবং জিগ্যেস করলো: তোম নেহি বাতাও তো?
আমি বললাম: মায় নেহি জানতা...
তখন রাইফেলের মাথায় বেয়নেট ফিট করে সেই বেয়নেটটা আমার গলায় চেপে ধরলো। এতোক্ষণ কতো কষ্ট সহ্য করেছি। কিন্তু দেখলাম, গলায় বেয়নেট চেপে ধরলে যেন কষ্টটা আর সহ্য করতে পারিনে। অসহ্য হয়ে যায়। এমন অবস্থায় একবার বেয়নেট গলায় চেপে ধরতে আমি দুই হাতে বেয়নেটটা চেপে ধরে টান দিয়ে নিচে নামাই। যখন নিচে নামাই তখন সিপাহিটা বলে: শালা বানচোত... আমার উপর এতে আরো খেপে গিয়ে আবার বেয়নেট গলায় চেপে ধরে। আমি আবার হাত দিয়ে চেপে সেটাকে নামানোর চেষ্টা করি। এভাবে তৃতীয়বারে যখন আমার গলায় চেপে ধরছে, তখন আমি ভাবলাম, বরঞ্চ আমি

আত্মহত্যা করবো। কিন্তু আবার চিন্তা করলাম, আত্মহত্যা তো মহাপাপ। আমি এতোবড় একটা পাপ করবো? তখন আমি আত্মহত্যার চিন্তা ত্যাগ করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এবার দেখলাম, ওরা বেয়নেটটা নামিয়ে নিলো। নামিয়ে নিয়ে আমার দুটো পা বেঁধে উল্টোমুখ করে ছাদের কড়ার সাথে আমাকে ঝুলালো। এবং সেই ঝুলানো অবস্থায় চালাতে লাগলো অত্যাচার। অত্যাচার করতে করতে যখন বেলা পৌনে ছ'টা তখনো জিগ্যেস করলো: স্বীকার করবা?

আমি তখন বললাম: স্বীকার করবো।

এই কথা শুনে আমাকে ঝুলানো অবস্থা থেকে নামালো। নামিয়ে জিগ্যেস করলো: বাতাও...

তখন আমি আবার বললাম: মায় কুছ নেহি জানতা...

: শালা বানচোত নেহি জানতা? বলে হাতের লাঠি দিয়ে আমার মুখে একটা বাড়ি মারে আর সে বাড়িটা আমার দাঁতে লেগে দাঁতের অর্ধেক ভেঙ্গে যায়।

এরপরে দেখলাম, একটা পরিবর্তন হলো। জানি না বরিশাল থেকে কোনো চেষ্টা হয়েছিল কি না। ...পরে শুনলাম বরিশাল থেকে আর্মি ক্যাম্পে টেলিফোন করা হয়েছিল। তার ফলে এরা আমাকে, সঙ্গী দু'জনসহ গৌরনদী থেকে বরিশাল নিয়ে আসা ঠিক করে।

দেখলাম, নিচে একটা আর্মি ভ্যান আনা হলো। আর্মি ভ্যান এনে আমাদের আর্মি ভ্যানে উঠালো। আমাদের তিনজনকে এক হ্যান্ডকাফে বেঁধে ভ্যানে উঠালো। আমাকে টেনে উঠালো। আমার শরীরের বোধশক্তি তখন কমে গেছে। পায়ের তলাটা 'ক্যাঁচা। তা থেকে রক্ত পড়ছে।

ওরা আমাদের গাড়িতে উঠালো। তখন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। গোটা দশেক সিপাহি, দেখলাম, বৃষ্টির জন্য ভ্যানে উঠে ত্রিপল দিয়ে নিজেদের মাথা ঢাকলো। বাতাসও বইছিল। গাড়ি ছাড়লো। আমাদের ওরা রেখে দিলো 'উদলা' জায়গায়। খালি গা আমাদের। কাঁটা শরীরে একটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়লেও মনে হতো যেন এক একটা তীর এসে শরীরে বিঁধছে। আর এতো স্পিডে ভ্যান চালিয়ে দিলো যে, বাতাস আর সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে হতে লাগলো, আমি ভ্যানে মরে যাবো। আমি সাথি দু'জনকে বললাম: দেখ, আমরা দেশের মাটি চাই, না কুকুরের খোরাক হতে চাই? আমাদের ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গুলি করে মেরে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে।

সাথি দু'জন বললো: কিন্তু কি করবো আমরা?

আমি বললাম: তার চাইতে, আমাদের এক হ্যান্ডকাফে যখন হাত বাঁধা, এসো আমরা তিনজনে এক সঙ্গে গাড়ি থেকে লাফ দিই। তাতে হয়তো এমনি মরবো। নয়তো ওরা গুলি করে মেরে রেখে যাবে। তবু তো দেশের মাটিতে আমাদের লাশ তিনটা পড়বে। ওরা দু'জন বললো, ওরা রাজি। কিন্তু এ-রকম একটু কথা বলা বা মাথা জাগাতে গেলেও পাকিস্তানি সিপাইগুলো ডাণ্ডা দিয়ে বাড়ি মারতো কিংবা হ্যান্ডকাফের ভিজা দড়ি দিয়ে গায়ে আঘাত করতো। আর কেবল গালি দিতো অকথ্য ভাষায়: শালা বানচোত... আমাদের তাই আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। আমাদের বরিশাল নিয়ে এসে কর্নেল আতিকের সামনে হাজির করলো।...

ঐদিনের পরে, অত্যাচার শেষে, রাতে আনোয়ার এবং আমাকে পাশাপাশি মেঝেতে শুইয়ে রাখে। কিন্তু ঐ রাতেই আনোয়ার মারা যায়। আনোয়ারের লাশটা ওরা কাপড়

ঢাকা দিয়ে নিয়ে গিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। নেয়ার আগে বলে: এ শালা মর গিয়া।... সেদিন আমার কান্না পেয়েছিল এই ভেবে যে, আমি তো তার কমান্ডার ছিলাম। সন্তানের জন্য পিতার যে মায়া, সৈনিকের জন্য তার কমান্ডারের তো সেই মায়া। আমার চোখে পানি দেখে ঘরের মধ্যে আর বন্দী যারা ছিল, তারা বললো; আপনি কাঁদবেন না। মরণের সময়ে তার মুখে আমরা পানি দিয়েছি। আমি কেবল ভাবতে লাগলাম: আমি যদি বেঁচে থাকি তবে আনোয়ারের জন্য আমি কি জবাব দেবো? আমি চেয়েছিলাম, আমরা দু'জনে যেন এক সঙ্গে মারা যাই। কিন্তু আল্লাহ, একি হলো?...

কবিরের এই অত্যাচার ভোগের কাহিনী আমাকে সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে। কবিরের কাহিনীর এ-হয়তো সামান্য পরিচয়। কবিরকে বরিশাল থেকে যশোরে চালান দেয়া হয়। যশোর জেল থেকে তাকে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাক বাহিনী মুক্তি দেয়। যশোর জেলের মধ্যে তার জীবন-যাপন, অভিজ্ঞতা ও বোধের কাহিনীও অনুপ্রেরণাদায়ক।

এই তরুণ মুক্তিযোদ্ধার যে বৈশিষ্ট্যটি আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং অনুপ্রাণিত করেছে, সে হচ্ছে, অচিন্তনীয় বিপর্যয় এবং অত্যাচারের মুখেও নিজের চেতনাকে জাগরূক রাখার তার অসীম ক্ষমতা। নির্মম অত্যাচার সইবার শক্তি এবং নিজের সংগ্রামী জীবনকে অব্যাহত রাখার জীবনীশক্তি এই তরুণটিকে আমার কাছে এক সম্ভাবনাময় চরিত্র হিসেবে উপস্থিত করেছে।

ক্যাসেটের শেষ দিকটাতে কবির আফসোস করে বলেছে: 'অত্যাচারে অত্যাচারে আমার জীবনের অনেক কাহিনীই হয়তো আজ স্মৃতিভ্রষ্ট। এবং আমার কাহিনী শুনবেই-বা কে?" আমার কথা উল্লেখ করে বলেছে, 'মহানুভব সরদার স্যার শুনতে চেয়েছেন বলেই আমি এ-কাহিনী বলার চেষ্টা করেছি। আমার লেখার কোনো ক্ষমতা নেই। না হলে, আমি লিখিতভাবে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা এবং কামনা-স্বপ্নকে তুলে ধরতাম। মুখে বলার শেষটাতে আমি কেবল এই কথাই বলতে চাই: আমি মৃত্যুকে কখনো ভয় পাইনি। ক্যাপ্টেন হুদা যুদ্ধের সময়ে একবার একটা সুইসাইড স্কোয়াড তৈরি করেছিলেন। বলেছিলেন: এক সপ্তাহের অপারেশন। এ অপারেশনে যে যাবে সে যেন জীবন নিয়ে ফিরে আসার কথা চিন্তা না করে। এ-কথা ভেবেই রাজি হতে হবে। কে রাজি আছো, বলো? তাঁর প্রশ্নের জবাবে কয়েকশতের মধ্যে যে ১২ কি ১৪ জন যুবক সেদিন সেই সুইসাইড স্কোয়াডে যোগ দিতে রাজি হয়েছিল, তার মধ্যে আমিও ছিলাম।"

১৯৭১-এর তরুণ ছাত্র-মুক্তিযোদ্ধা বুলু কবিরের এ-উক্তিতে যে-কোনো অসত্য নেই, তার কাহিনীর রেকর্ডটি বাজিয়ে শুনতে শুনতে সে বিশ্বাসই আমার গভীরতর হলো।

৮-৩-৮৬

রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ

সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

আমরা আত্মাকে ডাকলাম

পাক দখলদার বাহিনীর হাতে বন্দী ঢাকার অসহায় মানুষ আমরা। ওরা ২৫শে মার্চ রাতে অতর্কিত আক্রমণে আমাদের ঘেরাও করে ফেলল। ট্যাংক, কামান, রকেট আর মেশিনগানে ওরা ঢাকার বুকে সে রাতে রাজারবাগ পুলিশ ঘাঁটিতে, পিলখানায়, ইকবাল হল আর জগন্নাথ হলে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল।

পুরো ২৬ তারিখ ওরা সান্ধ্য আইন জারী রেখে চালালো হত্যালীলা। ২৭শে মার্চ কয়েক ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন তুলে নিতেই হাজার নয়, প্রায় লক্ষ অসহায় মানুষ কাপড়-চোপড়ের একটি করে পুটুলি নিয়ে অবোধ শিশুদের কোলে কাঁখে মাথায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ঢাকা শহর ছাড়ার জন্য। সন্ধ্যা হয়, তবু অসহায় ভয়ার্ত মানুষের বিরাম নেই। বুদ্ধি দিয়ে খুঁজে পেলাম না কোথায় যাবে ওরা? কেমন করেই বা যাবে? হানাদার বাহিনী বিনা অজুহাতে গুলি করছে, আগুন দিচ্ছে। ২৬ তারিখ বিকেলে মতিঝিল কলোনীর বাসা থেকে দেখলাম দক্ষিণ দিকে উর্ধ্বগতি কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। সেদিন বুঝিনি। পরে শুনেছি, সেদিন ওরা ইত্তেফাককে আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করেছে। কিন্তু এতো মানুষ কেমন করে বেরিয়ে যাবে এই অবরুদ্ধ ঢাকা শহর থেকে? খবর পেলাম শহর ছাড়ার সময়েও বহু মানুষকে পাক বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে। জিঞ্জিরা বাজারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড তো কয়েক দিন পরের ঘটনা। ২রা কিংবা ৩রা এপ্রিল ওরা চারিদিক ঘেরাও করে সকাল থেকে গুলি করতে আরম্ভ করেছে জিঞ্জিরায় আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার মানুষের উপর। জাহাজের ওপর কামান বসিয়ে জিঞ্জিরা বাজার তাক করে ওরা গোলাবর্ষণ করেছে। চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ভয়ার্ত মানুষ কোরান খুলে বসেছে, কলেমা পড়েছে আর পাক বাহিনী হাসতে হাসতে মেশিনগানের ঝড় তুলে ভয়ার্ত মানুষকে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে আর ব্যঙ্গ করে বলেছে: কলেমা পড় লিয়া তো আব শহীদ হো যাও!

এই ভয়ংকর অবস্থায় ছোট্ট তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি আর আমার স্ত্রী কোথায় যাব, কোথায় পাড়ি জমাব? তাই আমরা প্রায় মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। বন্দী ঢাকাতেই রয়ে গেলাম।

তারপরের জীবন? সে তো মৃত্যুর পরে মৃতের জীবন। তার আকুতি আর অসহায়তার কথা কোনদিন সাথী কাউকে শোনাতে পারব, এমন কথা সাহস করে ভাবতে পারিনি। যে অযুত প্রাণের সংগ্রাম আর রক্তের বিনিময়ে আমাদের মত হতভাগ্য মানুষ বেঁচে থাকতে পেরেছে আর সেই ভয়ংকর দিনগুলির স্মৃতিচারণ করতে পারছে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সে ঋণের কোন প্রতিদান নেই। আজ মনের চোখে যখন এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বরের মাসগুলোর প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের পাতা উল্টেপাল্টে দেখি তখন সে জীবনকে কি করুণ আর অসহায় বোধ হয়!

বন্দী ঢাকার রাস্তায় লোকজন নেই। বিকেল না হতে খাঁ খাঁ করে। সামরিক বাহিনী টহল দেয়। গাড়ীর মাথায় মেশিনগান বসানো। একাডেমী শুধু আমাদের অফিস নয়। একাডেমী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এ জন্যই ২৬শে মার্চ সকালে ওরা একাডেমী লক্ষ্য করে কামান দেগে একাডেমীকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

গণজাগরণের দিনগুলোতে একাডেমী ছিল সহস্র জনতার পায়ের ধ্বনিতে মুখরিত। এপ্রিল, মে মাসেও একাডেমীতে সকালে গিয়েছি আর দুপুরে ঘরে ফিরেছি, অফিস করতে নয়। উদ্বেগাকূল আর বিপন্ন সহকর্মীদের খবর দিতে, খবর নিতে। 'কেমন আছেন? কেমন আছ? বিপদ হয়নি তো কোনো?' জড়ো হই মনের সাথে যার মনের বন্ধন আছে তার সাথে দুটো কথা বলতে: জয়বাংলা বেতার তরঙ্গটা কাল যে শুনতে পেলাম না। বলতে পার কোন পয়েন্টে ওকে ধরা যায়? কানের কাছে মুখ নিয়ে বলার মতো বন্ধু জবাব দেয়: 'সেটের একেবারে ডান দিকে, বিবিসির কাছেই। ওরা এখন শর্টওয়েভে ছাড়ছে।'

আলাপ করি: কালকের সংবাদ পরিক্রমা আর সংবাদ বিচিত্র শুনেছেন? 'এক মুজিবরের কণ্ঠ হতে লক্ষ মুজিবরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি' গানটি খুব ভাল লেগেছে। বিবিসি খবর দিয়েছে, ঢাকায় মুক্তিবাহিনী অ্যাকশন শুরু করেছে।

: টিক্কা খান কি সত্যি আছে? অনেকে তো বলে এ টিক্কা নয়। অন্য কাউকে টিক্কা বলে চালিয়েছে। আসল টিক্কা খতম হয়েছে।

: পাক ফৌজ খতম হচ্ছে কম নয়। ওরা তিন দিনে খতম করতে চেয়েছিল বাংলাদেশকে। আজ তিন দিন থেকে তিন মাস গড়িয়ে চলেছে। 'ভাইজানরা' বুঝতে শুরু করেছে, বাংলাদেশ বড় কঠিন জায়গা।

: কিন্তু আর কতকাল?

: অস্থির হয়ো না। দেখ না ভিয়েতনামের যুদ্ধ। বাংলাদেশে নতুন ভিয়েতনামের স্বাধীনতার মরণপণ লড়াই শুরু হয়েছে।

: ভবিষ্যদ্বক্তা জিন ডিকসনের বাণী, দেখো, ঠিক ফলে যাবে। আগেও তো এর বাণী ফলেছে বলে শুনা গেছে।

: কি বলেছে জিন ডিকসন?

: কেন শোননি, জিন ডিকসন বলেছে, ১৯৭১ সালে এশিয়া ভূখণ্ডে জন্মলাভ করবে নতুন এক স্বাধীন রাষ্ট্র আর কোন এক রাষ্ট্রনেতা হয় পাগল হয়ে যাবে, আত্মহত্যা করবে, নয়ত নিহত হবে।

: খেয়াল রেখো, আলোচনার সময় সন্দেহজনক কোন লোক যেন না আসে।

: প্লানচেটে বিশ্বাস করো, তুমি?

: আজ সব কিছুতে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি তাকেই যে আমাকে আশ্বাস দেয় এই নরপিশাচদের মৃত্যুর।

: তোমরা তো প্লানচেটে বিদেহী আত্মা ডাকতে পার। বস না প্লানচেটে অফিসেই একবার। কি করব আমরা, অসহায় বন্দী মানুষেরা? আমরা তাই করলাম। দুই বন্ধু বসলেন টেবিলে। আঙ্গুলে আঙ্গুল ঠেকিয়ে। চক্ষু বন্ধ। অক্ষরে অক্ষরে আত্মার প্রশ্নোত্তরের সংকেতভূমি রচনা করা হল। উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

: কই এলো কেউ?

চোখ বন্ধ করা প্লানচেটের আসনের বন্ধু প্রশ্ন করলেন আত্মাকে: আপনি যদি এসে থাকেন, আপনার নাম বলুন।

আঙ্গুল কেঁপে কেঁপে চলতে থাকে। অক্ষর থেকে অক্ষরে চলতে চলতে আঙ্গুল নাম বলে ঃ হক সাহেব। হক সাহেবের আত্মা এসেছে। আবার প্রশ্ন হয়।

: বাংলাদেশ স্বাধীন হবে? স্বাধীন হলে বলুন: হাঁ।

আঙ্গুল নড়ে উঠল। ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে অক্ষর থেকে অক্ষর ঘুরে আত্মা জবাব দিল: হাঁ।

আবার প্রশ্ন হল: আপনি বলুন, আমাদের এ মুক্তিসংগ্রাম জয়লাভ করবে কোন ফ্রন্টে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে না যুদ্ধের ফ্রন্টে?

আঙ্গুল আবার নড়ে। আবার জবাব তৈরী হয়: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

: আপনি বলুন, কতদিনে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে?

আঙ্গুল আবার নড়ে। জবাব বেরোয়: সময় লাগবে।

: আপনি যদি জানেন তা হলে বলুন, কোন বছর এ যুদ্ধের শেষ হবে?

জবাব এলো: ৭২ সালে।

: বলুন, কোন মাসে?

আঙ্গুল নড়ে, জবাব তৈরী হয়: এপ্রিল মাসে।

জবাব শুনে মনটা যেন একটু দমে যায়। কেননা এর আগে কোন কোন আত্মা আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই পাকিস্তানের চরম পরাজয় ঘটবে।

কি বলব এই প্লানচেট করাকে? কোনদিন এমনভাবে বিদেহী আত্মার আগমনকে বিশ্বাস করিনি বা গুরুত্ব দেইনি। ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষার সময়ে ছাত্রছাত্রী নাকি এরূপ প্লানচেট করে থাকেন। পরীক্ষায় তাঁরা কৃতকার্য হবেন কিনা, তা আগাম জানার জন্য। এ কথা শুনে হেসেছি। কিন্তু নিজেদের ভাগ্যের চরম পরীক্ষার ভবিষ্যৎ জানতে আজ আর আত্মাকে ডাকার ব্যাপারটি নিয়ে পরিহাস করতে পারছিনে। বুদ্ধি দিয়ে বুঝি যে প্লানচেটে আসনগ্রহণকারীর জবাবের আঙ্গুল যেন আমাদের বন্দী মনের স্বপ্নের ইঙ্গিতে অক্ষর গুণে গুণে চলে। তবু, তবু তো তাকে অবিশ্বাস করতে মন চায় না।

কিন্তু প্লানচেটে মজার কাহিনীও ঘটে। বন্ধু বলে: জিন্নাহ সাহেবের আত্মাকে কাল রাতে ডেকেছিলাম।

: ভারী মজার তো। তারপর? তারপর?

: মেজাজটা বড় কড়া। কথা বলতে চায় না। নাম বলতে চায় না।

: কি জিজ্ঞেস করেছিলে?

জিজ্ঞেস করেছিলাম, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কি?

: কি বলল?

: কথা বলতে চায় না।

: তারপর?

: আবার জিজ্ঞেস করলাম, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে?

: জবাব দিল, হবে।

: আচ্ছা, বড় মজার জবাব তো। ভূতের মুখে রাম নাম!

: তখন চেপে ধরলাম, বলুন, কবে হবে?

: কি বলল?

: এর আর জবাব দিতে চায় না। বারবার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু জবাবও দেয় না, আবার আমাদের আঙ্গুল থেকে ভরও সরায় না। অনেক কষ্টে শেষে তাকে তাড়াতে হয়েছে।

প্লানচেটের আত্মা আমাদের ব্যক্তিগত ভাগ্যের হদিস দিতেও কসুর করত না।

জিজ্ঞেস করেছি, বার্ট্রান্ড রাসেল কিংবা আব্রাহাম লিংকনকে: বলুন, অধ্যাপক... কোথায় আছেন?

জবাব এসেছে: আগরতলায়।
আমি করুণভাবে বললাম: তোমাকে না বলেছিলাম, আমার ভবিষ্যৎটা একটু জিজ্ঞেস করবে।
বন্ধুবর মুখখানা ম্লান করে বলল, করেছিলাম, কাল রাতে।
: কি জবাব দিল আত্মা?
: বলল, ভবিষ্যৎ ভাল নয়। তোমার পক্ষে ইন্ডিয়া চলে যাওয়াই ভাল। আমি জানি, তাতে আমার নিজের জীবনের নিরাপত্তা আসবে। তখন আর দিন রাতের চব্বিশ ঘণ্টার প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেণ্ডে মৃত্যুর আতঙ্ক থাকবে না। কিন্তু অবোধ শিশু আর স্ত্রী নিয়ে আমার সংসার। সংসার নয়, ছোট্ট পাখীর বাসা। আমার মতোই হাজার হাজার পরিবার অসহায়। আমি কোথায় যাব আমার পাখীর বাসাকে বর্বরের হাতে ছেড়ে দিয়ে। না, আমি তা পারবো না। প্রতি রাতে বাসার দুয়ারে জীপের শব্দে শিশুপুত্র আতঙ্কে আমাকে জড়িয়ে ধরে: 'আব্বু এই জীপ এসে থেমেছে।' আমি জানি, ঐ জীপ একদিন আমার জন্যই আসবে। আসুক। এসে আমাকে টেনে নিক। গুলি করে মেরে ফেলুক। তবু যেন না পাখীর ছানার মতো আমার নিরীহ সন্তানদের উপর অত্যাচার করে। শুধু আজ নয়, করুণ হাসি ফুটেছে নিজেরই মুখে সেদিনও, এই নির্বোধ কামনায়। কত শিশুকে ওরা খুন করেছে মা-বাবার সামনে, সে কাহিনী কি কান থেকে কানে ছুটতে ছুটতে সেদিন আমার কানেও পৌঁছেনি? তবু আমি ছেড়ে যেতে পারিনি। আমার অসহায় স্ত্রী আর সন্তানদের আরো অসহায় করে। আমাকে পেলে হয়ত পশুগুলো ওদেরকে হত্যা করবে না, হয়ত শুধু আমাকেই নিয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে না পেলে যে ওদের ওপর মুহূর্তের বিলম্ব না করে পশুর দল ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তাই প্রতি রাতে জীপের শব্দ পেলেই বুকের স্পন্দন বেড়ে গেলেও তৈরী হই দরজার উপর সবুট লাথির জন্য: খোল দো, দরওয়াজা খোল দো।...
বিদেহী আত্মার কথা বিফল হোল না। ভবিষ্যৎ আমার ভাল নয়। ৭ই সেপ্টেম্বর একাডেমীতে যেয়ে বসতেই সাদা পোষাক পরা দুটো পাঞ্জাবী পাষণ্ড এসে ঘরে ঢুকে আমার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বলল: আর ইউ সরদার ফজলুল করিম। আমি বললাম: হ্যাঁ। ওরা বলল, 'ইউ আর টেকেন ইনটু কাস্টডি', 'তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।' বলেই প্রায় জোর করে অপেক্ষমাণ জীপে আমাকে তুলে নিয়ে বেদনাহত বন্ধুদের চোখের সুমুখ দিয়ে মুহূর্তে জীপটা বেরিয়ে এল বহু বছরের স্মৃতি বিজড়িত বাংলা একাডেমীর অফিস থেকে।
জীপের মধ্যে শূন্য চোখে বসে বসে নিজের মনের দিকে তাকাই। দেখি মন বলছ: বিদেহী আত্মার কথা তো মিথ্যা হল না। ভূত-ভবিষ্যতের কথা হয়ত জানে এই বিদেহী আত্মারা। তাহলে মিথ্যা হবে না সেই বাণীও: স্বাধীন হবে বাংলাদেশ। আমার মৃত্যুর আশঙ্কা, কিংবা মৃত্যু–সে তো লক্ষ ঘটনার একটি মাত্র ঘটনা। কিন্তু ইতিহাসের চাকা কি বর্বর দস্যুর দল আমাদের হত্যা করে স্তব্ধ করতে পারবে? কোন দস্যুর দলই কি পেরেছে কোনদিন?...
জীপটা এতক্ষণে শহরের রাস্তা ঘুরে ক্যান্টনমেন্টের পথ ধরেছে।

১৯৭২

নানা কথা এবং নানা কথার পরের কথা

সরদার ফজলুল করিম, প্যাপিরাস, ১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

গুজবে কান দেবেন না

এপ্রিল শেষ হয়ে মে মাস আসতে না আসতেই বর্বর পাকবাহিনী ঢাকায় পোস্টার আর মাইক দিতে বাধ্য হল। 'গুজবে কান দিবেন না'। ওদের আওয়াজেই ঢাকার বন্দী মানুষ আমরা টের পেলাম খান সেনাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

সময় মনের উপর কেমন ভারী বোঝা হয়ে উঠতে পারে এ অভিজ্ঞতা আমার একদিন হয়েছিল জেলখানার মধ্যে। সেই ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫, আর ৫৮ সাল থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত। জেলের মধ্যে বসে গুণেছি একদিনে কত ঘণ্টা, এক ঘণ্টায় কত মিনিট, এক মিনিটে কত সেকেন্ড, এক সেকেন্ডে কত পল আর এক পলে কত অণুপল। কিন্তু জেলের বাইরে সমস্ত ঢাকা শহর, সমস্ত দেশটাই যে সেই জেলের চেয়েও দুঃসহ আর একটা জেলে পরিণত হতে পারে, এ অভিজ্ঞতা হলো বন্দী ঢাকাবাসীর ২৫শে মার্চের সেই কালো রাত্রি থেকে। সন্ধ্যা না হতেই গা ছমছম করে। নিজের রাস্তায় বর্বর বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ী ছুটে বেড়ায়। দরজায় দরজায় যেয়ে হানা দেয়। কারুর টু শব্দটি করার সাহস নেই। নিঃশব্দে গাড়ীতে তুলে মুহূর্তে উধাও হয় কিংবা ঘরের দুয়ারেই গুলি করে শেষ করে দিয়ে যায়–বাবাকে মাকে মেয়েকে...। অন্ধকার রাত্রি যদি বা ভোর হয়, ঢাকার মানুষের মনের ভার কমে না। মিনিট কাটে না, ঘণ্টা কাটে না, দিন কাটে না। কি করে সময় কাটবে? কি করবে সে? মৃত্যু বাদে কি ঘটনা আছে আমাদের জীবনে?

তবু সেই মৃত্যুর মধ্যেও আমরা বাঁচতে চেয়েছি। দুরুদুরু বুকে স্বাধীন বাংলা বেতারের তরঙ্গে কান পেতেছি। আকাশবাণীর সহানুভূতি ভরা সংবাদ আর পর্যালোচনা শুনে চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। ভেবেছি, আহা। তবু তো দুনিয়া জানছে কি মহামৃত্যুর মধ্যে আমরা রয়েছি।

কিন্তু কেবল অসহায় আর্তনাদ নয়। মে মাস আসতেই কোন কান থেকে কানে খবর এল: যাত্রাবাড়িতে অ্যাকশন হয়েছে। দু'ঘণ্টা লড়াই হয়েছে। গ্রীন রোডে কয়েকটা খানসেনা খতম হয়েছে। ওরা পাগলা কুকুরের মতো পাড়াকে পাড়া ঘেরাও করে মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে গেছে। দখলদার জল্লাদের দল জোর করে খবরের কাগজ বের করেছে। কিন্তু সে কাগজ রাখে খুব কম লোকেই। পড়ে আরো কম লোকে। খবরের কাগজ রাখা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। সেই অভ্যাসেই সেদিন পত্রিকা রাখতাম। হকার নিজের জীবিকার জন্যই হয়ত জোর করে দরজার ফাঁকে দিয়ে যেত একটা কাগজ। কিন্তু কী পড়ব সেই কাগজে? শহর স্বাভাবিক হওয়ার বিবরণ? সে বিবরণের কালি শুকোতে না শুকোতে মতিঝিলের রাত্রির বুক কেঁপে উঠে গ্রেনেডের শব্দে। আনন্দ-আশঙ্কায় মন ফুলে ওঠে। সকালে ফকিরাপুল বাজারের দিকে যেতে দেখি টি অ্যান্ড কি স্কুলের দালানটা শূন্যগর্ভ হয়ে আকাশের দিকে হাঁ করে আছে। সাধ্য নেই কেউ তাকে পাশ কাটিয়ে যায়, না দেখে। পীর জঙ্গী মাজারের বিদ্যুৎ সাব স্টেশনেও একদিন গ্রেনেড ছুঁড়লো দামাল ছেলের দল। আমরা জানি একটা গ্রেনেডেই খান সেনার দল খতম হয়ে যাবে না। এ যেন দামাল ছেলের দল ওদের অসহায় বন্দী বাবা মা ভাই বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে: "তোমরা হতাশ হয়ো না। এই দেখ

আমরা আছি। তোমাদের পাশেই আছি। তোমাদের জন্যই মরছি। শুধু মরছি নয়, ওদের মারছিও। আমরা রক্ত বীজের ঝাড়। ওরা আমাদের কতো মারবে?"
এবার আমাদের মনের হতাশা কাটতে লাগল। সময়ের পালে যেন হাওয়া ভরে ওঠে। আমাদের খবরের কাগজ তৈরী হয়। বর্বর খান সেনাদের ভাষায় 'গুজব'। এ কাগজকে ওরা বেআইনী করার চেষ্টা করে। হুকুম জারী করে। দেয়ালে দেয়ালে নিষেধনামা টাঙ্গিয়ে দেয়। সে কাগজ হাওয়ায় ভর দিয়ে উড়ে চলে, বেড়ে চলে। আর তার মধ্যে কতো খবর, কতো কাহিনী, কতো ব্যঙ্গ। পরিহাস আর টিপ্পনী।
বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে আড়ালে ডেকে চোখ টিপে জিজ্ঞেস করি, খবর কি? খবর?
খবর হচ্ছে: ওদের শান্তি কমিটি প্রস্তাব নিয়েছে, 'দুষ্কৃতিকারীরা' শহর ঘেরাও করে ফেলতে পারে। তাই তাদের শহরে ঢোকার আওয়াজ পেলেই সাইরেন বাজিয়ে দেওয়া হবে!
খবর হচ্ছে: সদরঘাটে ওরা কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। ওদের ধারণা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে মুক্তি বাহিনীর শহরে অনুপ্রবেশ আটকে দিবে। চালুনী দিয়ে পানি ছাঁকবে। দেয়াল তুলে হাওয়া আটকাবে।
খবর হচ্ছে: খানসেনারা কচুরীপানা মাথায় দিয়ে সদরঘাটে রবার বোটে চরে বর্ষাকালে মুক্তি ফৌজের মোকাবেলার কসরত আঁটছে। বর্বরের দল এমন মজার দৃশ্যটা টেলিভিশনের পর্দায় দেখাতেও সঙ্কোচ বোধ করেনি।
চরমপত্রের গল্প বানানো নয়। মৃত্যুপণ সংগ্রামী বাংলার জীবনের কাহিনী। তার টুকরো টুকরো ঢাকার বন্দী মানুষ আমরাও পেয়েছি। আমরা দেখেছি রাস্তায় আকস্মিকভাবে জল্লাদের দল বাস থামিয়েছে। যাত্রীদের চেক করেছে আর জোয়ান জোয়ান যাত্রীদের বাছাই করে নিজেদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে গেছে ক্যান্টনমেন্টে, ওদের শরীর থেকে রক্ত নিংড়ে নিয়ে মেরে ফেলতে।
এরূপ অসংখ্য ঘটনা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে মা বাবার বুকে। নিজেদের কিশোর আর যুবক সন্তানকে কোথায় লুকোবে তার পথ পায়নি। মা তার ছেলেকে মুহূর্তের জন্য রাস্তায় যেতে দিতে শঙ্কা বোধ করেছে।
: ওরে আজাদ তুই বাইরে যাসনে। ওরা তোদের মত ছেলেদের রক্ত নিংড়ে নেয়।
মাকে ফাঁকি দিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে আজাদ। মুখে দুষ্টুমির হাসি ছড়িয়ে বলে: মা, সে ভয় আর নেই।
: কেন রে?
: আরে জানো না? বাঙ্গালীর রক্তে খান সেনারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। ওরা যেইনা বাঙ্গালীদের রক্ত ওদের মর মর জখমী সেনাদের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে অমনি ওরা বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে কেবল লাফাচ্ছে আর বলছে: জয় বাংলা! জয় বাংলা!
মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দুষ্টু ছেলের বুদ্ধি দেখে।
গ্রামের রাস্তায় খান সেনাদের ট্রাক গর্তে পড়েছে। টেনে তুলতে পারছে না কিছুতেই। গ্রামের মানুষকে ডেকে আনা হয়েছে। তুলে দাও গাড়ী। মানুষ বাধ্য হয়ে হাত লাগিয়ে ঠেলছে, তবু গাড়ী ওঠে না। খান সেনার অফিসার হাঁকছে: কিউ নেহি উঠতা?
গ্রামবাসীদের মধ্য হতে সমস্বরে জবাব আসে এক সাথে আওয়াজ না দিলে উঠবে না!
: আওয়াজ? কেয়া আওয়াজ?
: জয় বাংলার আওয়াজ!

: জয় বাংলাকা আওয়াজ! খান সেনাদের মুখ কুঞ্চিত হয়। মেশিনগান কি টিপে দেবে? না, কুকুর যে গর্তে পড়েছে। তাই বলে: জয় বাংলাকা আওয়াজ? ঠিক হ্যায়। লেকিন জেয়াদা নেহি। শ্রেফ এক মোর্ত্তবা বোলো: জয় বাংলা।

এই নিয়ে আমরা বাঁচি। গল্প নিয়ে। কাহিনী নিয়ে। গুজব নিয়ে। বন্ধু এসে বলে, খান সেনাদের সাহসের কথা শুনেছেন!

: কি।

: কাল রাতে সিদ্ধেশ্বরীতে আমাদের বাসায় এসে পাহারা দিচ্ছে। স্কুলে পরীক্ষা নিবে। তাই পাহারা বসিয়েছে। সন্ধ্যা না হতেই ঘাবড়ে যেয়ে বলছে, দরোয়াজা বন্ধ করো। দরোয়াজা বন্ধ করো। গুলি শুরু হো যায়গা। বলেই ভয়ের চোটে ছুটে একেবারে তেতালার ছাদে। তা ছাদে যাবি তো যা। আমাদের নিয়েও টানাটানি: তোম লোগভি আযাও। হামারা সাথ গার্ড দেনে হোগা।

স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার খবর দিচ্ছে: গত তিন মাসে অন্তত: পঁচিশ হাজার খান সেনা নিহত হয়েছে। কি করে মিলাই এ খবর?

সাথী বলেন এক কাহিনী। মিলিটারী জিপ যাচ্ছে। খানসেনা ঠাসা। তার মধ্যের একজন কায়দা করে ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখিয়ে সামনের সিটে বাইরে পা ঝুলিয়ে বসেছে। ড্রাইভার হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে: পা আন্দার লাইয়ে। অ্যাকসিডেন্ট হো যায়গা। খান সেনা জবাব দিচ্ছে হতাশ ভঙ্গীতে: আরে ইয়ার ছোড়দো। মরনে তো হোগা। হিঁয়া নেহি তো উপা ফ্রন্টমে। তিন ভাই এসেছিলাম। তার দুজন তো এরই মধ্যে খতম হয়ে গেছে।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আর মুক্তি বাহিনীকে রোখা যাচ্ছে না। সব জায়গার মুক্তি বাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। খান সেনারা উদ্ব্যস্ত। যাকে পাচ্ছে তাঁকেই ধরছে 'মুক্তি' বলে। অফিসের কেরানী কর্মচারীর আইডেনটিটি কার্ড রাগে ছিড়ে ফেলে বলছে: ইয়ে সব লোক 'গাদ্দার' হ্যাঁয়। ও দিনকো অফিস করতা আওর উসকা বাদ রাত মে মুক্তি হোতা।

খুবই সত্য কথা। কিন্তু বেধড়ক মানুষ মারলেই তো মুক্তি মরে না। তাই যত মারে তত মুক্তির আঘাত আসে। গাছপালা ঘেরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে খান সেনাদের গাড়ী। শুধু গ্রেনেড নয়। গ্রেনেডসহ একটি যুবক নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাছের মাথা থেকে ট্রাকের উপর। নিজেকে সহ উড়িয়ে দিয়েছে খানসেনাদের গোটা ট্রাকটাকে।

খান সেনারা ঘাবড়ে যাচ্ছে। ইয়ে তো বড়া আজব চীজ। ইয়ে কাঁহাসে আতা, কাঁহা যাতা, কুই পাত্তা নেহি, মালুম নেহি।

টাঙ্গাইলের বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এর কাহিনী খানসেনাদের বিরুদ্ধে পরিহাসের গল্প হয়ে ঢাকায় এসেছে। আমরা শুনেছি, পাকসেনারা বহুদিন পরে যে দিন টাঙ্গাইল ঢুকলো সেদিন টাঙ্গাইলে মুক্তিবাহিনীর জারী করা কারফিউ চলছে।

খানসেনারা টাঙ্গাইলে ঢুকে দেখে, কোন লোক রাস্তায় বেরোয় না। তারা জিজ্ঞেস করে: কিউ।

টাঙ্গাইলবাসীরা জবাব দেয়: বেরুব কেমন করে মুক্তি বাহিনী; কারফিউ দিয়ে রেখেছে।

কারফিউর একচ্ছত্র মালিক খানসেনারা ক্ষেপে যায়: ইয়ে কারফিউ নেহি চলেগা। ইয়ে কারফিউ তোড় দো!

বিশ্বব্যাঙ্কের কারগিল মিশনের কাছে বন্দী ঢাকার মানুষ সেদিনও মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। কারগিল মিশন এসেছে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা সরেজমিনে দেখতে। মনে সন্দেহ যতোই থাকুক, ইয়াহিয়া-টিক্কার উপায় থাকেনি মিশনকে বাংলাদেশে আসতে না দিয়ে। মিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাঙ্ক মিটিং করে ঠিক করবে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া যাবে কিনা। বিশ্বব্যাঙ্ক পাকিস্তানকে অর্থনীতিক সাহায্য মঞ্জুর করলে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম আরো দীর্ঘকালীন এবং আরো কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু নিহত বাঙ্গালীর জন্য কারগিল মিশনের সহানুভূতির কথা আমাদের অগোচর রইল না। ইয়াহিয়া-টিক্কার কাগজে কিছু না লিখুক। বন্দী মানুষের সহানুভূতির কথা আমাদের অগোচর রইল না। ইয়াহিয়া-টিক্কার কাগজে কিছু না লিখুক। বন্দী মানুষের কান থেকে কানে, চোখ থেকে চোখে ছড়িয়ে পড়ল সেই কাহিনী।

কারগিল মিশন সামরিক জান্তার অফিসারদের জিজ্ঞেস করল: তোমাদের কারখানা কেমন চলছে?

জবাব এল চটপট: বিলকুল নরম্যাল।

আচ্ছা আমরা নারায়ণগঞ্জের শিল্পাঞ্চল দেখতে যাব। রাজী হতে হল টিক্কার সাগরেদদের। কন্ট্রোল রুম থেকে হুকুম গেল গোপনে: কাল দুপুরে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা যাবে মিল দেখতে। গ্রাম থেকে লোক ধরে মিলের নরম্যালসি দেখাও।

পরদিন দুপুরে কারগিল মিশনকে নিয়ে যাওয়া হল একটা কাপড়ের কলের মধ্যে। মেশিন চালু করেছে খানসেনারা। মিশনের প্রতিনিধিরা আস্তে আস্তে হাঁটছেন কারখানার মধ্য দিয়ে। মেশিনের শব্দের মধ্যেও কান খাড়া আছে। হাতের কাজ করতে করতে একজন বাঙ্গালী সুযোগ পেয়ে বলে দিল: কাম আফটার টু আওয়ার্স: দু'ঘণ্টা পরে আবার আসুন।

মিশনের নেতা যেন শুনতেই পাননি। এক মিল থেকে আর এক মিলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দু'ঘণ্টা পরে বায়না ধরলেন। ঐ আগের মিলটাকে আবার একবার দেখতে চাই। সে মিলে ফিরে এসে দেখেন: মিলের গেট পর্যন্ত বন্ধ। মিশনের নেতা টিক্কাখানকে জিজ্ঞেস করেন: এ কি রকম নরম্যালসি? টিক্কা জিজ্ঞেস করে তস্য টিক্কাকে। তস্য তার তস্যকে। শেষকালে স্বীকার করে। থোরাকুছ গলতি হুয়া।

প্রায় মন্দিরই ওরা গুড়িয়ে দিয়েছে। রমনার ময়দানের মন্দিরের চূড়ার ন্যায় উঁচু চূড়া ঢাকার অপর কোন মন্দিরের ছিল না। দেশী বিদেশী কোন মানুষ না জানতো যে, এখানে বিরাট এক মন্দির ছিল।

মিশন প্রধান জিজ্ঞেস করলেন খান বাহিনীর অফিসারকে: এ মন্দিরটা তোমাদের কি ক্ষতি করেছিল?

বর্বরের জবাব তৈরী ছিল: হিঁয়াছে গুলি আয়া। এখান থেকে গুলি এসেছিল, মর্টার মেরেছিল।

মিশন প্রধান অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন: ইভেন গডেস কালী ওয়েন্ট অ্যাগেনস্ট ইউ! কী তাজ্জব ব্যাপার। দেবী কালীও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে।

মিশন জিজ্ঞেস করছেন: ঢাকায় আরো অনেক মন্দির ছিল। সবই তোমরা ধ্বংস করেছো?

ইয়াহিয়ার অনুচররা বলে: নেহি নেহি। অনেক মন্দির আছে। মিশন প্রশ্ন করেন: সব

পুরোহিতকে তোমরা মেরে ফেলেছ?
খান সেনার অফিসার জবাব দেয়: কভি নেহি। প্রিস্টভি হায়।
: ঠিক আছে আমরা পুরোহিত দেখতে চাই আর দেখতে চাই মন্দিরে পূজো হচ্ছে।
প্রমাদ গুণে দখলদার সরকার তবু মুখরক্ষার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, সন্ধ্যায় তোমরা মন্দিরে পূজো দেখবে।
সন্ধ্যায় এক মন্দিরে নিয়ে যায় খান সেনা আর দখলদার সরকারের পুলিশ বাহিনীর অফিসার। পুরোহিত মন্ত্র আওড়াচ্ছিল জোরে জোরে। মিশন এগিয়ে এলেন মন্দিরের কাছে। পুরোহিত চোখ তুলে চেয়ে দেখল, পুলিশ অফিসার। অমনি ঘট করে উঠে খট করে সেলাম ঠুকলো পুরোহিতবেশী আই বি ওয়াচার তার পুলিশ অফিসারকে।
মিশনের প্রতিনিধিদের চোখে মুখে হাসি। হেসে বলেন: ওহ! হাউ স্মাট এ প্রিস্ট উই সি। বাহবা! কি চতুর পুরোহিত, বলে বেরিয়ে আসেন মিশন মন্দির থেকে।
ঢাকার শাঁখার কথা কোন্ রসিক বিদেশী না শুনেছে? সেই শাঁখার শিল্পকেন্দ্র শাঁখারী বাজার। তাকে জনশূন্য করে দিয়েছে খানসেনারা মেশিনগান আর মর্টারের গোলাবর্ষণে। সে কথা মিশনের কানে পৌঁছেছে। সেই সত্য যাচাই করার চেষ্টা করছেন মিশন।
নিউমার্কেটে ইংরেজী জানে বলে মনে হয় এরূপ বাঙ্গালী যুবক একজনকে ধরে অনুরোধ করে মিশন: আমাদের একটু শাঁখারী বাজারে নিয়ে চলো না? অনুরোধ শুনে আতঙ্কিত বাঙ্গালী যুবক শিউরে ওঠে। বলে, এক্সকিউজ মি প্লিজ। আমাকে মাফ করুন।
মিশন প্রধান বলে উঠেন: আমরা যা জানতে চেয়েছিলাম তা পেয়ে গেছি। ধন্যবাদ। আপনার যাবার প্রয়োজন নেই।
আমি কি বন্দী ঢাকার সব কাহিনী জানি? তবু বন্দী ঢাকার বন্দী মানুষ আমরা কেমন করে যে বেঁচেছি, কি ছিল আমাদের মনের খোরাক তারই আভাস দিতে চেষ্টা করলাম এই কাহিনী ক'টিতে।

১৯৭২

নানা কথা এবং নানা কথার পরের কথা
সরদার ফজলুল করিম, প্যাপিরাস, ১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

বঙ্গবন্ধু

"তোমার নেতা, আমার নেতা- শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।" স্বাধীন বাংলার মুক্ত আকাশের নীচে নিঃশঙ্ক চিত্তের ধ্বনি নয়। বিশাল ঝড়ের পূর্বক্ষণে আকাশে ধূসর কালো মেঘগুলো যখন ঈশান কোণে কেবল পুঞ্জিভূত হয়ে চলেছে, সেই মহালগ্নের আওয়াজ কচি কচি কণ্ঠে। জানিনে, কর্মব্যস্ত উদ্বেগভরা প্রতিদিনের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে শিশুদের এই মোর্চার সামনে পড়ে তাঁর মনে কী আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে মানুষ দোজখের আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েও জীবনের হাসি হাসতে পারেন, তিনি শিশুমোর্চার সামনে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম আতঙ্কে বলে উঠেছিলেন: "আরে বাবা, তোদের নেতা শেখ মুজিব! এমন বিচ্ছুদের নেতা হওয়ার আমার সাহস নাই।"

কিন্তু বাংলাদেশ জানে, শেখ মুজিব এই বিচ্ছুদেরই নেতা হয়েছিলেন, যে কিশোর-তরুণ বিচ্ছুরা জল্লাদবাহিনীর হাতে রাইফেল কেড়ে নিয়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য হাজারে হাজারে সংগ্রামের ক্ষেত্রে রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। ওদের সেই সংগ্রামী চোখের সামনে আশা আর সাহসের দেদীপ্য শিখা হয়ে জ্বলছিল যুদ্ধক্ষেত্রের বাঙ্কারে, অন্ধকার গোপন আড্ডায়, বন্দীর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে একটি নাম একটি প্রতীক: শেখ মুজিব।

– সরদার ফজলুল করিম

বঙ্গবন্ধু

তোমার নেতা, আমার নেতা-"শেখ মুজিব, শেখ মুজিব" –কোন একদিন এ আওয়াজ যদি কয়েকটি যুবক বা একটি মাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের থেকে থাকে, তবে আর একদিন এ আওয়াজই ফ্যাসিস্ট-বর্বর পাকিস্তানী জান্তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে সংগ্রামী বাংলাদেশের একমাত্র সার্বজনীন আওয়াজে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসে মহান নায়কদের নাম আছে। সান ইয়াত সেন, লেনিন, স্টালিন, গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহেরু প্রমুখ নেতার কথা আমরা পড়েছি। কিন্তু ইতিহাস মানেই অতীত। তা আমার কাছে দূর আর অপ্রত্যক্ষ। আর তাই ইতিহাসের এককালের মহান নায়কদের জীবনের সঙ্গে অন্য কালের পাঠক আবেগময় যোগ উপলব্ধি করতে পারে না। বুদ্ধি দিয়েই ইতিহাসের মহান নেতাদের জীবনের তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের সঙ্গে ১৯৭১ সালের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনের যে আবেগময় সম্পর্ক রয়েছে, একদিন হয়তো তার ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য ইতিহাসের গবেষণার বিষয় হবে, কিন্তু আজ তা আমাদের প্রতিটি জীবনের গর্বের, গৌরবের আর আনন্দের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। আর ইতিহাসেরও এ এক অপার বিস্ময়।

গল্প শুনেছি, শেখ সাহেব গেছেন অপর এক সহকর্মীর বাড়িতে বেড়াতে কিংবা কাজের কথা বলতে। বাড়ির উঠানে পা দিতে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর পাঁচ থেকে দশ বছরের শিশুমোর্চার সঙ্গে। তারা কাঠির মাথায় কাগজ বেঁধেছে, নিশান লাগিয়েছে। সারিবদ্ধ হয়েছে আর ছোট্ট উঠানে চক্রাকারে ঘুরছে আর বলছে: "তোমার নেতা, আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব"; "ভুট্টোর মুখে লাথি মার–বাংলাদেশ স্বাধীন কর"; "ইয়াহিয়া খানের মুসলমানি– একপোয়া দুধে তিন পোয়া পানি"। ঘুরে ফিরে আবার: "তোমার নেতা, আমার নেতা- শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।" স্বাধীন বাংলার মুক্ত আকাশের নীচে নিঃশঙ্ক চিত্তের ধ্বনি নয়। বিশাল ঝড়ের পূর্বক্ষণে আকাশে ধূসর কালো মেঘগুলো যখন ঈশান কোণে কেবল পুঞ্জিভূত হয়ে চলেছে, সেই মহালগ্নের আওয়াজ কচি কচি কণ্ঠে। জানিনে, কর্মব্যস্ত উদ্বেগভরা প্রতিদিনের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে শিশুদের এই মোর্চার সামনে পড়ে তাঁর মনে কী আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে মানুষ দোজখের আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েও জীবনের হাসি হাসতে পারেন, তিনি শিশুমোর্চার সামনে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম আতঙ্কে বলে উঠেছিলেন: "আরে বাবা, তোদের নেতা শেখ মুজিব! এমন বিচ্ছুদের নেতা হওয়ার আমার সাহস নাই।"

কিন্তু বাংলাদেশ জানে, শেখ মুজিব এই বিচ্ছুদেরই নেতা হয়েছিলেন, যে কিশোর-তরুণ বিচ্ছুরা জল্লাদবাহিনীর হাতে রাইফেল কেড়ে নিয়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য হাজারে হাজারে সংগ্রামের ক্ষেত্রে রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। ওদের সেই সংগ্রামী চোখের সামনে আশা আর সাহসের দেদীপ্য শিখা হয়ে জ্বলছিল যুদ্ধক্ষেত্রের বাঙ্কারে, অন্ধকার গোপন আড্ডায়, বন্দীর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে একটি নাম একটি প্রতীক: শেখ মুজিব।

শেখ মুজিব একজন মানুষ। তা আমরা জানি। তাঁর দেহ আছে। তাঁর সুস্থতা-অসুস্থতা আছে। আমাদের মত তাঁরও আত্মজন আছে। বৃদ্ধ পিতা আছেন। মা আছেন। তাঁর

অবোধ সন্তান আছে। তবু বাংলাদেশের দুর্জয় সংগ্রাম আর সাহসের প্রতীক শেখ মুজিব যেন ব্যক্তি শেখ মুজিবকে অতিক্রম করে গেছে। এ প্রতীক শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বন্দী, মুক্ত সব মানুষের কাছে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রি থেকে একটি পবিত্র আশা আর স্বপ্নের রূপ ধরে ভাসছিল।

২৭ মার্চ। পাক জল্লাদ সামরিক বাহিনী কারফিউ কয়েক ঘণ্টার জন্য হ্রাস করেছে। বাসা থেকে দুরু দুরু বুকে রাস্তায় বেরিয়েছি। মেশিনগান রেডি পজিশনে সৈন্যবাহিনীর গাড়িগুলো টহল দিচ্ছে। দেখতেই বুক কেঁপে উঠছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ফকিরপুল বাজারের দিকে এগুচ্ছি।

বাজারের মুখ ইটের বেরিকেডে তখনো বন্ধ। ভয়ার্ত মানুষ কিছু জড়ো হয়েছে। একটা মিলিটারী ট্রাক দেখে ভয়ে আবার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে। আমিও ভয়ে ভয়ে ঢুকে পড়েছি টিএন্ডটি কলোনীর দেয়ালের মধ্যে। মনে হল, একজন বাঙ্গালি পুলিশকে ঘিরে বেশ কিছু লোক কি যেন বলছে। কাছে গেলাম। শত মুখে কোটি কোটি প্রাণের একমাত্র প্রশ্ন সেই বাঙ্গালি পুলিশটির উপর বর্ষিত হচ্ছেঃ আপনি ছিলেন শেখ সাহেবের বাসায় ২৫ তারিখ রাতে? আপনি গার্ড ছিলেন? বলুন, বলুন, শেখ সাহেব কেমন আছেন? কোথা আছেন? কী বললেন? ওরা গ্রেপ্তার করেছে? হায় আল্লাহ! বেঁচে আছেন তো? বেঁচে আছেন তো শেখ সাহেব? বেঁচে আছেন তো? এই একই প্রশ্ন। এই প্রশ্ন শুধু সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালির মনেরই দিনরাত্রির প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন ছিল বাঙ্গালির মুক্তিসংগ্রামে সহানুভূতিশীল বিশ্বের প্রতিটি মানুষের।

দখলদার বাহিনীর হাতে বন্দী ঢাকার মানুষ আমি। পাখির মতো ছোট্ট বাসাটির চারপাশে কেবল ঘুরি। ডানে-বাঁয়ে সশঙ্কিত চোখে পথ চলি। ফ্যাসিস্ট হায়েনার সাথে দেশী কুকুরও নাকি পথে নেমেছে। যখন তখন ধরে নিয়েছে যাচ্ছে। পথ থেকে, হাট থেকে, বাসা থেকে। রাত-দুপুরে, ভরসন্ধ্যায়। শেষ রাতে নিস্তব্ধতায়। তবু এর মধ্যে মানুষ ফিসফিস করে কথা বলে। কানের কাছে নিয়ে ট্রানজিস্টার সেটে স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ আর চরমপত্র শুনতে চায়। একদিন যদি সে আওয়াজ খুঁজে না পায় তো হতাশায় মনটা ভরে উঠে। শুনেছ, যাত্রাবাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে আকাশবাণী শোনার অজুহাতে। শুনেছ, পুরান শহরে আওয়াজ দিয়েছে জল্লাদের দল, আকাশবাণী আর স্বাধীন বাংলা শুনলে গুলি করা হবে। তবু কানের কাছে মানুষ তুলে নেয় দেবদুলাল বাবুর দরদভরা সহানুভূতির আওয়াজকেঃ "ভয় নেই বন্ধু। এ মৃত্যুর শেষে জীবনের সূর্য উঠবেই। ঐ শোন মুক্তিবাহিনীর বিষাণ বাজছে।"

হাঁটছিলাম পথ দিয়ে। পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটি বৃদ্ধা। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। জীবনের আর ভয় কি! এই মৃত্যুর মাঝে। তাই যেন অসম সাহসে কথা বলে চলেছে সঙ্গের মানুষটিকে ডেকে ডেকেঃ "শুনছো! ফাঁসি দিবে বোলে হারামজাদারা শেখ মুজিবকে। দেশময় ঘরবাড়ি জ্বালাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ মারছে। আবার ফাঁসি দিবে শেখ মুজিবকে, আল্লাহ কি নাই? সইবে না পাপ। ওরা মরবে। এই হারামজাদারা মরবে।" বৃদ্ধা বলেই চলেছে সেদিনের নিষিদ্ধ পরীতে সবচেয়ে নিষিদ্ধ কথা।

বর্বরে হাস্যকর সাহস দেখাতে কোন কুণ্ঠা ছিল না। তাই সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করেছিলঃ শেখ সাহেব কি জীবিত আছে, তখন জল্লাদ ইয়াহিয়া জবাব দিয়েছিলঃ হ্যাঁ, আজ জীবিত আছে, কিন্তু কাল থাকবে এমন কথা কে বলতে পারে? সেদিন সেই

পাপিষ্ঠের এই ব্যঙ্গোক্তিতেও আমরা শিউরে উঠেছিলাম। ঘরে ঘরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে একে অন্যকে প্রশ্ন করেছিলাম, শয়তানের এ কথার অর্থ কি? তবে কি ওরা শেখ সাহেবকে মেরে ফেলেছে?

কিন্তু আশার পতাকাকে কি কেউ শেষ করতে পারে? তুমি তাকে যতোই ছিন্ন করতে চাও, সে ছিন্ন হতে হতে শত থেকে সহস্র, সহস্র থেকে অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটিতে পরিণত হয়।

৭ সেপ্টেম্বর জল্লাদের অনুচরেরা এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। জীবন নাশের আতঙ্কে কে না আতঙ্কিত হয়। প্রিয়জনের বিচ্ছেদের ব্যথা কার না লাগে! সেই আতঙ্কিত বিমর্ষ অবস্থায় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢুকতে প্রথম রাতেই প্রহরারত বাঙ্গালি সিপাহীর মুখে শুনলাম শেখ সাহেবের কথা।

"আপনিতো পুরোনা মানুষ। আপনি এই যে বিশ ডিগ্রীতে আছেন এর পাশেই দেওয়ানী। সেই দেওয়ানী ফটকে ছিলেন শেখ সাহেব। সেই যখন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় ওঁকে জড়িয়ে দিল। তখন এখান থেকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এসে রাতের অন্ধকারে জেলের সব বন্দী যখন তালাবদ্ধ, তখন তাঁকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে, সেই ১৯৬৮ সালে। যে সিপাহীদের পাহারায় রেখেছিল জেল কর্তৃপক্ষ আমিও ছিলাম তার মধ্যে। ক্যান্টনমেন্ট যেতেই যখন হবে, তখন আর বাধা না দিয়ে শেখ সাহেব বেরিয়ে এলেন দেওয়ানী ফটকের বারান্দা থেকে। সামনের মাটি থেকে এক মুটো মাটি তিনি হাতে তুলে নিলেন। মনে হচ্ছিল যেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে বাংলার ক্ষুদিরাম আবার হাসতে হাসতে অগ্রসর হচ্ছে। এক মুটো মাটি তুলে কপালের কাছে নিয়ে যেন বললেন: 'যাই ভাই। তোমরা আমায় দোয়া করো।"

এ কাহিনী শুনতে শুনতে নিজের মনের বিষাদ যে কখন কেটে গেল তা জানতেও পেলাম না। শেখ সাহেব নিজে যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে গেলেন পরবর্তীকালের ভয়ার্ত বন্দী মানুষের জন্য আশার টুকরা, সাহসের মণি আর দেশকে ভালবাসার মন্ত্র। আশার পতাকাকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। আর তাই অযুত জনতা ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে ফাঁসির সজ্জিত মঞ্চ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল তাদের জীবন আর সংগ্রামে প্রতীক শেখ মুজিবকে।

সেই ১৯৬৯ সালের কথা। যখন শুনেছিলাম শেখ মুজিব ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত হয়েছিল, তখন বুদ্ধি আর বয়সের সব বাধা অতিক্রম করে চোখে আবেগের অশ্রু নেমেছিল। জানি, লক্ষ মানুষের বাধা অতিক্রম করে তাকে দেখতে পাবো না। তবু যেন কিসের আকর্ষণে সেদিনও ছুটে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়ির দিকে। নিজের মনকে বলেছিলাম: না দেখলাম শেখ সাহেবকে। জনতাকে দেখাই তো শেখ সাহেবকে দেখা। জন দিয়েই জনতা। আমি সেই জনতারই একজন হব আর সেই জনতাকে দেখেই নিজেকে গর্বিত মনে করব।

আমেরিকার সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকা পাকিস্তানে কোনদিন নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে, কল্পনায় আর যা কিছু চিন্তা করে থাকি না কেন, এমন কথা কল্পনা করিনি। দখলদার পাক-বাহিনীর হাতে বন্দী বাংলাদেশ আর ঢাকায় সেই 'টাইম' পত্রিকাও নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে। তার সাধারণ সংখ্যায় বাংলাদেশের একটি কথাও থাকতো না। কিন্তু গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যায় নাকি বাংলাদেশের সংগ্রামের কথা কিছু কিছু থাকছে।

গোপনে গোপনে সেইসব সংখ্যা সংগৃহীত হচ্ছে। হাতে কপি করে তা কেউ কেউ বিলি করছে। দুরু দুরু বুকে 'টাইম' পত্রিকার সেই কপি আমরা পড়েছি। এরই এক সংখ্যায় দেখলাম, রমনা ময়দানে ৭ মার্চের লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েতের একটি ছবি তুলে পাশে শেখ সাহেবের একটি জীবনালেখ্য দিয়েছে। শেখ সাহেবের একখানি ছবি দিয়েছে। আর তার নীচে লিখে দিয়েছে: "ফ্রম হিরো টু মারটায়ার"- বীর থেকে শহীদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ঠিকই চেয়েছিল আমাদের আশার এই প্রতীককে নিশ্চিহ্ন করতে। আমেরিকার বিবেকবান মানুষ তাদের সরকারের যে ষড়যন্ত্রে সামিল হননি। ভারতের গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অকুণ্ঠ সমর্থন আর সাহায্যের সঙ্গে পৃথিবীময় বিবেকবান মানুষ সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছে বন্দী সংগ্রামী বাংলার দিকে।

সহস্র আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিব ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ সালে আবার এসে দাঁড়ালেন সেই রমনা ময়দানে, যেখানে তিনি শেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন: "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

দূর মধ্যপ্রাচ্যের ইয়াহিয়ার বন্দীশালার দুর্বিষহ নিঃসঙ্গতা আর চিন্তায় শুকিয়ে যাওয়া দীর্ঘদেহ মানুষটি লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে যখন বললেন: "আমি আবার আপনাদের কাছে এসেছি। লক্ষ লক্ষ ভাই, মা আর বোন নিজেদের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন, আমাকে মুক্ত করেছেন। আমার প্রতি ভালবাসার কোন পরিমাপ নেই। এর কোন প্রতিদান আমি দিতে পারিনে" -তখন এমন বাঙ্গালি ছিল না, যার নিজের চোখেও পানি জমেনি এবং আবেগে গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসেনি।

সরদার ফজলুল করিমের অগ্রন্থিত প্রবন্ধ সংকলন

সংকলন: শেখ রফিক, র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মহাত্মা গান্ধী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধী– এই যে এঁদের এমনভাবে কাতারবন্দী করা হয়েছে, এর দান-অবদান আমার নয়। আসলে এমনভাবে এঁরা কাতারবন্দী হবেন, এ-কথা আমি কল্পনা করতে পারিনি। এঁদের এ-ভাবে কাতারবন্দী দেখে আমার মনটা আলোড়িত হয়ে ওঠে। বাস্তবিক, ব্যাপারটা চিন্তা করার। চিন্তা করলে মন আলোড়িত না হয়ে পারে না।

বয়সের বিধানেই বোধহয়, এখন আমার যখন-তখন চোখে পানি আসে, গলা ধরে যায়। কারুর কাছ থেকে একটু ভালো কথা, আশার কথা, অনুপ্রেরণার কথা কিংবা বেদনার কথা শুনলেই চোখে-গলায় আবেগের সৃষ্টি হয়। তখন সেই মুহূর্তে আর পরিষ্কার করে বাক্য উচ্চারণ করতে পারিনে। আবেগ তো মনেই হয়। কিন্তু আমি চোখের কথা বলেছি এই কারণে যে, চোখে কিংবা গলাতেই তার প্রকাশ ঘটে। অবাধ্য চোখের পাতার আর্দ্রতা মুছতে মুছতে মুখে হাসি আসে। ভাবি, এ তো বড় মজার ব্যাপার! ইচ্ছা না হলেও চোখে পানি এসে যায়! এর বিজ্ঞান-অ-বিজ্ঞানের আলোচনা থাক। কিন্তু একথা অস্বীকার করি কি করে, এমন লাইনবদ্ধভাবে মহাত্মা গান্ধী, শেখ মুজিব আর ইন্দিরা গান্ধী– নাম তিনটি উচ্চারণকালেও আমার মনে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

অথচ সচেতন বুদ্ধি দিয়ে বলি, আমি এ-তিনজনের কারুরই অন্ধভক্ত কোনোদিন ছিলাম না। এটা কোনো বাহাদুরির কথা বলছিনে। এঁদের তিনজনের কার্যকলাপকেই নিজের জীবনে নিজের চোখে কিছুটা দেখেছি, নিজের কানে শুনেছি এবং বই-পত্রে পড়েছি। বলা চলে, কিছুটা বিরুদ্ধভাবের পর্যালোচনামূলক মনোভাব।

গান্ধীজীকে হত্যা করা হয়েছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা পশুতে করেনি। হত্যা মানুষেই করেছে। আমরা অবশ্য আমাদের অপছন্দের মানুষকে অনেক সময়ে পশুর সঙ্গে তুলনা করি। বলি: ওটা পশু। ও পশুর মতো আচরণ করেছে। অথচ এমন তুলনা অর্থহীন। মানুষ নিজের চরিত্রহীনতাকে পশুর ওপর আরোপ করতে চায়। আসলে পশুর রাজ্যে এমন অহেতুক, অযৌক্তিক এবং অ-পাশবিক আচরণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যেই দেখা যায় অমানবিক আচরণ। অমানবিক এ কারণে যে, এমন আচরণ যে প্রজাতি হিসেবে মানবগোষ্ঠীর জন্য আত্মহত্যামূলক, এই কথাটা এই মানুষরা বুঝতে পারে না।

গান্ধীজীকে কে হত্যা করেছিল? সে-নামের উচ্চারণ বা অনুচ্চারণে কিছু আসে যায় না। সে গডসে কিংবা নিডসে, তাতেও কিছু পার্থক্য হয় না। সে মানুষ। গান্ধীজীও মানুষ ছিলেন। গডসেও মানুষ। গান্ধীজী জীবনব্যাপী নানা আচরণে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সেই আচরণে তাঁর আদর্শ, বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে: ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি বা সমাজনীতি, যে-ক্ষেত্রের কথাই বলি না কেন, গান্ধীজীর আচরণের মধ্যে তাঁর আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই সব আদর্শকে কি আমি বা আমরা সবসময়ে সমর্থন করেছি? তা নয়। সেই '৪৫, '৪৬, '৪৭ সালে নানা ব্যক্তি, দল-উপদল

নানাভাবে গান্ধীজীকে ব্যাখ্যা করেছে, সমালোচনা করেছে। আবার অসংখ্য তাঁর অনুসারীও ছিল। তাঁর সহযোগী-সাথিরা ছিলেন। তাঁরা তাঁর আদর্শকে প্রচার করেছেন। গান্ধীজীর কোনো বিশেষ রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সমাজনীতিক বা ধর্মীয় নীতিকে আমি সমালোচনা করতে পারি। আমরা করেছিও। কিন্তু একটা মৌলিক সত্যকে তিনি তাঁর আচরণ দ্বারা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন: মানুষকে মানুষের সঙ্গেই বাস করতে হবে। তাদের পারস্পরিক বৈষম্য এবং বিভেদকে দূর করতে হবে। মানুষের ওপর মানুষের নির্যাতনের অবসান আবশ্যক। আমাদের মত-পার্থক্য ছিল তাঁর উপায়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর লক্ষ্যের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু গান্ধীজীকে যারা হত্যা করেছে, তাদের আচরণে তাদের কি আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে? যা ঘটেছে, সেটা এই যে, মানুষ মানুষের সঙ্গে বাস করতে পারে না। এবং কারুর যদি অপর কাউকে অপছন্দ হয়, তাহলে তাকে অবিলম্বে হত্যা করতে হবে। গান্ধীজীর হত্যাকারীরা অদূরদৃষ্টির লোক। তারা অর্বাচীন। আসলে তারা বোঝেনি: গান্ধীজীকে হত্যা করে তারা মানুষ হিসেবে নিজেদের অস্তিত্বকেই হত্যা করেছে। কারণ, তোমার যদি হত্যা করার অধিকার থাকে অপরকে, তাহলে অপরেরও অধিকার আছে তোমাকে হত্যা করার। এমন পারস্পরিক হত্যার ফলে পরিশেষে কাউকে হত্যা করার কিংবা কেউ নিহত হওয়ারই অবশিষ্ট কোনো মানবপ্রাণী থাকে না। এই কথাটি এই অর্বাচীনেরা বুঝতে পারেনি। এখানেই গান্ধীজীকে হত্যা করা অমানবিক। এটা পাশবিক নয়। পশুরা অপর এমন কোনো নিরীহ পশুকে হত্যা করে না। গান্ধীজী যখন মানুষের হাতের আঘাতেই ঢলে পড়লেন, তখন তাঁর মুখ দিয়ে কোনো অভিযোগ-বাণী উচ্চারিত হয়নি। তিনি নাকি কেবল বলেছিলেন: হে ঈশ্বর! হা রাম! সে উচ্চারণে বিস্ময়ের বেদনা থাকতে পারে, এতোদিনের তাঁর ভালোবাসার, তাঁর প্রেমের এই প্রতিদানের জন্য বিস্ময় বা বেদনা। কিন্তু অভিশাপ ছিল না। সে-উচ্চারণে প্রকাশিত হয়েছিল অধিকতরভাবে এই বিশ্বাস: মানুষের সমাজকে রূপান্তরের পথ অনেক দীর্ঘ। তাকে সহজ ভাবাই ভুল।

শেখ মুজিবকে যখন সে রাতে ঘেরাও করে অস্ত্রধারীরা হত্যা করলো, তখন সাহসী শেখ মুজিব ভীত হলেন না। যারা তাঁকে গুলি করলো, তাদেরকে তিনি চেনেন। তাঁর মুখেও উচ্চারিত হয়েছিল বিস্ময়ের ধ্বনি: তোরা কি করছিস! এই কথা বলেই নিজের ঘরের সিঁড়ির ওপর তিনি গড়িয়ে পড়েছিলেন। হত্যাকারীরা তাঁকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য নিশ্চয়ই আরো গুলি ছুঁড়েছিল। গুলিবিদ্ধ সে-দেহকে দেশবাসী কেউ দেখতে পারেনি। যারা দেখেছিল, তাদের কেউ যদি এখনো বেঁচে থাকে, হয়তো তারা বলতে পারে, ক'টা বুলেট সে-দেহে বিদ্ধ হয়েছিল, কেমন করে সেই দীর্ঘদেহী ফরিদপুরের এককালের গ্রামের যুবকটি ঢলে পড়েছিল।

১৯৭৫-এর ১৪ আগস্ট রাতে আমিও চিন্তা করেছিলাম ১৫ আগস্টের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বেশ কিছুটা উত্তেজনা বিরাজ করছে। শেখ মুজিব আসবেন ইউনিভার্সিটিতে। তিনি কোন কোন পথ দিয়ে যাবেন, কোন বিভাগ থেকে যাবেন কোন বিভাগে, উপাচার্য তাঁকে কীভাবে সংবর্ধনা জানাবেন ইত্যাদি কর্মসূচি প্রচার করা হয়েছিল। দেশে তখন বেশ কিছুটা রাজনৈতিক উত্তপ্ত অবস্থা। আমি নিরীহ শিক্ষক। কেবল দুই চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করি। ঘটনা থেকে ঘটনার চমকে চমকিত হই। নিজের ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্য মানি। কতো ঘটনা দেখলাম! পঞ্চাশ বছর আগেও আমার

পূর্বজগণ এতো দ্রুত এতো সব ঘটনার সাক্ষাৎ পেতে পারতেন না। ঘটনাই-তো জীবন। যতো ঘটনা ততো সেই জীবনের চঞ্চলতা। ১৯৭১-এর ঘটনা শুধু দেখলাম না, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে নিহত হলাম। মৃত্যুর পরে বাঁচা বলে যদি কিছু থাকে, তবে ১৯৭১-এর পরে মৃত্যুর পর বাঁচার সেই বোধ হলো। তাতে একটা লাভ আমাদের এই হলো যে, মৃত্যুর ভয়টা একেবারে চলে গেল। মৃত্যুর পর মরার আর কি ভয় থাকে? এবং সে-জন্যই বোধহয় ১৯৭১-এর পশ্চাৎকালে আমরা যেমন মারতে ভয় পাইনে, তেমনি মরতেও ভয় পাইনে। আমাদের ইতিহাসে কোনো যুগে এতো মানুষ কি মানুষকে মেরেছে এবং এতো মানুষ মরেছে? এবং এখনও চিন্তা করলে কৌতুকের এই বোধটি আসে যে, মৃত্যুর জন্য যদি ভয় না থাকে, তবে মরণের আর তাৎপর্য কি রইলো? আমরা আগে মানুষকে ভয় দেখাতাম, তোমাকে মেরে ফেলবো! অর্থাৎ তুমি ভয় পাও। ভয় পেয়ে আমার অকাম্য কাজ থেকে তুমি নিবৃত্ত হও। কিন্তু আমার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা যখন যথার্থই বলে, মৃত্যুকে আমি ভয় পাইনে, তখন তাকে মারের ভয় দেখিয়েও যেমন কোনো লাভ হয় না, তেমনি তাকে মেরে ফেলেও না। কারণ মেরে ফেলেতো কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না। এই কথাটি কেবল আমরা, হত্যাকারীরা বুঝিনে। মেরে ফেলে কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় না। সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ হচ্ছে দীর্ঘ বিবর্তনের পথ। মুক্ত মোকাবিলার পথ। যুক্তির সঙ্গে প্রতি-যুক্তির লড়াইয়ের পথ। এ-পথের কোনো বিকল্প নেই।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যে আমরা অর্বাচীনের মতো মাথা কাটার পথ নিয়েছি, এ-আমরা শিখেছি পাতা টাকা থেকে। আমাদের ছেলেরা পরীক্ষার সময় বইয়ের পাতা কেটে নিয়ে যায়। পরিশ্রম করে পড়বে না। সহজে ব্লেড দিয়ে পাতা কাটবে। তাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারের প্রায় বইয়েরই পাতা কাটা। এখানের দশ পাতা, ওখানের বিশ পাতা। অথচ পাতা কেটে কি জ্ঞান অর্জন করা যায়? না, তা যায় না। অবশ্য এমন ভারি কথা বললে রাস্তাঘাটের, এমন কি ক্লাশ ঘরের যুবকরা বলে: রাখেন স্যার আপনার দর্শনের কথা। জ্ঞান কি আমরা ধুয়ে খাবো? পাস হচ্ছে আসল। আমাদের পাস করতে হবে। 'বাই হুক অর বাই ক্রুক।' যেমন করে হোক, পাতা কেটে, খাতা চুরি করে, মাস্টার মেরে: যে করেই হোক। কথাটার জোর আছে। পরীক্ষায় পাস করতে হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন: পরীক্ষা পাস করেই-বা কি হবে? এবং তুমি দর্শন বলো, আর বড় কথা বলো, সত্য তো এই যে, সব পরীক্ষা নিয়েই তোমার, আমার এবং দেশের জীবনের পরীক্ষা। সে পরীক্ষাতে পাতা কাটা, শর্টকাট বা 'মেডইজি'র তো কোনো জায়গা নেই।

১৫ আগস্ট ভোর রাতেই কিছু গুলির শব্দ শুনেছিলাম। ভোরের দিকে একটা মাইকের আওয়াজ: 'খুনী মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে'। 'খুনী মুজিব' কথাটাতে ততো চমক লাগেনি। খুন করতে গেলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুনী বলতে হয়। তবে অনেককাল আগের একজন জ্ঞানী বলেছিলেন: "খুনী কেবল এই কথাটি খেয়াল করে না, খুনীকে যে খুন করে, সেও একজন খুনী।'

আমি চমকিত হয়েছিলা, 'মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে'–এই আওয়াজটিতে। আর যে-কিছুর জন্যই সেদিন তৈরি থাকি না কেন, এই চমকটির জন্য নয়। আওয়াজ শুনে ভয়ে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। পরে একটু আলো ফুটতে ভয়ে

ভয়ে ঘরের পুবের জানালাটা একটু ফাঁক করেছিলাম। এই জনালা দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের মূল চত্বরটি দেখা যায়। আতঙ্কিত মনে চাইলাম সেই চত্বরটির দিকে। একেবারে জনশূন্য। হয়তো সকাল ছটা কিংবা সাড়ে ছটা। দেখলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উড়িয়ে একটি কালো রঙের গাড়ি নিউ মার্কেট-নীলক্ষেতের রাস্তার পশ্চিম দিক থেকে এলো, কলাভবনের দালানটিকে হাতের ডাইনে রেখে উত্তর মুখে ঘুরলো, কোথাও গেল, হয়তো পরিস্থিতিটা পর্যবেক্ষণ করলো। আবার কয়েক মিনিট পর গাড়িটা ফিরে এই পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এও আমার সেদিনের অভিজ্ঞতার আর এক চমক।

আমি একটু-আধটু শ্রেণিগত বিশ্লেষণের চেষ্টা করি। অপর কারুর জন্য নয়। নিজে বোঝার জন্য। 'ব্যাপারটা কি'–এই ধরনের আত্ম-প্রশ্নের আত্ম-জবাব হিসেবে। শ্রেণিগত বিশ্লেষণ একেবারে নিরর্থক নয়। আসলে কোনো ব্যক্তিইতো পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন কোনো অস্তিত্ব নয়। একজন ব্যক্তি হয় বড়লোক, নয় গরিব। নয়তো মাঝামাঝি। এই বড়লোক, গরিব আর মাঝামাঝি– এতো কেবল তার সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতে নয়। তার সম্পদতো আহরিত হয় কোনো মাধ্যমে, কোনো ব্যবস্থায়। এই সেই মাধ্যম বা ব্যবস্থাই হচ্ছে বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। একেই একটু তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়, ব্যক্তির শ্রেণিগত অবস্থান।

এবং অর্থনৈতিক এই শ্রেণিগুলোর মধ্যে সম্পদ বা সুযোগের তারতম্যের কারণে বিরোধ বিদ্যমান। মানুষের স্বাভাবিক জীবন-বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, সুবিধা-বঞ্চিতরা সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সুবিধাভোগীরা সে-লড়াইকে প্রতিরোধ করতে চায়। তাদের সুবিধাকে অব্যাহত রাখতে এবং বর্ধমান করতে চায়। আসলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য, অসামান্য তথা এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব মানুষের সমাজের অন্যতম চালক-শক্তি। কিন্তু এ-তত্ত্বের আলোচনাও আমার উদ্দেশ্য নয়।

আমার অনুভব হচ্ছে, ব্যক্তি শ্রেণি-উর্ধ্ব কোনো অস্তিত্ব নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই শ্রেণিগত একটা অবস্থান আছে। গান্ধীজীর ছিল। শেখ মুজিবের ছিল। ইন্দিরা গান্ধীর ছিল। সেই অবস্থান থেকে তাঁরা আচরণ করেছেন। তাঁদের বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সে-চিন্তার সাথে অপরের বিরোধ থাকতে পারে। গান্ধীজীর রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নীতিকে আমি অসমর্থন করতে পারি। আমার, তথা তাঁর বিপরীত পক্ষের যদি কোনো নির্দিষ্ট নীতি থাকে, তবে গান্ধীজীর যুক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে হবে। গান্ধীজীর পক্ষে যদি জনমত প্রবল থাকে, বিপরীত পক্ষকে তার নিজের যুক্তির জোর এবং কর্মের ব্যাপকতা ও গভীরতা দিয়ে সেই জনমতকে পরিবর্তিত করেনিজের দিকে নিয়ে আসতে হবে। অবশ্যই ব্যাপারটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। গান্ধীজীর নিজের জীবনই এর উত্তম দৃষ্টান্ত। এ-প্রক্রিয়ায় অধৈর্য হয়ে গান্ধীজীর মাথাটি কেটে ফেলে প্রক্রিয়ার পথটিকে হ্রস্ব করা যাবে না, যায় না। শেখ মুজিবের একটা শ্রেণিগত অবস্থান ছিল। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক পদ, দায়িত্ব এবং ক্ষমতা ছিল। তাঁর কর্মকাণ্ডে, চিন্তা-ভাবনায়, পদক্ষেপের বাস্তবতা কিংবা অবাস্তবতায়, চিন্তার গভীরতা কিংবা অগভীরতায়, সমস্যার মোকাবিলায় পারদর্শিতা কিংবা অপারদর্শিতায় মূলত তাঁর শ্রেণিগত শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই প্রকাশিত হয়েছে। তুমি বা তোমরা, যারা তাঁর বিপরীত পক্ষ, যারা তাঁর হত্যাকারী এবং তাঁর হত্যায় ক্ষণকালের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত, তোমাদেরও একটি শ্রেণিগত অবস্থান আছে।

তোমাদের এমন আচরণেও তোমাদের শ্রেণিগত চরিত্রেরই প্রকাশ ঘটেছে। তোমাদের মূল অবিবেচনা এখানে, যদি তোমাদের কোনো আদর্শ থাকে, রাজনৈতিক বা সামাজিক, তবে তাকে অর্জন করার পথ শেখ মুজিব বা তোমার প্রতিপক্ষকে হত্যা করা নয়। অবশ্য আগে উল্লেখ করেছি যে-জ্ঞানীর কথা, তাঁর উক্তিই খাঁটি। তুমি যদি শেখ মুজিবকে 'খুনী' বলে খুন করে থাকো, তবে তুমিও খুনী। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে খুন করা সাংঘাতিক কোনো কঠিন ব্যাপারও নয়। ছুরি দিয়ে খুন করা যায়। লাঠি দিয়ে খুন করা যায়। স্টেনগান-ব্রেনগান দিয়ে খুন করা যায়। কঠিন হচ্ছে, আদর্শগতভাবে খুন করা। শেখ মুজিবের ওপর এবং তাঁর স্ত্রীর ওপর এবং তাঁর ছোট ছেলে রাসেলের ওপর স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ার করে খুনীরা মনে করলো, সাংঘাতিক সাহসী কাজ তারা করেছে। সশস্ত্র কাপুরুষের দল গোপন আক্রমণে শেখ মুজিব এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের খুন করলো।

ফরিদপুরের কৃষকের সন্তান শেখ মুজিবের এই একটা গুণ ছিল যে, সে জানের পরোয়া করতো না। এই গুণটা আমাদের ক'জনার থাকে? মরতে হবে, তবু আমরা মৃত্যুর ভয় করি। কিন্তু শেখ মুজিব জন্মগতভাবেই বোধহয় একটু একরোখা ছিলেন, গোঁয়ার ছিলেন। কৃষকের সন্তানের সারল্য থেকে তিনি হয়তো এই বোধটি পেয়েছিলেন: মরছিতো আমরা হরহামেশা, নিত্য মুহূর্তে। তবে আর মৃত্যুর ভয় কি? এমন বোধ থেকেই ৭ মার্চে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ মানুষের জমায়েতে শেখ মুজিব বলেছিলেন: "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো; বাংলাকে স্বাধীন করে ছাড়বো।"

সত্যি, লোকটির কথায় যেমন গেঁয়োমি ছিল, তেমনি জোর ছিল। শেখ মুজিব আমাদের প্রিয় এই এক কারণে যে, শেখ মুজিব আমাদের পরিচিত ছিলেন। বিদেশি নন। অপরিচিত নন। অনাত্মীয় নন। তাঁর বাড়ি আর আমাদের বাড়ির মধ্যে মাইলের দূরত্বও তেমন বেশি ছিল না। এক দেশের লোক। পাশাপাশি জেলার লোক। আত্মীয়তাই ছিল কি না? এবং এদিক থেকে আমি এবং আমরা বলতে পারতাম: 'আমাদের শেখ মুজিব।'

১৯৭১ সালের শেষের দিকে যখন আমাকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে গেল, আটকে রাখলো ঢাকা জেলের ২০ ডিগ্রির একটা নির্জন সেলে এবং যখন হতাশায়, আঘাতে প্রায় মুষড়ে পড়ছিলাম, তখন পাহারারত সিপাইটি আমাকে অভয় দিয়ে বললো: "সাহেব, আপনিতো আগেও জেল খেটেছেন। মন খারাপ করছেন কেন? এই সেলে একদিন শেখ মুজিব ছিলেন। আর যেদিন তাঁকে গভীর রাতে আগরতলা মামলার বিচারের জন্য ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়, সেদিন সিপাহীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। নিশ্চিত ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাওয়ার মুখে দেখলাম, শেখ সাহেব সেলের বাইরে এসে নত হয়ে এক মুঠো মাটি নিয়ে নিজের মুখে ছোঁয়ালেন, বলে উঠলেন: 'বাংলা মা আমার, আমি তোমায় ভালোবাসি।' তারপর আমাদের পাহারাদার সিপাহিদের জড়িয়ে ধরে বললেন: যাই ভাই, তোমরা আমায় দোয়া করো।"

অবশ্য ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর দেশের জীবনে এক নতুন পর্যায় শুরু হয়েছিল। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব এসে যখন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর জীবনের একটি নতুন পর্বের শুরু। পেছনের পর্যায়ের ত্যাগ-তিতিক্ষা, সাহসের একটি আবেগের দিক অবশ্যই আছে। কিন্তু তাতেই মাত্র নতুন পর্যায়ের সমস্যার

সমাধান হবে না। এখানে নতুন দক্ষতা এবং দর্শনের প্রয়োজন হবে। কিন্তু দক্ষতা এবং দর্শন যাই হোক, পর্যায়টি দীর্ঘ এবং কষ্টকর এক নতুন পর্যায়।

এই নতুন পর্যায়ের নতুন দল গঠিত হচ্ছিল। নতুন মোকাবিলার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল। সমাজ রূপান্তরের দীর্ঘপথে এ-অনিবার্য। আমি চাচ্ছিলাম, মুজিবের বিপক্ষীয়রা যেমন, মুজিবও তেমনি পরস্পরের সঙ্গে রাজনীতিকভাবে মোকাবিলা করুন: যুক্তির ভিত্তিতে, গণতন্ত্রের ভিত্তিতে। ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষার মাধ্যমে। এমন হলেই মাত্র শেখ মুজিবের যেমন রূপান্তর ঘটতো: ভালো কিংবা মন্দ, যাই হোক না কেন, তেমনি তাঁর শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হতো। সেই মোকাবিলার মধ্য দিয়ে তাঁকে অতিক্রম করে সমাজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে নতুনতর সংগঠন ও শক্তি বিকশিত হতো। এমন পর্যায়েও পক্ষ-বিপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির প্রশ্ন থাকে। একের বিরুদ্ধে অপরের ন্যায়-অন্যায়ের অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের ব্যাপার থাকে। কিন্তু হত্যা করার নীতি কোনো বিবেচনার নীতি নয়।

আমি শেখ মুজিবের দলের সদস্য ছিলাম না। আমি শেখ মুজিবের সরকার গৃহীত অনেক সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করতাম না। কিন্তু মানসিকভাবে আমি চাইতাম, দেশ যেন অতিক্রম করতে পারে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত নেতৃত্বের পর্যায়টি। ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যেন সাধারণের যৌথ সংঘশক্তি প্রকাশিত হতে পারে। ব্যক্তি এবং যৌথের দ্বন্দ্ব একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব। ব্যক্তির ওপর মোহ, তার ক্ষমতা, অপার ক্ষমতাবান ব্যক্তির ওপর সবকিছুতে নির্ভর করার প্রবণতা: সাধারণ মানুষের এইসব চারিত্র-বৈশিষ্ট্য, ভালো-মন্দ, কটু-কষায়, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে দূরীভূত হয়ে সংগঠনের যৌথ নেতৃত্ব ক্রমাধিক পরিমাণে কার্যকর হতে পারে। শেখ মুজিবের ব্যক্তি-নেতৃত্বকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগঠন, তথা যৌথ সাধারণ অতিক্রম করে উঠুক, সেই পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকুক, এই ছিল আমাদের চেতন-অচেতন মনের কামনা।

শেখ মুজিবকে আয়ুদানের ক্ষেত্রে এখানেই হত্যাকারীদের অবদান। গান্ধীজী স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে যতোখানি অমর হতেন, তাঁর হত্যাকারী ব্যক্তিবর্গ তার চাইতে অধিক আয়ু গান্ধীজীকে দান করেছে। শেখ মুজিব স্বাভাবিকভাবে প্রয়াত হলে তাঁর দান-অবদান, শক্তি এবং সীমাবদ্ধতার যে-মূল্যায়ন সম্ভব হতো এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে যে-আয়ু এবং অবস্থান তিনি লাভ করতেন, তাঁর হত্যাকারীর দল তাঁর সেই মূল্যায়নকে রুদ্ধ করে মুজিবের আয়ুকে দীর্ঘতর করেছে, মুজিবের অবস্থানকে দৃঢ়তর করেছে। শেখ মুজিবের দিকে নিক্ষিপ্ত হত্যাকারীর বুলেটের আওয়াজ থেকে মুহূর্তের মধ্যে জন্ম নিয়েছে অপর এক আওয়াজ: এক মুজিবের রক্ত থেকে লক্ষ মুজিব জন্ম নেবে। ইন্দিরা, নেহেরুর কন্যা। কিন্তু আজ ভারতে 'নেহেরু' শব্দের যতো না উচ্চারণ, তার অধিক উচ্চারণ 'ইন্দিরা' শব্দের। এখানে অবশ্যই কন্যা পিতাকে অতিক্রম করে গেছেন। এবং তাঁর এমন অতিক্রমণে তাঁর দেহরক্ষীদের নিক্ষিপ্ত বুলেটের যে-একটি অবদান রয়েছে, তাতো বলার অপেক্ষা রাখে না।

৫-৮-৮৫

রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ

সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

'আমার সেলের পাশে ওরা কবর খুঁড়েছিল'– শেখ মুজিব

[শেখ মুজিব– ডেভিড ফ্রস্ট সাক্ষাৎকার]

'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস'-এ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে মার্কিন সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সাক্ষাৎকারের অনুলেখনটি পড়লাম। সাক্ষাৎকারটি নিউইয়র্কের টেলিভিশনে 'ডেভিড ফ্রস্ট শো' অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়েছিল ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে। বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরের ঘটনা। মর্মস্পর্শী একটি সাক্ষাৎকার। শেখ মুজিবুর রহমানের। পাকিস্তানের কারাগারে ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবের কবর খোঁড়া হয়েছিল তাঁর সেলের পাশে। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদাররা শেখ মুজিবকে বন্দী করেও হত্যা করতে সাহস পায়নি। শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করেছিল ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বাংলাদেশেরই মীর জাফরদের এক চক্র। পাকিস্তানের ঈপ্সিত কাজকে তারা সমাধা করেছিল। এরও এক মর্মান্তিক তাৎপর্য আছে।

কিন্তু এই সাক্ষাৎকারটির বিবরণ বাংলাদেশের ইতিহাসের কোনো রচনা বা পত্রিকাতে আমি দেখিনি। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস' প্রকল্প তৈরি হয়েছিল পরবর্তীকালে সরকারি উদ্যোগে। তার কিছুটা বাস্তবায়নে কবি হাসান হাফিজুর রহমান 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিল' শিরোনামে কয়েকটি খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। তাঁরও মর্মান্তিক এবং অকাল মৃত্যুর পরে তার পনেরটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আমি সেই খণ্ডগুলোও নাড়াচাড়া করেছি। তার একটিতে কিছু সাক্ষাৎকার সংগৃহীত এবং সঙ্কলিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকজন রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদের সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর এই সাক্ষাৎকারটির কোনো হদিস আমি পেলাম না।

দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। অনুলেখনের পরিমাণও প্রায় ১৪ পৃষ্ঠা। এই টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের মূল টেপ কি দুর্লভ? তা কি সংগ্রহ করা চলে না? এবং তার প্রদর্শন বাংলাদেশের আজকের প্রজন্মের কাছে কি অসম্ভব? রূঢ় বাস্তবে হয়তো-বা তাই। তবু তার প্রয়োজনও আজকের চাইতে অধিক আর কবে ছিল?

ইংরেজি অনুলেখন থেকে তার কিছু অংশ নিজে ভাষান্তরিত করার প্রয়াস পেলাম।

ডেভিড ফ্রস্ট: ... সেই রাতের কথা আপনি বলুন। সেই রাত, যে রাতে একদিকে আপনার সঙ্গে যখন চলছিল আলোচনা এবং যখন সেই আলোচনার আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিচ্ছিল, সেই রাতের কথা বলুন। সেই ২৫শে মার্চ, রাত আটটা। আপনি আপনার বাড়িতে ছিলেন। সেই বাড়িতেই পাকিস্তানি বাহিনী আপনাকে গ্রেপ্তার করেছিল। আমরা শুনেছিলাম, টেলিফোনে আপনাকে সাবধান করা হয়েছিল, সামরিক বাহিনী অগ্রসর হতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু আপনি আপনার বাড়ি ছেড়ে অপর কোথাও গেলেন না এবং গ্রেপ্তার বরণ করলেন? কেন এই সিদ্ধান্ত? তার কথা বলুন।

শেখ মুজিবুর রহমান: হ্যাঁ, সে এক কাহিনী। তাকে বলা প্রয়োজন। সে-সন্ধ্যায় আমার বাড়ি পাকিস্তান সামরিক জান্তার কমান্ডো বাহিনী ঘেরাও করেছিল। ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। প্রথমে ওরা ভেবেছিল, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে ওরা আমায় হত্যা করবে এবং প্রচার করে দেবে যে, ওরা যখন আমার সঙ্গে রাজনৈতিক আপোসের আলোচনা

করছিল, তখন বাংলাদেশের চরমপন্থীরাই আমাকে হত্যা করেছে। আমি বাড়ি থেকে বেরুনো, না বেরুনো নিয়ে চিন্তা করলাম। আমি জানতাম, পাকিস্তানি বাহিনী এক বর্বর বাহিনী। আমি স্থির করলাম: আমি মরি, তাও ভালো, তবু আমার প্রিয় দেশবাসী রক্ষা পাক।
ফ্রস্ট: আপনি হয়তো কলকাতা চলে যেতে পারতেন।
শেখ মুজিবুর: আমি ইচ্ছা করলে যে-কোনো জায়গায় যেতে পারতাম। কিন্তু আমার দেশবাসীকে পরিত্যাগ করে আমি কেমন করে যাবো? আমি তাদের নেতা। আমি সংগ্রাম করবো। মৃত্যুবরণ করবো। পালিয়ে কেন যাবো? দেশবাসীর কাছে আমার আহ্বান ছিল: তোমরা প্রতিরোধ গড়ে তোলো।
ফ্রস্ট: আপনার সিদ্ধান্ত অবশ্যই সঠিক ছিল। কারণ এই ঘটনাই বিগত ন'মাস ধরে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আপনাকে তাদের একটি বিশ্বাসের প্রতীকে পরিণত করেছে। আপনি তো এখন তাদের কাছে প্রায় ঈশ্বরবৎ।
শেখ মুজিবুর: আমি তা বলিনে। কিন্তু এ-কথা সত্য, তারা আমাকে ভালোবাসে। আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালোবেসেছিলাম। আমি তাদের জীবনকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হানাদার বর্বর বাহিনী আমাকে সে রাতে আমার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল। ওরা আমার নিজের বাড়ি ধ্বংস করে দিল। আমার গ্রামের বাড়ি, যেখানে ৯০ বছরের বৃদ্ধ পিতা এবং ৮০ বছরের বৃদ্ধা জননী ছিলেন, গ্রামের সে বাড়িও ধ্বংস করে দিলো। ওরা গ্রামে ফৌজ পাঠিয়ে আমার বাবা-মাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে তাদের চোখের সামনে সে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলো। বাবা-মার আর কোনো আশ্রয় রইলো না। ওরা সব কিছুই জ্বালিয়ে দিলো। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে পেলে ওরা আমার হতভাগ্য মানুষদের হত্যা করবে না। কিন্তু আমি জানতাম, আমাদের সংগঠনের শক্তি আছে। আমি একটি সংগঠনকে জীবনব্যাপী গড়ে তুলেছিলাম। জনগণ তার ভিত্তি। আমি জানতাম, তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে। আমি তাদের বলেছিলাম: প্রতি ইঞ্চিতে তোমরা লড়াই করবে। আমি তাদের বলেছিলাম, হয়তো এটাই আমার শেষ নির্দেশ। কিন্তু মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত তাদের লড়াই করতে হবে। লড়াই তাদের চালিয়ে যেতে হবে।
ফ্রস্ট: আপনাকে ওরা ঠিক কীভাবে গ্রেপ্তার করেছিল? তখন তো রাত ১টা ৩০ মিনিট ছিল? তাই নয় কি? তখন কি ঘটলো?
শেখ মুজিবুর: ওরা প্রথমে আমার বাড়ির ওপর মেশিনগানের গুলি চালিয়েছিল।
ফ্রস্ট: ওরা যখন এলো, তখন আপনি বাড়ির কোনখানটাতে ছিলেন?
শেখ মুজিবুর: এই যেটা দেখছেন, এটা আমার শোবার ঘর। আমি এই শোবার ঘরেই তখন বসেছিলাম। এদিক থেকে ওরা মেশিনগান চালাতে আরম্ভ করে। তারপরে এদিক-ওদিক, সবদিক থেকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। জানালার ওপর গুলি চালায়।
ফ্রস্ট: এগুলো সব তখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল?
শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, সব ধ্বংস করেছিল। আমি তখন আমার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে ছিলাম। একটা গুলি আমার শোবার ঘরে এসে পড়ে। আমার ছ'বছরের ছোট ছেলেটি বিছানার ওপর তখন শোয়া ছিল। আমার স্ত্রী এই শোবার ঘরে দুটি সন্তানকে নিয়ে বসেছিলেন।
ফ্রস্ট: পাকিস্তানি বাহিনী কোন দিক দিয়ে ঢুকেছিল?
শেখ মুজিবুর: সব দিক দিয়ে। ওরা এবার জানালার মধ্য দিয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমি আমার স্ত্রীকে দুটি সন্তানকে নিয়ে বসে থাকতে বলি। তারপর তাঁর কাছ থেকে উঠে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি।

ফ্রস্ট: আপনার স্ত্রী কিছু বলেছিলেন?
শেখ মুজিবুর: না, কোনো শব্দ উচ্চারণের তখন অবস্থা নয়। আমি শুধু তাঁকে একটি বিদায় সম্বোধন জানিয়েছিলাম। আমি দুয়ার খুলে বাইরে বেরিয়ে ওদের গুলি বন্ধ করতে বলেছিলাম। আমি বললাম: তোমরা গুলি বন্ধ করো। আমিতো এখানে দাঁড়িয়েছি। তোমরা গুলি করছো কেন? কি তোমরা চাও? তখন চারদিক থেকে ওরা আমার দিকে ছুটে এলো বেয়নেট উদ্যত করে। ওদের একজন অফিসার ধরলো। ওই অফিসারই বললো: এই! ওকে মেরে ফেল না।
ফ্রস্ট: একটা অফিসারই ওদের থামিয়ে ছিল?
শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, ঐ অফিসারটিই থামিয়েছিল। ওরা তখন আমাকে এখান থেকে টেনে নামালো। ওরা পেছন থেকে আমার গায়ে-পায়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারতে লাগলো। অফিসারটা আমাকে ধরেছিল। তবু ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে টেনে নামাতে লাগলো। আমি বললাম: তোমরা আমাকে টানছো কেন? আমি তো যাচ্ছি। আমি বললাম: আমার তামাকের পাইপটা নিতে দাও। ওরা একটু থামলো। আমি ওপরে গিয়ে আমার তামাকের পাইপটা নিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী তখন দুটি ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে কিছু কাপড়-চোপড়সহ একটি ছোট সুটকেস দিলেন। তাই নিয়ে আমি নেমে এলাম। চারদিকে তখন আগুন জ্বলছিল। আজ এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে ওরা আমায় নিয়ে গেল।
ফ্রস্ট: আপনার ৩২ নং ধানমন্ডি বাড়ি থেকে সেদিন যখন আপনি বেরিয়ে এলেন, তখন কি ভেবেছিলেন, আর কোনোদিন আপনি এখানে ফিরে আসতে পারবেন?
শেখ মুজিবুর: না, আমি তা কল্পনা করতে পারিনি। আমি ভেবেছি, এই-ই শেষ। কিন্তু আমার মনের কথা ছিল: আজ আমি যদি আমার দেশের নেতা হিসেবে মাথা উঁচু রেখে মরতে পারি, তাহলে আমার দেশের মানুষের অন্তত লজ্জার কোনো কারণ থাকবে না। কিন্তু আমি ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে, আমার দেশবাসী পৃথিবীর সামনে আর মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। আমি মরি, তাও ভালো। তবু আমার দেশবাসীর যেন মর্যাদার কোনো হানি না ঘটে।
ফ্রস্ট: শেখ সাহেব, আপনি একবার বলেছিলেন: যে-মানুষ মরতে রাজি, তুমি তাকে মারতে পারো না। কথাটি কি এমনি ছিল না?
শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। যে-মানুষ মরতে রাজি, তাকে কেউ মারতে পারে না। আপনি একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন। সেতো তার দেহ। কিন্তু তার আত্মাকে কি আপনি হত্যা করতে পারেন? না, তা কেউ পারে না। এটাই আমার বিশ্বাস। আমি একজন মুসলমান। এবং একজন মুসলমান একবারই মাত্র মরে, দু'বার নয়। আমি মানুষ। আমি মনুষ্যত্বকে ভালোবাসি। আমি আমার জাতির নেতা। আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি। আজ তাদের কাছে আমার আর কিছু দাবি নাই। তারা আমাকে ভালোবেসেছে। তারা আমার জন্য তাদের সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েছে। কারণ, আমি আমার সব কিছুকে তাদের জন্য দেয়ার অঙ্গীকার করেছি। আজ আমি তাদের মুখে হাসি দেখতে চাই। আমি যখন আমার প্রতি আমার দেশবাসীর স্নেহ-ভালোবাসার কথা ভাবি, তখন আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই।
ফ্রস্ট: পাকিস্তানি বাহিনী আপনার বাড়ির সব কিছুই লুট করেনিয়েছিল?
শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, আমার সব কিছুই ওরা লুট করেছে। আমার ঘরের বিছানাপত্র, আলমারি, কাপড়-চোপড়: সব কিছুই লুণ্ঠিত হয়েছে। মি. ফ্রস্ট, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এ-বাড়ির কোনো কিছুই আজ নাই।

ফ্রস্ট: আপনার বাড়ি যখন মেরামত হয়, তখন এ-সব জিনিস লুণ্ঠিত হয়েছে, না পাকিস্তানিরা সব লুণ্ঠন করেছে?

শেখ মুজিবুর: পাকিস্তানি ফৌজ আমার সব কিছু লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু এই বর্বর বাহিনী আমার আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, আমার সন্তানদের দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করেছে, তাতে আমার দুঃখ নেই। আমার দুঃখ, ওরা আমার জীবনের ইতিহাসকে লুণ্ঠন করেছে। আমার ৩৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের দিনলিপি ছিল। আমার একটি সুন্দর লাইব্রেরি ছিল। বর্বররা আমার প্রত্যেকটি বই আর মূল্যবান দলিলপত্র লুণ্ঠন করেছে। সব কিছুই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিয়ে গেছে।

ফ্রস্ট: তাই আবার সেই প্রশ্নটা আমাদের সামনে আসে: কেন ওরা সব কিছু লুণ্ঠন করলো?

শেখ মুজিবুর: এর কি জবাব দেবো? আসলে ওরা মানুষ নয়। কতগুলো ঠগ, দস্যু, উন্মাদ, অমানুষ আর অসভ্য জানোয়ার। আমার নিজের কথা ছেড়ে দিন। তা নিয়ে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন, ২ বছর ৫ বছরের শিশু, মেয়েরা,: কেউ রেহাই পেল না। সব নিরীহ মানুষকে ওরা হত্যা করেছে। আমি আপনাকে দেখিয়েছি সব জ্বালিয়ে দেয়া, পোড়া বাড়ি, বস্তি। একেবারে গরিব, না-খাওয়া মানুষ বসবাস করতো এই বস্তিতে। সেগুলোকে ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। বস্তিতে আগুন দিয়েছে। বস্তির মানুষ জীবন নিয়ে পালাতে চেয়েছে। আর সেইসব মানুষের ওপর চারদিক থেকে মেশিনগান চালিয়ে হাজার হাজারে হত্যা করা হয়েছে!

ফ্রস্ট: কী আর্শ্চয! আপনি বলেছেন, ওদের ঘরে আগুন দিয়ে ঘর থেকে বের করে, খোলা জায়গায় পলায়মান মানুষকে মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করেছে!

শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, এমনিভাবে গুলি করে তাদের হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট: কোন মানুষকে মারলো, তার কোনো পরোয়া করলো না?

শেখ মুজিবুর: না, তার বিন্দুমাত্র পরোয়া করেনি।

ফ্রস্ট: কেবল হত্যার জন্য হত্যা। যাকে পেয়েছে, তাকেই হত্যা করেছে?

শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, যাকে পেয়েছে, তাকেই হত্যা করেছে। ওরা ভেবেছে, প্রত্যেকেই শেখ মুজিবের মানুষ। তাই প্রত্যেককেই হত্যা করতে হবে।

ফ্রস্ট: আপনি যখন দেখেন, মানুষ মানুষকে এমনিভাবে হত্যা করছে, তখন আপনার কি মনে হয়? আপনি মনে করেন, মানুষ আসলে ভালো? কিংবা মনে করেন, মানুষ আসলেই খারাপ?

শেখ মুজিবুর: ভালো-মন্দ সর্বত্রই আছে। মনুষ্যত্ব আছে, এমন মানুষও আমি দেখেছি। কিন্তু আমি মনে করি, পশ্চিম পাকিস্তানের এই ফৌজ: এগুলো মানুষ নয়। এগুলো পশুরও অধম। মানুষের যে-পাশবিক চরিত্র না থাকতে পারে, তা নয়। কিন্তু যে-মানুষ, সে পশুর অধম হয় কী প্রকারে? কিন্তু এই বাহিনীতো পশুরও অধম। কারণ একটা পশু আক্রান্ত হলেই মাত্র আক্রমণ করে। তা নইলে নয়। পশু যদি মানুষকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে, তবু সে তাকে অত্যাচার করে না। কিন্তু এই বর্বরের দল আমার দেশবাসীকে কেবল হত্যা করেনি। দিনের পর দিন বন্দী মানুষকে অত্যাচার করেছে। ৫ দিন, ৭ দিন, ১৫ দিন নির্মম অত্যাচার করেছে, আর হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট: পাকিস্তানে বন্দী থাকাকালে ওরা আপনার বিচার করেছিল। সেই বিচার সম্পর্কে কিছু বলুন।

শেখ মুজিবুর: ওরা একটা কোর্ট মার্শাল তৈরি করেছিল। তাতে পাঁচজন ছিল সামরিক অফিসার। বাকি কয়েকজন বেসামরিক অফিসার।

ফ্রস্ট: আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনলো ওরা?
শেখ মুজিবুর: অভিযোগ: রাষ্ট্রদ্রোহিতা, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, পাকিস্তানের সশস্ত্র ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র: আরো কতো কি! বারো দফা অভিযোগ। এর ছ'টাতেই একেবারে ঝুলিয়ে ফাঁসি!
ফ্রস্ট: আপনার পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন? আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো উপায় ছিল?
শেখ মুজিবুর: সরকারের তরফ থেকে গোড়ায় এক উকিল দিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন দেখলাম, অবস্থাটা এমন যে, যুক্তির কোনো দাম নেই, দেখলাম এ হচ্ছে বিচারের এক প্রহসন মাত্র, তখন আমি কোর্টে নিজে দাঁড়িয়ে বললাম: জনাব বিচারপতি, দয়া করে আমাকে সমর্থনকারী উকিল সাহেবদের যেতে বলুন। আপনারা বিলক্ষণ জানেন, এ-হচ্ছে এক গোপন বিচার। আমি বেসামরিক লোক। আমি সামরিক লোক নই। আর এরা করছে আমার কোর্ট মার্শাল! ইয়াহিয়া খান কেবল যে প্রেসিডেন্ট, তাই নয়। তিনি প্রধান সামরিক শাসকও। এ-বিচারের রায়কে অনুমোদনের কর্তা তিনি। এই আদালত গঠন করেছেন তিনি।
ফ্রস্ট: তার মানে, তার হাতেই ছিল সব?
শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, সে ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তার ইচ্ছাই ইচ্ছা।
ফ্রস্ট: তার মানে, আপনি আদালতে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন?
শেখ মুজিবুর: তার তো কোনো উপায় ছিল না। আমি তো বন্দী।
ফ্রস্ট: হ্যাঁ, তা তো বটেই। আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো উপায় ছিল না। ওরা কি বিচার শেষ করে, সরকারিভাবে কোনো রায় তৈরি করেছিল?
শেখ মুজিবুর: ৪ ডিসেম্বর (১৯৭১) ওরা আদালতের কাজ শেষ করে। সাথে সাথে ইয়াহিয়া খান সব বিচারক, যথা লেফটেন্যান্ট কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার– এদের সব রাওয়ালপিণ্ডি ডেকে পাঠান রায় তৈরি করার জন্য। সেখানে ঠিক করলো, ওরা আমায় ফাঁসি দেবে।
ফ্রস্ট: আর তাই সেলের পাশে কবর খোঁড়া দেখে আপনি বুঝতে পেরেছিলেন, ওরা ওখানেই আপনাকে কবর দেবে?
শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, আমার সেলের পাশেই ওরা কবর খুঁড়লো। আমার চোখের সামনে।
ফ্রস্ট: আপনি নিজের চোখে তাই দেখলেন?
শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, আমি আমার নিজের চোখে দেখলাম, ওরা কবর খুঁড়ছে। আমি নিজের কাছে নিজে বললাম: 'আমি জানি, এ-কবর আমার কবর। ঠিক আছে! কোনো পরোয়া নেই। আমি তৈরি আছি।'
ফ্রস্ট: ওরা কি আপনাকে বলেছিল: 'এটা তোমার কবর?'
শেখ মুজিবুর: না, ওরা তা বলেনি।
ফ্রস্ট: কি বলেছিল ওরা?
শেখ মুজিবুর: ওরা বললো: 'না, না। তোমার কবর নয়। ধর যদি বম্বিং হয়, তাহলে তুমি এখানে শেলটার নিতে পারবে।'
ফ্রস্ট: সেই সময়ে আপনার মনের চিন্তা কি ছিল? আপনি কি এই সারাটা সময়, ন'মাস, নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করেছেন?
শেখ মুজিবুর: আমি জানতাম, যে-কোনো দিন ওরা আমায় শেষ করে দিতে পারে। কারণ, ওরা অসভ্য, বর্বর।
ফ্রস্ট: এমন অবস্থায় আপনার কেমন করে কাটতো? আপনি কি প্রার্থনা করতেন?

শেখ মুজিবুর: এমন অবস্থায় আমার নির্ভর ছিল আমার বিশ্বাস, আমার নীতি, আমার পৌনে আট কোটি মানুষের জন্য আমার বিশ্বাস। তারা আমায় ভালোবেসেছে: ভাইয়ের মতো, পিতার মতো। আমাকে তাদের নেতা বানিয়েছে।

ফ্রস্ট: আপনি যখন দেখলেন, ওরা কবর খনন করছে, তখন আপনার মনে কার কথা আগে জাগলো? আপনার দেশের কথা? না, আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের কথা?

শেখ মুজিবুর: আমার প্রথম চিন্তা আমার দেশের জন্য। আমার আত্মীয়জনদের চাইতেও আমার ভালোবাসা আমার দেশেরই জন্য। আপনি তো দেখছেন, আমাকে তারা কী গভীরভাবে ভালোবাসে।

ফ্রস্ট: হ্যাঁ, একথা আমি বুঝি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত বাংলাদেশের আপনি নেতা। আপনার প্রথম চিন্তা অবশ্যই আপনার দেশের চিন্তা। পারিবারিক চিন্তা পরের চিন্তা।

শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, আমার জনতার প্রতিই আমার প্রথম ভালোবাসা। আমি তো জানি, আমি অমর নই। আজ, কিংবা কাল, কিংবা পরশু আমাকে মরতে হবে। মানুষ মাত্রকেই মরতে হয়। কাজেই আমার বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যুবরণ করবে সাহসের সঙ্গে।

ফ্রস্ট: কিন্তু ওরাতো আপনাকে কবর দিতে পারেনি। কে আপনাকে রক্ষা করেছিল সেদিন আপনার ভবিতব্য থেকে?

শেখ মুজিবুর: আমার বিশ্বাস, সর্বশক্তিমান আল্লাহই আমাকে রক্ষা করেছেন।

ফ্রস্ট: আমি একটা বিবরণে দেখলাম, আপনাকে নাকি এক সময়ে সরিয়ে রেখেছিল, ইয়াহিয়া খান যখন আপনাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল, তখন আপনাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়েছিল। একি যথার্থ?

শেখ মুজিবুর: ওরা জেলখানায় একটা অবস্থা তৈরি করেছিল। মনে হচ্ছিল, কতোগুলো কয়েদিকে ওরা সংগঠিত করেছিল যেন সকালের দিকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা আমাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। আমার মনে হয়, আমাকে তত্ত্বাবধানের ভার যে অফিসারের ওপর পড়েছিল, আমার ওপর তার কিছুটা সহানুভূতি জেগেছিল। হয়তো-বা সে অফিসার এমনও বুঝতে পেরেছিল যে, ইয়াহিয়া খানের দিন শেষ হয়ে আসছে। আমি দেখলাম, হঠাৎ রাত তিনটার সময়ে সে এসে আমাকে সেল থেকে সরিয়ে নিয়ে তার নিজের বাংলোতে দু'দিন যাবৎ রক্ষা করলো। এ-দু'দিন আমার ওপর কোনো সামরিক পাহারা ছিল না। দু'দিন পরে এই অফিসার আমাকে আবার একটি আবাসিক কলোনির নির্জন এলাকায় সরিয়ে নিলো। সেখানে আমাকে হয়তো চার, পাঁচ কিংবা ছ'দিন রাখা হয়েছিল। এই সময়টাতে আমার অবস্থান সম্পর্কে নিম্নপদস্থ কিছু অফিসার বাদে আর কেই জ্ঞাত ছিল না।

ফ্রস্ট: এ-তাদের সাহসেরই কাজ। এখন তাদের কি হয়েছে, তাই ভাবছি।

শেখ মুজিবুর: আমিও জানিনে। ওদের ওপর কোনো আঘাত হানতে ওরা পারবে বলে মনে হয় না। ওদের জন্য যথার্থই আমার শুভ কামনা রয়েছে।

ফ্রস্ট: এমন কি শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান যখন ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, তখনো নাকি সে ভুট্টোর কাছে আপনার ফাঁসির কথা বলেছিল? এটা কি ঠিক?

শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, ঠিক। ভুট্টো আমাকে সে-কাহিনীটা বলেছিল। ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার সময়ে ইয়াহিয়া বলেছিল: 'মিস্টার ভুট্টো, আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুল হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি না দেয়া।'

ফ্রস্ট: ইয়াহিয়া এমন কথা বলেছিল!

শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, ভুট্টো এ-কথা আমায় বলে তারপরে বলেছিল: 'ইয়াহিয়ার দাবি ছিল,

ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সে পেছনের তারিখ দিয়ে আমাকে ফাঁসি দেবে।' কিন্তু ভুট্টো তার এ-প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

ফ্রস্ট: ভুট্টো কি জবাব দিয়েছিল? তার জবাবের কথা কি ভুট্টো আপনাকে কিছু বলেছিল?

শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, বলেছিল।

ফ্রস্ট: কি বলেছিল ভুট্টো?

শেখ মুজিবুর: ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বলেছিল: 'না, আমি তা হতে দিতে পারিনে। তাহলে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটবে। বাংলাদেশে এখন আমাদের এক লাখ তিন হাজার সামরিক বাহিনীর লোক আর বেসামরিক লোক বাংলাদেশ আর ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দী রয়েছে। তাছাড়া পাঁচ থেকে দশ লাখ অবাঙ্গালি বাংলাদেশে আছে। মিস্টার ইয়াহিয়া, এমন অবস্থায় আপনি যদি শেখ মুজিবকে হত্যা করেন আর আমি ক্ষমতা গ্রহণ করি, তাহলে একটি লোকও আর জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত আসতে সক্ষম হবে না। তার প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানেও ঘটবে। তখন আমার অবস্থা হবে সঙ্কটজনক–' ভুট্টো এ-কথা আমাকে বলেছিল। ভুট্টোর কাছে আমি অবশ্যই এ-জন্য কৃতজ্ঞ।

ফ্রস্ট: শেখ সাহেব, আজ যদি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটে, আপনি তাহলে তাকে কি বলবেন?

শেখ মুজিবুর: ইয়াহিয়া খান একটা জঘন্য খুনি। তার ছবি দেখতেও আমি রাজি নই। তার বর্বর ফৌজ দিয়ে সে আমার ৩০ লক্ষ বাঙ্গালিকে হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট: ভুট্টো এখন তাকে গৃহবন্দী করেছে। ভুট্টো তাকে নিয়ে এখন কি করবে? আপনার কি মনে হয়?

শেখ মুজিবুর: মিস্টার ফ্রস্ট, আপনি জানেন, আমার বাংলাদেশে কি ঘটেছে? শিশু, মেয়ে, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র সকলকে ওরা হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ বাঙ্গালিকে ওরা হত্যা করেছে। অন্ততপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ ভাগ ঘরবাড়ি ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং তার সব কিছুকে ওরা লুট করেছে। খাদ্যের গুদামগুলোকে ওরা ধ্বংস করেছে।

ফ্রস্ট: নিহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ, এ-কথা আপনি সঠিকভাবে জানেন?

শেখ মুজিবুর: আমার লোকজন তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। এখনো আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিনি। সংখ্যা হয়তো একেও ছাড়িয়ে যাবে। ত্রিশ লক্ষের কম তো নয়ই।

ফ্রস্ট: কিন্তু এমন হত্যাকাণ্ডতো নিরর্থক। মানুষকে ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করা।

শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, কাদের ওরা হত্যা করেছে? একেবারে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে। গ্রামের মানুষকে। যে-গ্রামের মানুষ পৃথিবীর কথাই হয়তো কিছু জানতো না, সে গ্রামে পাকিস্তানি ফৌজ ঢুকে পাখি মারার মতো গুলি করে এই মানুষকে ওরা হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট: আমার মনেরও প্রশ্ন: আহা! কেন এমন হলো? কেন হলো?

শেখ মুজিবুর: না, আমিও জানিনে। আমিও বুঝিনে। এ-রকমটা পৃথিবীতে আর ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।

ফ্রস্ট: আর এতো ছিল মুসলমানের হাতেই মুসলমানের হত্যা?

শেখ মুজিবুর: ওরা নিজেরা নিজেদের মুসলমান বলে। অথচ ওরা হত্যা করেছে মুসলমান মেয়েদের। আমরা অনেককে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। আমাদের ত্রাণ শিবিরে এখনো অনেকে রয়েছে। এদের স্বামী, পিতা: সকলকে হত্যা করা হয়েছে। মা আর বাবার সামনে ওরা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। পুত্রের সামনে মাকে ধর্ষণ করেছে। আপনি চিন্তা করুন! আমি এ-কথা চিন্তা করে চোখের অশ্রুকে রোধ করতে পারিনে। এরা নিজেদের মুসলমান

বলে দাবি করে কিভাবে? এরাতো পশুরও অধম। মনে করুন, আমার বন্ধু মশিউর রহমানের কথা। আমাদের দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন তিনি। আমাদের সরকারের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন তিনি। তাঁকে নির্যাতন করে করে হত্যা করা হয়েছে। ২৪ দিন ধরে তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। প্রথমে তার এক হাত কেটেছে। তারপর তার আর একটা হাত কেটেছে। তারপর তার কান কেটেছে। তার পা কেটেছে। ২৪ দিনব্যাপী চলেছে এমন নির্যাতন (শেখ মুজিব কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন)। কিন্তু এ তো একটা কাহিনী। আমাদের কতো নেতা আর কর্মীকে, বুদ্ধিজীবী আর সরকারি কর্মচারীকে জেলখানায় আটক করে সেখান থেকে নিয়ে দিনের পর দিন অত্যাচার করে হত্যা করেছে! এমন অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী ইতিহাসে কোথাও শুনি নি। একটা পশু, একটা বাঘও তো মানুষকে হত্যা করলে এমনভাবে হত্যা করে না।

ফ্রস্ট: ওরা কি চেয়েছিল?

শেখ মুজিবুর: ওরা চেয়েছিল, আমাদের এই বাংলাদেশকে একেবারে উপনিবেশ করে রাখতে। আপনি তো জানেন মিস্টার ফ্রস্ট, ওরা বাঙ্গালির পুলিশ বাহিনীর লোককে, বাঙ্গালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করেছে। ওরা বাঙ্গালি শিক্ষক, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, বাঙ্গালি ডাক্তার, যুবক, ছাত্র-সকলকে হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট: আমি শুনেছি, যুদ্ধের শেষ অবস্থাতেও ঢাকাতে ওরা ১৩০ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে।

শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, সারেন্ডারের মাত্র একদিন আগে। কেবল ঢাকাতেই। ১৫০ নয়। ৩০০ মানুষকে ওরা হত্যা করেছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, মেডিকেল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে। কারফিউ দিয়ে মানুষকে বাড়ির মধ্যে আটক করেছে। আর তারপর বাড়িতে হানা দিয়ে এইসব মানুষকে হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট: তার মানে, কারফিউ জারি করে খবরাখবর বন্ধ করে হত্যা করেছে?

শেখ মুজিবুর: হ্যাঁ, তাই করেছে।

ফ্রস্ট: শেখ সাহেব, আপনার কি মনে হয় ইয়াহিয়া খান দুর্বল চরিত্রের লোক, যাকে অন্য লোকে খারাপ করেছে, না, সে নিজেই একটা দস্তুরমতো খারাপ লোক?

শেখ মুজিবুর: আমি মনে করি, ও নিজেই একটা নরাধম। ও একটা সাংঘাতিক লোক। ইয়াহিয়া খান যখন প্রেসিডেন্ট, তখন জনসাধারণের নেতা হিসেবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার সময়েই আমি দেখেছি।...

ফ্রস্ট: আপনি আমাদের আজকের এই আলাপে নেতা এবং নেতৃত্বের কথা তুলেছেন। যথার্থ নেতৃত্বের আপনি কি সংজ্ঞা দেবেন?

শেখ মুজিবুর: আমি বলবো, যথার্থ নেতৃত্ব আসে সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কেউ আকস্মিকভাবে একদিনে নেতা হতে পারে না। তাকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। তাকে মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। নেতার আদর্শ থাকতে হবে, নীতি থাকতে হবে। এইসব গুণ যার থাকে, সেই-ই মাত্র নেতা হতে পারে।

ফ্রস্ট: ইতিহাসের কোন নেতাদের আপনি স্মরণ করেন, তাঁদের প্রশংসা করেন?

শেখ মুজিবুর: অনেকেই স্মরণীয়। বর্তমানের নেতাদের কথা বলছিনে।...

ফ্রস্ট: না, বর্তমানের নয়। কিন্তু ইতিহাসের কারা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছেন?

শেখ মুজিবুর: আমি আব্রাহাম লিংকনকে স্মরণ করি। স্মরণ করি মাও সে তুং, লেনিন, চার্চিলকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জন কেনেডিকেও আমি শ্রদ্ধা করতাম।...

ফ্রস্ট: মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?
শেখ মুজিবুর: মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, কামাল আতার্তুক: এঁদের জন্য আমার মনে গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আমি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতা ড. সুকর্ণকেও বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম। এই সকল নেতাই তো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নেতা হয়েছিলেন।
ফ্রস্ট: আজ এই মুহূর্তে, অতীতের দিকে তাকিয়ে আপনি কোন দিনটিতে আপনার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন বলে গণ্য করবেন? কোন মুহূর্তটি আপনাকে সবচাইতে সুখী করেছিল?
শেখ মুজিবুর: আমি যেদিন শুনলাম, আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সেদিনটিই ছিল আমার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন।
ফ্রস্ট: আপনার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন?
শেখ মুজিবুর: সমগ্র জীবনের সবচাইতে সুখের দিন।
ফ্রস্ট: এমন দিনের স্বপ্ন আপনি কবে থেকে দেখতে শুরু করেন?
শেখ মুজিবুর: বহুদিন যাবৎ আমি এই স্বপ্ন দেখে আসছি।
ফ্রস্ট: স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনি কবে প্রথম কারাগারে যান?
শেখ মুজিবুর: আমার জেল গমন শুরু হয়, বোধহয় সেই ১৯৪৮ সালে। আমি তারপরে ১৯৪৯ সালে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাই এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত জেলে থাকি। ১৯৫৪ সালে আমি একজন মন্ত্রী হই। আবার ১৯৫৪ সালেই গ্রেপ্তার হই এবং ১৯৫৫ পর্যন্ত জেলে থাকি। আবার ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান আমাকে জেলে পাঠায় এবং তখন পাঁচ বছর জেলে এবং দু'বছর অন্তরীণ থাকি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ নানা মামলায় আমাকে সরকারপক্ষ বিচার করেছে। ১৯৬৬ সালে আবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৩ বছর যাবৎ আটক রাখা হয়। তারপর আবার ইয়াহিয়া খান গ্রেপ্তার করে। এমন দীর্ঘ সংগ্রাম কেবল ব্যক্তিগতভাবে আমার নয়। আমার বহু সহকর্মীর জীবনেরই এই ইতিহাস।...
ফ্রস্ট: মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, পৃথিবীর মানুষের জন্য কি বাণী আমি আপনার কাছ থেকে বহন করেনিয়ে যেতে পারি?
শেখ মুজিবুর: আমার একমাত্র প্রার্থনা: বিশ্ব আমার দেশের মানুষের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে আসুক। আমার হতভাগ্য স্বদেশবাসীর পাশে এসে বিশ্বের মানুষ দাঁড়াক। আমার দেশের মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য যেমন দুঃখ ভোগ করেছে, এমন আত্মত্যাগ পৃথিবীর খুব কম দেশের মানুষকেই করতে হয়েছে। মিস্টার ফ্রস্ট, আপনাকে আমি আমার একজন বন্ধু বলে গণ্য করি। আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আসুন। নিজের চোখে দেখুন। আপনি নিজের চোখে অনেক দৃশ্য দেখেছেন। আরো দেখুন। আপনি আমার এই বাণী বহন করুন: সকলের জন্যই আমার শুভেচ্ছা। আমি বিশ্বাস করি, আমার দেশের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে এসে বিশ্ব দাঁড়াবে। আপনি আমার দেশের বন্ধু। আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। জয় বাংলা!
ডেভিড ফ্রস্ট: জয় বাংলা! আমিও বিশ্বাস করি, বিশ্ববাসী আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। আপনাদের পাশে এসে আমাদের দাঁড়াতে হবে। নয়তো ঈশ্বর আমাদের কোনোদিন ক্ষমা করবেন না।

রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ
সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

সেকায়েপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট

২০১৬ শিক্ষা বছরে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

নবম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়